মানুষ আমার ভাই

মহাত্মা গান্ধীর নিজের ভাষায়
তাঁহার জীবনকথা ও চিন্তাধারা

(8)
3211
6285

মানুষ আমার ভাই

3211

মানুষ আমার ভাই

মহাত্মা গান্ধীর নিজের ভাষায়
তাঁহার জীবনকথা ও চিন্তাধারা

সংকলন ও সম্পাদন

কৃষ্ণ কৃপালানি

ভূমিকা

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

অনুবাদ

প্রিয়রঞ্জন সেন

STATE INSTITUTE OF EDU...
Govt. of West Beng...

S.C.E.R.T. ... Library ... Bengal
Calcutta
25/3, B. C. Road

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

Manush Amar Bhai (A Selection from Gandhiji's Writings). Compiled and edited by Krishna Kripalani. Bengali translation by Priyaranjan Sen. Sahitya Akademi, New Delhi. 1967. First published 1967. Special Gandhi Centenary edition, 1969. Price Rs. 2·00.

© সাহিত্য অকাদেমী ১৯৬৭

S.C.E.R.T., W.B. LIBRARY
Date 9.4.2002
Acc. No. 10488

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭
শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ ২ অক্টোবর ১৯৬৯

সাহিত্য অকাদেমী

রবীন্দ্র ভবন, ফিরোজ শাহ্ রোড, নিউ দিল্লী ১
রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, ব্লক ৫বি, কলিকাতা ২৯
২ হ্যাডোস্ রোড, মাদ্রাজ ৬

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রণ-বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩] শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : নন্দলাল বসু-রচিত লাইনোকাট
লবণ-সত্যাগ্রহ উপলক্ষে সাবরমতী হইতে ডাণ্ডি-অভিযানকালে অঙ্কিত

প্রকাশকের নিবেদন

এই অনুবাদ-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ অব্দে, অনুবাদক প্রিয়রঞ্জন সেনের পরলোকযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে। মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ সুলভ মূল্যে সাধারণ্যে বহুল প্রচারের নিমিত্ত এই গ্রন্থের একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিল্পনায় ভারতের বিভিন্ন ভাষার সংবর্ধনের জন্য যে-অর্থসংস্থান আছে, সেই প্রকল্পে সরকার যথা প্রয়োজন সহায়তা দান করায় এই সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইল। সযত্ন সংশোধন ও পুনরীক্ষণে শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক এই বিশেষ সংস্করণ মুদ্রণের কাজে সহযোগ করিয়াছেন।

সাহিত্য অকাদেমী

মুখবন্ধ

য়ুনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের নবম অধিবেশন বসিয়াছিল নিউ দিল্লীতে, ১৯৫৬ অব্দের নভেম্বর মাসে। সেখানে উরুগুয়ে দেশের প্রতিনিধি-মণ্ডলের প্রস্তাব অনুসারে একটি সংকল্প গৃহীত হয়। তাহাতে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের আলোচনার ভিত্তিতে, তাঁহার চিন্তারাজি হইতে নির্বাচিত অংশ পুস্তক-আকারে প্রকাশের জন্য য়ুনেস্কোর ডিরেক্টর-জেনারেলকে অধিকার দেওয়া হয়।

যাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রচনার প্রতি সম্মিলিত জাতি-সংঘ যাহাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারেন— সাধারণ সম্মেলন এইভাবে সেই সুযোগ রচনা করিলেন।

যাহাতে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার সম্যক প্রচার হয় ও তাহা হইতে বৃহত্তর জনসাধারণের চিত্তে সাড়া জাগে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পুস্তক সংকলিত হইয়াছে।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি মান্যবর স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের একটি অনতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহাতে মহাত্মার জীবনদর্শনের মূল তত্ত্ব এবং জাতিতে জাতিতে প্রেম ও মৈত্রী-ভাবনা বর্ধনে তাঁহার প্রভাবের কথা থাকিবে।

মান্যবর স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের এই বহুমূল্য সহযোগ এবং কর্তৃস্থানীয় ভারতীয় যাঁহারা এই পুস্তক প্রণয়নে নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন— য়ুনেস্কো তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য অকাদেমীর সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানির নিপুণ সহায়তার জন্য য়ুনেস্কো তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছেন।

ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর ফরাসী ও স্পানিশ সংস্করণ প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে।

য়ুনেস্কো সংস্করণের মূল ইংরেজি হইতে

ভূমিকা

জগতে ক্বচিৎ মহাগুরুর আবির্ভাব হয়। এরূপ গুরুর আগমনের পূর্বে হয়তো শত শত বৎসর চলিয়া যায়। তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়াই লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে। তিনি প্রথমে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং পরে অন্যদের বলিয়া যান কি করিয়া তাহারাও অনুরূপ জীবন-যাপন করিতে পারিবে। গান্ধীজী ছিলেন এরূপ একজন আচার্য।

তাঁহার ভাষণ ও রচনা হইতে এই নির্বাচিত অংশগুলি বিশেষ যত্ন ও বিচারের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। সংকলয়িতা কৃষ্ণ কৃপালানির উদ্ধৃতি-গুলি হইতে পাঠকগণ গান্ধীজীর মনের বিকাশ, তাঁহার চিন্তার পরিণতি এবং কার্যতঃ যে-সমস্ত কর্ম-কৌশল তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে খানিকটা ধারণা পাইবেন।

গান্ধীজীর জীবনের মূল ছিল ভারতবর্ষের ধর্ম-বিষয়ক ঐতিহ্যে। এই ধর্মীয় আদর্শে বিশেষ জোর দেওয়া হয় সত্য সন্ধানের উৎসাহ ও অনুরাগে, জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়, অনাসক্তির আদর্শে এবং ভগবানকে জানার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবার আগ্রহের উপর। সারাজীবন ধরিয়া সত্যসন্ধানে তাঁহার অবিরাম চেষ্টা ছিল। গান্ধীজী বলিতেন, 'এই আদর্শের সন্ধানে আমি বাঁচিয়া আছি, আমি ইহারই সন্ধানে চলিয়াছি, আমার প্রাণ-শক্তি ইহাতেই নিহিত।'

যে-জীবনের মূল কোথাও নাই, যাহার পটভূমিকার গভীরতা নাই, তাহা নিতান্তই ভাসা-ভাসা, অন্তঃসারশূন্য। কেহ কেহ এরূপ মনে করেন, যখন আমরা ভালো বলিয়া কিছু বুঝিব তখন তাহা সাধন করিব। কথাটা এত সহজ নয়। যখন আমরা কোনো কাজ ন্যায্য বলিয়া জানিতে পারি তখন তাহাই বাছিয়া লইব ও ন্যায্য কাজই করিব— ইহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। প্রবল আবেগ আসিয়া আমাদের হটাইয়া দেয়, আমাদের মধ্যে যে আলো আছে তাহা অস্বীকার করিয়া আমরা অন্যায় কাজ করিয়া থাকি। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা আংশিকভাবে মানবপ্রকৃতি লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রবৃত্তির কতক অংশ এখনো পশুর অধিকারে। কেবল প্রেমের দ্বারা অধস্তন প্রবৃত্তির জয়লাভ করিলেই আমাদের ভিতরকার পশুর বিনাশ সাধন হইতে পারে। ভুলভ্রান্তি পরীক্ষার দ্বারা, আত্মানুসন্ধান এবং কঠোর সংযমের দ্বারা মানুষ অতিকষ্টে পরিপূর্ণতার পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে পারে।

গান্ধীর ধর্ম ছিল যুক্তিবাদের ধর্ম, নীতিবাদের ধর্ম। যে বিশ্বাস তাঁহার যুক্তিতে ভালো বোধ হইত না অথবা যে নির্দেশ তাঁহার বিবেক-সম্মত হইত না, তাহা তিনি গ্রহণ করিতেন না।

কেবল বুদ্ধির দ্বারা নহে, সমগ্র সত্তার দ্বারা যদি আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তাহা হইলে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী ও ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে আমরা ভালোবাসিব; সমগ্র মানবজাতির একতার জন্য আমরা কাজ করিব। 'আমার সমস্ত কাজের উৎস হইল মানবজাতির প্রতি একটা অবিচ্ছেদ্য প্রেম।' 'আত্মীয় ও পর, স্বদেশবাসী ও বিদেশী, সাদা ও কালো, হিন্দু ও ভারতবর্ষের মুসলমান, পারসী, খ্রীষ্টান, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মের লোকের মধ্যে আমি কোনো ভেদ দেখি না।' 'আমি বলিতে পারি যে আমাদের হৃদয়ে এরূপ প্রভেদ করিবার ক্ষমতাই নাই।' দীর্ঘকাল প্রার্থনাময় সাধনার ফলে চল্লিশ বৎসরেরও বেশি হইল কাহারো প্রতি আমার ঘৃণা নাই।' সকল মানুষ ভাই ভাই, কেহ কাহারো অজানা হইতে পারে না। সকলের উন্নতি, সর্বোদয়, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সকল মানুষকে একত্র বাঁধিবার সাধারণ সূত্র হইলেন ভগবান। আমাদের সর্বপ্রধান শত্রুর সহিতও এই সূত্র যদি ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে তাহা স্বয়ং ভগবানকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার সামিল। দুষ্টতম ব্যক্তির মধ্যেও মানবিক গুণ বর্তমান থাকে। [অসাধুশ্চৈব পুরুষো লভতে শীলমেকদা। মহাভারত ১২/২৫৯/১১]

জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকিলে স্বভাবতই লোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের জন্য অহিংসাকেই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে বলিতেন যে তিনি স্বপ্নবিলাসী নন, কর্মকুশল আদর্শবাদী। অহিংসা শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, সাধারণ লোকের পক্ষেও তাহা প্রশস্ত। 'অহিংসা হইল মানবজাতির ধর্ম; যেমন হিংসা হইল পশুদের ধর্ম। পশুর মধ্যে আত্মবোধ সুপ্ত থাকে এবং দৈহিক ক্ষমতার বাহিরে আর কোনো ধর্ম সে জানে না। মানুষের মর্যাদার জন্য প্রয়োজন উচ্চতর ধর্মের আনুগত্য স্বীকার, আত্মার শক্তির নিকট নতি স্বীকার।'

মানবের ইতিহাসে গান্ধীজীই সর্বপ্রথম অহিংসাধর্মকে ব্যক্তিজীবনের গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে প্রসারিত করিয়া দেন। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন অহিংসা লইয়া পরীক্ষার জন্য এবং ইহার বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য।

'কোনো কোনো বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে রাজনীতিতে ও জাগতিক কর্মে সত্য ও অহিংসার কোনো স্থান নাই। আমি সে-কথা স্বীকার করি

না। ব্যক্তিগত মোক্ষসাধনের জন্য সেগুলিতে আমার কোনো প্রয়োজন নাই। প্রতিদিনের জীবনে সেগুলির প্রবর্তন এবং প্রয়োগ বরাবর আমার সাধনার বিষয় হইয়া আসিয়াছে।'

'আমার নিকট ধর্ম-বিহীন রাজনীতি নিতান্তই অশুচি; উহা সর্বদাই বর্জনীয়। রাজনীতির ব্যবহার বহু জাতিকে লইয়া, এবং যাহা বহু জাতির কল্যাণের সহিত জড়িত তাহা নিশ্চয় যে-ব্যক্তি ধর্মভাবে ভাবিত তাহারও অভিনিবেশের বিষয়, অর্থাৎ ধর্মসন্ধানী ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তিরও ইহাই কাজ। আমার পক্ষে ভগবান ও সত্য— একে অন্যের রূপান্তর। যদি কেহ আমাকে বলে যে ভগবান হইলেন অন্যায়ের ভগবান, অত্যাচারের ভগবান, তাহা হইলে এরূপ ভগবানকে পূজা করিতে আমি অস্বীকার করিব। সুতরাং রাজনীতি-ক্ষেত্রেও আমাদের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।'

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি এই কথাটির উপর জোর দিতেন যে আমরা যেন অহিংসা ও কষ্ট-স্বীকারের পরিমার্জিত কর্মপ্রণালী গ্রহণ করি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার কর্মসাধনা বৃটেনের প্রতি কোনো ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আমরা পাপকে ঘৃণা করিব, পাপীকে নয়। 'আমার কাছে দেশভক্তি ও মানবপ্রেমে কোনো পার্থক্য নাই। আমি মানুষ এবং মানবিক-বৃত্তি-সম্পন্ন, সেইজন্য আমি দেশভক্ত। আমি ইংলণ্ড বা জার্মানিকে আঘাত করিয়া ভারতবর্ষের সেবা করিব না।' তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ইংরেজদের ভারতবর্ষের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে সাহায্য করিয়া তিনি ইংরেজদের উপকার করিলেন। তাহার ফলে শুধু ভারতবর্ষের লোকদের মুক্তি হইল না, মানবজাতির মুক্তির উপাদান ও নৈতিক সম্বলও সমৃদ্ধতর হইল।

বর্তমান আণবিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি জগৎকে রক্ষা করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের অহিংসাধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। 'আমি যখন শুনিলাম যে একটা আণবিক বোমা হিরোশিমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে তখন আমার একটি পেশীও নড়ে নাই। বরঞ্চ আমি নিজেকে বলিলাম : 'যদি জগৎ এখনো অহিংস-নীতি গ্রহণ না করে তবে নিশ্চয়ই ইহাতে মানবজাতির আত্মবিনাশ হইবে।' ভবিষ্যতের কোনো বিরোধে আমরা এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে দুই পক্ষের কেহ আণবিক অস্ত্র স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ত্যাগ ও কর্ম সাধনার দ্বারা অতি সযত্নে যাহা-কিছু আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি, এক মুহূর্তের সর্বনাশা আগুনের হল্‌কায় তাহা অন্ধভাবে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। অনর্থ প্রচারের দ্বারা মানুষের মনকে আমরা আণবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখি। যে-সব মন্তব্য সংগ্রামের প্রেরণা

জোগায় তাহা স্বচ্ছন্দে আকাশে বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। কথার মধ্য দিয়াও আমরা হিংসা প্রচার করি। কঠোর বিচার, অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা, ক্রোধ— এই সকলই হইল হিংসার প্রচ্ছন্ন রূপ।

বর্তমান যুগে আমরা যখন বিজ্ঞানের প্রবর্তিত নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না তখন অহিংসা, সত্য ও সদ্‌বুদ্ধি-প্রণোদিত নীতি গ্রহণ করা সহজ নহে। কিন্তু সেই কারণে আমাদের নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। রাজনৈতিক নেতাদের অনমনীয় মনোবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে, অন্যদিকে বিশ্বজনের সাধারণ বুদ্ধি ও বিচার আমাদের প্রাণে আশা জাগায়।

বর্তমান পরিবর্তনের দ্রুত গতি দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না যে আজ হইতে একশত বৎসর পরে পৃথিবীর চেহারা কিরূপ দাঁড়াইবে। ভবিষ্যতের চিন্তা ও ভাবের স্রোত কোন্ দিকে বহিবে আজ তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কালের গতি যে দিকেই লইয়া যাক, সত্য ও অহিংসার মহৎ নীতি আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য রহিয়াছে। ক্লান্ত ও বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর উপর নিঃশব্দ নক্ষত্রের ন্যায় জাগ্রত দৃষ্টিতে তাহারা পবিত্র প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে। গান্ধীজীর মতো আমাদেরও যেন দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে চলমান মেঘ তলদেশে থাকিলেও ঊর্ধ্ব আকাশে সূর্য দীপ্যমান থাকিবে।

আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করিতেছি যে-যুগের লোক নিজেদের ব্যর্থতা ও নৈতিক অপকর্ষের কথা জানে। অতীতে লোকে যাহা ধ্রুব বলিয়া জানিত এ-যুগে তাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে, পরিচিত আদর্শের ভিত্তিমূল শিথিল হওয়ায় ফাটল দেখা দিতেছে, অনুদারতা ও তিক্ততা বাড়িতেছে। সৃষ্টির যে-জ্যোতি সমগ্র মানবসমাজকে আলো দেখাইতেছিল তাহা হ্রাস পাইতেছে। মানবের মন বিভ্রান্তিকর ভাবে বিচিত্র। তাহার ফলে বিপরীত-ধর্মী মানুষের সৃষ্টি হয়— যেমন বুদ্ধ ও গান্ধী, নীরো ও হিটলার। ইতিহাসের এক মহামানব আমাদের যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমাদের সহিত বিচরণ করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন, সভ্য জীবন-যাপনের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। যে ব্যক্তি কাহারো প্রতি অন্যায় করে না, সে কাহাকেও ভয় করে না, তাহার লুকাইবার কিছু নাই, তাই সে নির্ভয়। সে প্রত্যেকের সহিত মুখ তুলিয়া কথা বলে। দৃঢ় তাহার পদক্ষেপ, ঋজু তাহার দেহ এবং তাহার কথা সহজ ও স্পষ্ট। বহুদিন পূর্বে প্লেটো বলিয়াছিলেন, 'জগতে সর্বদাই এমন কয়েকজন ভগবৎ-অনুপ্রাণিত ব্যক্তি থাকেন যাঁহাদের পরিচয় মূল্য দিয়া লাভ করা যায় না।'

নিউ দিল্লী, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৮ **সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন**

সূচী

প্রকাশকের নিবেদন	পাঁচ
মুখবন্ধ	ছয়
ভূমিকা	সাত
আত্মকথা	১
সত্য ও ধর্ম	৬৪
সাধ্য ও সাধন	৯৪
অহিংসা	৯৮
আত্মসংযম	১২৪
আন্তর্জাতিক শান্তি	১৩৪
মানুষ ও যন্ত্র	১৪১
প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য	১৪৭
গণতন্ত্র ও জনগণ	১৫৭
শিক্ষা	১৭২
নারী-সমাজ	১৮২
বিবিধ	১৯০
আকর-গ্রন্থ	২০৫

জগৎকে নতুন করিয়া শিখাইবার আমার কিছুই নাই।
সত্য ও অহিংসা শাশ্বত ও সনাতন।

— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

আত্মকথা

প্রকৃত আত্মজীবনী লেখার চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি শুধু সত্য সম্বন্ধে আমার বহু পরীক্ষার কথা বলিতে চাই; আর আমার জীবন যখন শুধু এই পরীক্ষাগুলির সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, তখন এই কথা সত্যই তো আত্মজীবনীর আকার ধারণ করিবে। যদি ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় শুধু আমার পরীক্ষারই কাহিনী থাকে তাহাও আমি গ্রাহ্য করি না। ১

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষার কথা এখন সকলেই জানে— শুধু ভারতবর্ষে নয়, খানিকটা 'সভ্য জগতে'ও বটে। আমার নিকট সেগুলির বিশেষ মূল্য নাই; এবং তাহারা আমার জন্য যে 'মহাত্মা' নামটি আনিয়া দিয়াছে তাহার মূল্য তো আরো কম। অনেক সময় এই উপাধিটি আমাকে গভীর ভাবে পীড়া দিয়াছে; এবং এমন একটি মুহূর্তও মনে পড়ে না যখন ইহা আমাকে ক্ষণিকও আনন্দ দিয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমার পরীক্ষার কথা নিশ্চয় আমি বলিতে চাই, তাহার কথা তো শুধু আমারই জানা। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করিবার আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাহা উহা হইতেই পাইয়াছি। পরীক্ষাগুলি যদি সত্যই অধ্যাত্মমূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মপ্রশংসার কোনো অবকাশ নাই। তাহারা শুধু আমার চিত্তের দৈন্য বাড়াইতে পারে। যতই আমি চিন্তা করি ও অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকাই, ততই আমি স্পষ্টভাবে আমার দুর্বলতা অনুভব করি। ২

আমি যাহা করিতে চাই— যাহা করিবার জন্য এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছি ও অপেক্ষা করিয়া আসিতেছি— তাহা হইল আত্মানুভূতি, ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা, মোক্ষ সাধন। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যই আমার জীবনধারণ। যাহা-কিছু বলি, যাহা-কিছু লিখি, রাজনীতিক্ষেত্রে যাহা-কিছু করি সকলেরই লক্ষ্য ঐ এক। কিন্তু আমি তো সর্বদা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে একের পক্ষে যাহা সম্ভব সকলের পক্ষেই তাহা সম্ভব। আমার পরীক্ষাগুলি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া করা হয় নাই। খোলা জায়গায় করা হইয়াছিল; আমি মনে করি না যে ইহা ত তাহাদের আধ্যাত্মিক মূল্যের কিছু হানি ঘটিয়াছে। কিছু কিছু এমন জিনিস আছে যাহা জীব ও তাহার স্রষ্টা পরমেশ্বরের জানা। সেগুলি

স্পষ্টই অন্যের গোচর করা যায় না। আমি যে-সব পরীক্ষার কথা বলিতে যাইতেছি, সেগুলি ও-ধরনের নয়। সেগুলি আধ্যাত্মিক, অথবা বলা চলে নৈতিক; কারণ ধর্মের মূল হইল নীতি। ৩

এই-সকল পরীক্ষা যে কোনোপ্রকার সম্পূর্ণতার কোঠায় পৌঁছিয়াছে সে-দাবি আমি কখনোই করিব না। বৈজ্ঞানিক, তাঁহার পরীক্ষা অত্যন্ত শুদ্ধভাবে, পূর্বকল্পিত বিধান অনুযায়ী ও সূক্ষ্মভাবে পরিচালনা করিয়াও, তাঁহার সিদ্ধান্ত যে শেষ কথা এরূপ দাবি কখনো করেন না, সে সম্বন্ধে খোলা মন রাখিয়া চলেন; তাঁহার অপেক্ষা আমি আমার পরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে বেশি দাবি কিছুই করি না। আমি গভীরভাবে আত্মচিন্তা করিয়াছি, নিজেকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি, মনের প্রত্যেকটি অবস্থা পরীক্ষা করিয়াছি ও বিশ্লেষণ করিয়াছি। তথাপি আমার সিদ্ধান্ত যে চরম বা অভ্রান্ত এ-কথা আমি কখনো দাবি করি না। একটা দাবি আমি অবশ্যই করি, তাহা হইল এই, আমার নিকট সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও অভ্রান্ত মনে হয়, এবং তখনকার মতো চরম বলিয়া মনে হয়। কারণ যদি তাহা না হইত তবে তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া কোনো কর্ম করা চলিত না। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে আমি গ্রহণ বা বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছি এবং তদনুসারে কর্মও করিয়াছি। ৪

আমার জীবন এক অখণ্ড সমগ্র বস্তু, আমার সকল কর্ম পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, তাহাদের সকলের উৎস হইল আমার দুর্নিবার অতৃপ্ত মানব-প্রীতি। ৫

গান্ধীরা জাতিতে বেনিয়া, সম্ভবতঃ গোড়ায় মুদিখানার ব্যাবসা করিত। কিন্তু আমার পিতামহ হইতে তিন যুগ পর্যন্ত তাঁহারা কাঠিয়াওয়াড়ের বিভিন্ন রাজ্যে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আমার পিতামহ নিশ্চয় নীতিপথে চলিতেন। রাজ্যের ষড়যন্ত্র তাঁহাকে পোরবন্দর ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সেখানে তিনি দেওয়ান ছিলেন, জুনাগড়ে আশ্রয় লইলেন। সেখানে তিনি নবাবকে অভিবাদন করিলেন বাঁ হাত দিয়া। এই আপাত-প্রতীয়মান অভদ্রতা সম্বন্ধে অবহিত করিয়া কেহ কৈফিয়ত চাহিলে এই বলা হইল : 'ডান হাতখানি তো ইতিপূর্বেই পোরবন্দরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে।' ৬

আমার পিতা তাঁহার গোষ্ঠীকে ভালোবাসিতেন। তিনি ছিলেন সত্য-পরায়ণ, সাহসী ও উদারহৃদয়। কিন্তু তাঁহার খুব সহজেই রাগ হইত।

এমন-কি, তিনি হয়তো খানিকটা ইন্দ্রিয়সুখের বশবর্তীও ছিলেন। কারণ তিনি চল্লিশ বৎসরের পরে চতুর্থবার বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্নীতির পথে কেহ তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরিবারের মধ্যে ও পরিবারের গণ্ডির বাহিরে, কঠোর পক্ষপাতশূন্যতার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। ৭

আমার মনে মায়ের যে-স্মৃতির বিশেষ ছাপ আছে তাহা হইল ধর্ম-প্রাণতার। তিনি গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন। নিত্য পূজা না করিয়া তিনি আহারের কথা ভাবিতেনই না।... তিনি কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা পালন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। দৈহিক অস্বাস্থ্য এ-বিষয়ে শৈথিল্যের হেতু ছিল না। ৮

এই পিতামাতার সন্তান আমি, পোরবন্দরে আমার জন্ম।... আমার শৈশব পোরবন্দরেই কাটে। মনে আছে, আমাকে স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেওয়া হইল। খানিকটা কণ্টেসৃষ্টে নামতা মুখস্থ করানো হইল। শুধু অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে গুরুমহাশয়কে নানা ভাবে গালি দেওয়া ছাড়া, এ-সব দিনের যে আর কিছুই আমার মনে পড়ে না, তাহাতে বিশেষ ভাবে এই কথাই অনুমান করা যায় যে আমার নিশ্চয় জড়বুদ্ধি ছিল, আর কিছুই মনে থাকিত না। ৯

আমি বড় লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না। বই ও লেখাপড়া আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল। ঘণ্টা বাজিলেই স্কুলে হাজির হওয়া আর স্কুলের ছুটি হইলেই ছুটিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসা— ইহাই ছিল আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। আমি সত্যসত্যই ছুটিয়া ফিরিতাম, কারণ কাহারও সঙ্গে কথা বলা আমার সম্ভব হইত না। কেহ যদি আমাকে ঠাট্টা করে ইহাও ছিল আমার ভয়। ১০

উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য। শিক্ষাপরিদর্শক মিঃ জাইল্‌স্‌ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বানান অনুশীলনের জন্য তিনি আমাদের পাঁচটি শব্দ লিখিতে দেন। তাহার মধ্যে একটি হইল kettle। বানানে আমার ভুল হইল। শিক্ষক তাঁহার জুতার অগ্রভাগ দিয়া সাহায্য করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি সে-সাহায্য লই নাই। তিনি যে চাহিয়াছিলেন আমি পাশের ছেলেটির শ্লেট দেখিয়া নকল করি, তাহা

আমি ধরিতেই পারি নাই। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরা যাহাতে নকল না করি শিক্ষক আছেন সেইজন্য। ফলে দেখা গেল, আমি ছাড়া অন্য সকলেই প্রত্যেকটি শব্দ শুদ্ধ ভাবে বানান করিয়াছিল। শুধু আমিই বোকা বনিয়া গেলাম। শিক্ষক পরে আমার এই বোকামি আমাকে বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল হইল না। 'নকল' করার বিদ্যাটা আমি আর কখনোই শিখিয়া উঠিতে পারে নাই। ১১

তেরো বৎসর বয়সে যে আমার বিবাহ হয় সে-কথা লিপিবদ্ধ করা আমার কঠোর কর্তব্য। যখন আমার তত্ত্বাবধানে আমারই চারিদিকে ঠিক ঐ একই বয়সের কিশোরদের দেখি, আর নিজের বিবাহের কথা চিন্তা করি, তখন অন্য সকলে আমার অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে এবং নিজের প্রতি কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ অতি বাল্যকালে বিবাহের সমর্থনে কোনো নৈতিক যুক্তি দেখিতে পাই না। ১২

উহার [ঐ বিবাহের] অর্থ আমার নিকটে শুধু ভালো কাপড়-চোপড় পরা, ঢাক-ঢোল বাজা, বিবাহ-শোভাযাত্রা বাহির হওয়া, সন্ধ্যাবেলায় ভালো খানা খাওয়ার ও একটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে খেলা করিবার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ছিল না। ইন্দ্রিয়সেবার কামনা পরের কথা। ১৩

ওঃ, সেই প্রথম রাত্রি! দুইটি নিষ্পাপ শিশুকে জীবনসমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহারা সে-বিষয়ে কিছু জানে না। সেই প্রথম রাত্রে কি ভাবে কি করিব সে-বিষয়ে বৌদিদি আমাকে ভালো করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া দিয়াছিলেন। আমার স্ত্রীকে কে শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহা জানি না। আমি তাহাকে আগে কখনো জিজ্ঞাসা করি নাই, এখনো জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি নাই। আমাদের দুইজনের পরস্পরের দিকে তাকাইবার সাহস ছিল না, এ-কথা পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের উভয়ের খুব লজ্জা তো ছিলই। আমি তাহার সঙ্গে কি করিয়া কথা বলি, বলিবই বা কি? শেখানো-পড়ানোও কিন্তু আমাকে বেশি কিছু সাহায্য করিতে পারিল না। কিন্তু এ-সব বিষয়ে সত্যই তো শেখানো-পড়ানোর প্রয়োজন নাই।... ক্রমে ক্রমে আমরা পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে পারিলাম, নিঃসংকোচে পরস্পর কথাবার্তা কহিতে পারিলাম। দুজনের একই বয়স। কিন্তু আমি স্বামীর অধিকার গ্রহণ করিলাম। ১৪

বলিতেই হইবে যে আমি তাহার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ছিলাম। স্কুলে বসিয়াও তাহার কথাই চিন্তা করিতাম। সন্ধ্যা হইবে, তাহার সঙ্গে তখন দেখা হইবে, এই চিন্তা সর্বদাই আমার মনে উঠিত। বিরহ অসহ্য ছিল। আমার অনর্থক কথা দিয়া তাহাকে অনেক রাত্র পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিতাম। এই বুভুক্ষু অনুরাগের সহিত যদি আমার মধ্যে জ্বলন্ত কর্তব্যনিষ্ঠা না থাকিত, তাহা হইলে হয় রোগে ভুগিয়া অকালমৃত্যুর কবলে পড়িতাম, নয় তো জীবন ভার হইয়া থাকিত। কিন্তু প্রতিদিন প্রাতঃকালে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করিতে হইত, এবং কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিবার প্রশ্ন তো উঠিতই না। এই শেষেরটিই আমাকে অনেকবার পতন হইতে বাঁচাইয়াছিল। ১৫

আমার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কোনো উচ্চ ধারণা ছিল না। আমি যখন পুরস্কার ও বৃত্তি পাইতাম তখন আশ্চর্য হইয়া যাইতাম। কিন্তু আমার চরিত্র সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইয়া চলিতাম। সামান্য কিছু ত্রুটি হইলে চোখ দিয়া জল পড়িত। যখন আমি তিরস্কারভাজন হইতাম অথবা শিক্ষকের দৃষ্টিতে সেইরূপ মনে হইত, তখন আমি আর তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না। মনে পড়ে, একবার আমাকে শাস্তিস্বরূপ প্রহার করা হইয়াছিল। শাস্তি আমি ততটা গ্রাহ্য করি নাই, কিন্তু আমাকে যে সেই শাস্তির উপযুক্ত মনে করা হইয়াছিল ইহাতে আমার চোখের জল আর বাঁধ মানিতেছিল না। ১৬

উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে আমার অল্প যে-কয়জন বন্ধু জুটিয়াছিল তাহার মধ্যে দুইজনকে অন্তরঙ্গ বলা যাইতে পারে। এই-সব বন্ধুত্বের একটিকে... আমি আমার জীবনের এক দুঃখান্ত নাটক বলিতে পারি। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। আমি সংস্কারকের ভাব লইয়া এই বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম। ১৭

পরে দেখিয়াছিলাম যে আমার হিসাবে ভুল হইয়াছিল। সংস্কারক যাহার ভুল সংশোধন করিবেন তাহার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা থাকিলে চলিবে না। প্রকৃত বন্ধুত্ব হইল আত্মায় আত্মায় সমভাব যাহা এ-জগতে বড় একটা দেখা যায় না। উভয়ে সমান প্রকৃতির হইলে সে-বন্ধুত্ব উপযুক্ত ও স্থায়ী হয়। বন্ধুদের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং বন্ধুত্বে সংস্কারের অবকাশ কোথায়? আমার মতে সকল ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাই বর্জনীয়; কারণ মানুষ ভালো অপেক্ষা মন্দটাই বেশি সহজে গ্রহণ করে।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত সখ্য চায় তাহাকে অবশ্যই নিঃসঙ্গ থাকিতে হইবে, নতুবা সমগ্র জগৎকে বন্ধু করিয়া লইতে হইবে। আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৮

এই বন্ধুটির কীর্তিকলাপ আমার উপর যেন ইন্দ্রজালের প্রভাব বিস্তার করিল। সে দীর্ঘ পথ দৌড়াইয়া যাইতে পারিত, এবং তাহার গতি ছিল অসাধারণরূপ দ্রুত। লম্ফদানের উচ্চতায় ও দীর্ঘতায় সে ছিল কুশলী। যে-কোনো পরিমাণ দৈহিক শাস্তি সে সহ্য করিতে পারিত। সে প্রায়ই আমাকে তাহার কীর্তিকলাপ দেখাইত, এবং মানুষ যেমন তাহার নিজের মধ্যে যে-সকল গুণের অভাব অন্যের মধ্যে সেগুলি দেখিতে পাইলে অভিভূত হইয়া পড়ে, আমিও তেমনই এই বন্ধুটির কীর্তিকলাপ দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতাম। ইহার পরে আমারও তাহার মতো হইবার প্রবল ইচ্ছা হইল। আমি নিজে দৌড়াইতে লাফাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আমারও কেন তাহার মতো দৈহিক শক্তি থাকিবে না? ১৯

আমি ভয়কাতুরে ছিলাম। চোরের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়, আমাকে প্রায়ই পাইয়া বসিত। রাত্রে আমি ভয়ে ঘরের বাহির হইতাম না। অন্ধকার আমার নিকট এক ভয়ংকর বস্তু ছিল। অন্ধকারে ঘুমানো আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল, ঐ বুঝি এক দিক দিয়া ভূত আসিতেছে, অন্য দিক দিয়া চোর আসিতেছে, আর-এক দিক দিয়া সাপ আসিতেছে—ঘরে আলো না থাকিলে আমার চোখে ঘুমই আসিত না। ২০

আমার বন্ধু আমার এই-সকল দুর্বলতার কথা জানিত। সে আমাকে বলিত, সে জীবন্ত সাপ হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে, চোরদের তোয়াক্কাই রাখে না, ভূতে তাহার বিশ্বাস নাই। আর এ-সব কি করিয়া সম্ভব হইল? সোজা উত্তর, মাংসাহারী বলিয়া। ২১

আমার উপর এ-সবের প্রভাব যাহা পড়িবার তাহাই পড়িল।... ক্রমশ আমার মনে হইতে লাগিল যে মাংসাহার ভালো; ইহাতে আমি সবল হইব, সাহস বাড়িবে, আর যদি সমস্ত দেশ মাংসাহারী হয়, তবে ইংরাজেরা হারিয়া যাইবে। ২২

যখনই এই-সকল গোপন ভোজে যোগ দিতাম, তখনই বাড়িতে নৈশ ভোজন বাদ দিতে হইত। মা স্বভাবতই আমাকে বাড়ি আসিয়া খাইতে

বলিতেন, এবং আমি খাইতে চাহিতেছি না কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি তাঁহাকে বলিতাম, "আজ আমার ক্ষুধা হয় নাই, আমার হজমের গোলমাল হইয়াছে।" এই-সব মিথ্যা কারণ বলিতে যে আমার অন্তরে বাধা হইত না তাহা নয়। আমি জানিতাম যে আমি মিথ্যা বলিতেছি, এবং মায়ের নিকট মিথ্যা বলিতেছি। ইহাও জানিতাম যে বাবা ও মা যদি জানিতে পারিতেন যে আমি মাংস খাই, তাহা হইলে তাঁহারা মনে মনে খুবই আঘাত পাইবেন। এই চিন্তা আমাকে মর্মান্তিক পীড়া দিতেছিল।

সুতরাং আমি মনে মনে ভাবিলাম, যদিও মাংসাহার একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এদেশে খাদ্যসংস্কারও একান্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি নিজের পিতা-মাতাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারণা করা মাংস না-খাওয়ার চেয়ে খারাপ। সুতরাং তাঁহাদের জীবিতকালে মাংসাহারের কথা উঠিতেই পারে না। তাঁহারা যখন থাকিবেন না এবং আমি স্বাধীন হইব, তখন আমি প্রকাশ্যে মাংসাহার করিব, কিন্তু যতদিন সে-সময় না আসে আমি মাংস বর্জন করিয়াই চলিব।

এই সিদ্ধান্ত আমার বন্ধুকে জানাইলাম। ইহার পর আমি আর মাংসাহার করি নাই। ২৩

আমার বন্ধু একবার আমাকে এক বেশ্যালয়ে লইয়া গেল। প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়া সে আমাকে ভিতরে পাঠাইল। সব পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। টাকাকড়ি যাহা দেওয়ার তাহা পূর্ব হইতেই দেওয়া ছিল। আমি পাপের গহ্বরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু ভগবান অনন্ত করুণাময়, তিনি আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিলেন। এই পাপের গর্তে আমি প্রায় অন্ধ ও মূক হইয়া গেলাম। আমি মেয়েটির কাছে তাহার বিছানার উপর গিয়া বসিলাম, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। স্বভাবতই তাহার ধৈর্য থাকিল না, গালাগালি দিয়া অপমান করিয়া সে আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। আমার তখন মনে হইল, ইহা যেন আমার পৌরুষের প্রতি আঘাত, লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাইতে চাহিলাম। কিন্তু তাহার পর হইতে এ পর্যন্ত ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছি যে তিনি আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। আমার জীবনে এইরূপ আরও চারিটি ঘটনার কথা মনে পড়ে, অধিকাংশ স্থলেই আমার ভাগ্যই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, আমার চেষ্টা নয়। একেবারে নৈতিক দিক দিয়া দেখিলে, এই-সব ঘটনাই আমার নৈতিক চ্যুতি বলিয়া ধরিতে হইবে, কারণ ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা তো ছিলই, বাসনা ও কর্ম তো সমপর্যায়ের। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে দৈহিক ইন্দ্রিয়গত পাপ

আচরণ হইতে রক্ষা পাইলেই মানুষ রক্ষা পাইল বলিয়া ধরা হয়। আমি শুধু সেই অর্থেই রক্ষা পাইলাম। ২৪

আমরা তো জানি যে মানুষ যতই লোভ দমন করিতে চেষ্টা করুক, সে প্রায়ই লোভের অধীন হয়; আবার ইহাও জানি যে ভগবান প্রায়ই মাঝখানে পড়িয়া সে না চাহিলেও তাহাকে রক্ষা করেন। এ-সব কি করিয়া হয়— মানুষ কতখানি স্বাধীন কতখানি বা ঘটনার দাস— স্বাধীন ইচ্ছা কতদূর কাজ করে আর ভাগ্যই বা কতখানি— এ সকলই রহস্যে আবৃত এবং রহস্যে আবৃতই থাকিয়া যাইবে। ২৫

আমার স্ত্রীর সঙ্গে মন-কষাকষির একটা কারণ অবশ্যই ছিল এই বন্ধুর সঙ্গ। আমি স্ত্রীকে ভালো তো বাসিতাম, আবার সন্দেহবাতিকগ্রস্তও ছিলাম। স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার সন্দেহের আগুন এই বন্ধুই বাড়াইয়া তুলিত। তাহার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে আমি কখনো সন্দেহ করিতে পারি নাই। তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া স্ত্রীকে বহুবার পীড়া দিয়া অপরাধী হইয়াছি, এই হিংসাভাবের জন্য কখনো নিজেকে ক্ষমা করিতে পারি নাই। হয়তো হিন্দু নারীই শুধু এই-সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিত, তাই আমি নারীকে সহিষ্ণুতার অবতার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। ২৬

সন্দেহকীট নির্মূল হইল, যখন আমি অহিংসার সমগ্র অর্থ ধরিতে পারিলাম। তখন আমি ব্রহ্মচর্যের মহিমা দেখিলাম, উপলব্ধি করিলাম যে স্ত্রী স্বামীর ক্রীতদাসী নহে, তাহার সঙ্গী ও সহায়, তাহার শোকে ও আনন্দে সমান অংশীদার,— স্বামীর মতো স্ত্রীও তাহার নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারে, সমান স্বাধীন। যখনই আমি সেই-সব সন্দেহবিষে অন্ধকার দিনগুলির কথা মনে করি, আমার নির্বুদ্ধিতা ও কামপ্রণোদিত নিষ্ঠুরতায় আমার মন ভরিয়া যায়, আমার বন্ধুর প্রতি অন্ধ ভক্তির জন্য আমি অনুশোচনা করি। ২৭

আমার ছয়-সাত বৎসর বয়স হইতে ষোলো বৎসর পর্যন্ত আমি যখন স্কুলে ছিলাম, তখন ধর্ম ভিন্ন অন্য সকল বিষয় আমাকে শেখানো হইত। আমি বলিতে পারি শিক্ষকেরা বিনা চেষ্টায় আমাকে যাহা দিতে পারিতেন তাহা আমি পাই নাই। তথাপি আমার পরিবেশ হইতে এখানে-ওখানে নানা বিষয় কুড়াইতে থাকিলাম। 'ধর্ম' কথাটা আমি উদার অর্থে প্রয়োগ করিতেছি, আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান অর্থে। ২৮

কিন্তু একটা জিনিস আমাতে বদ্ধমূল হইয়া রহিল— তাহা হইল এই ধারণা যে নীতিই সকল বিষয়ের ভিত্তি, সত্যই সকল নীতির সার। সত্য আমার একমাত্র লক্ষ্য হইল। ইহা প্রতিদিন আয়তনে বাড়িতে লাগিল, আমার সত্যের সংজ্ঞাও বাড়িয়া চলিয়াছে। ২৯

অস্পৃশ্যতাকে আমি হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক মনে করি। ইহা দক্ষিণ-আফ্রিকার সংগ্রামে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল নয়। আমি এক-সময়ে অজ্ঞেয়বাদী ছিলাম বলিয়াও নয়। খ্রীষ্টীয় ধর্মসাহিত্য পড়িয়া আমার মনোভাব এরূপ হইয়াছে এ-কথা বলাও ভুল। আমার এই মনোভাব সেই সময়কার যখন আমি বাইবেল অথবা বাইবেলের অনুগামীদের প্রেমে পড়ি নাই, অথবা তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হই নাই।

যখন আমার এই ধারণা প্রথম হইল তখন আমার বয়স বোধ করি বারো বৎসরও হয় নাই। উকা নামে একজন অস্পৃশ্য ঝাড়ুদার, পায়খানা পরিষ্কার করিবার জন্য আমাদের বাড়িতে আসিত। মাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতাম, উহাকে ছুঁইলে কি অন্যায় হয়, উহাকে ছোঁওয়া বারণ কেন। তাহাকে হঠাৎ ছুঁইয়া ফেলিলে আমাকে স্নান করিতে বলা হইত, আমি তো সে-কথা অবশ্যই শুনিতাম, কিন্তু হাসিতে হাসিতে প্রতিবাদও করিতাম যে অস্পৃশ্যতা ধর্মানুমোদিত নহে, ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না। আমি কর্তব্যপরায়ণ ও বাধ্য ছেলে ছিলাম, এবং পিতামাতার সম্মান রাখিয়া যতদূর সম্ভব প্রায়ই তাঁহাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে তর্ক করিতাম। মাকে বলিলাম যে উকার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হইলে পাপ হয় তাঁহার এ-কথা সম্পূর্ণ ভুল। ৩০

১৮৮৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিলাম। ৩১

বড়রা চাহিয়াছিলেন যে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর কলেজে পড়ি। বোম্বাইতে কলেজ ছিল, ভবনগরেও কলেজ ছিল। শেষেরটিতে খরচ কম বলিয়া আমি সেখানে গিয়া সামলদাস কলেজে ভর্তি হইলাম। গেলাম বটে, কিন্তু দেখিলাম চারিদিকে একেবারে সমুদ্র। সবই কঠিন। অধ্যাপকদের বক্তৃতার রসগ্রহণ করিব কি, কিছু বুঝিতেই পারিতাম না। তাঁহাদের দোষ ছিল না, ঐ কলেজের অধ্যাপকেরা প্রথম শ্রেণীর বলিয়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু আমি খুব কাঁচা ছিলাম। প্রথম কয় মাসের পর ছুটি হইলে আমি বাড়ি ফিরিয়া গেলাম। ৩২

ছুটির মধ্যে পরিবারের পুরাতন বন্ধু ও পরামর্শদাতা জনৈক বুদ্ধিমান

ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ,... বেড়াইতে ও আমাদের দেখিতে আসিলেন। মা ও দাদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আমার পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সামলদাস কলেজে পড়িতেছি জানিয়া তিনি বলিলেন : 'যুগের পরিবর্তন হইয়াছে।... উহাকে ইংলণ্ডে পাঠাও না কেন? আমার ছেলে কেবলরাম বলে যে ব্যারিস্টার হওয়া খুব সহজ। তিন বৎসর পরে ও ফিরিয়া আসিবে। খরচপত্রও চার-পাঁচ হাজার টাকার বেশি লাগিবে না। ঐ যে ব্যারিস্টার সেদিনই ইংলণ্ড হইতে ফিরিল তাহার কথা ভাব। তাহার চাল-চলন কি ফ্যাশন-দুরস্ত! চাহিলেই দেওয়ানের কাজ পাইতে পারে। আমি তোমাদের জোর করিয়াই বলি, মোহনদাসকে এই বৎসরই ইংলণ্ডে পাঠাও। ৩৩

মা খুবই গোলে পড়িলেন।... কে তাঁহাকে বলিয়াছিল, ছেলেরা ইংলণ্ডে গেলে হারাইয়া যায়। কে বলিয়াছিল, তাহারা মাংস খায়; আর-একজন বলিয়াছিল, সেখানে মদ না খাইলে বাঁচে না। 'সে সবের কি হইবে?' তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, 'মা, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? আমি তোমার নিকট মিথ্যা বলিব না। আমি দিব্য করিতেছি এ-সবের কিছুই আমি স্পর্শ করিব না। এমন বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে জোশীজি কি আমাকে যাইতে বলিতেন?'... আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, মদ, মেয়ে, মাংস আমি স্পর্শ করিব না। ইহার পর মা আমাকে অনুমতি দিলেন। ৩৪

পড়াশুনার জন্য লণ্ডনে আমার যাওয়ার অভিপ্রায় বাস্তব আকার ধারণ করিবার পূর্বে কিন্তু আমার মনে গোপন কল্পনা ছিল, লণ্ডন যে কি তাহা জানিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যাইব। ৩৫

আঠারো বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গেলাম। সব কিছুই সেখানে আশ্চর্য—লোকগুলি অদ্ভুত, তাহাদের চালচলন অদ্ভুত, তাহাদের বাসস্থান অদ্ভুত। ইংরেজি আদব-কায়দা সম্বন্ধে আমি একেবারে আনকোরা ছিলাম। সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত। নিরামিষাহারের ব্রত আবার একটা বাড়তি অসুবিধা। যে-সকল খাদ্য আমি খাইতে পাইতাম তাহাও নীরস, বিস্বাদ। আমি উভয়-সংকটে পড়িলাম। ইংলণ্ড আমি সহ্য করিতে পারিব না, আবার ভারতবর্ষে এখনই ফিরিবার কথা তো ভাবাই যায় না। অন্তরের বাণী বলিয়া দিল, এখন আসিয়াছ যখন, তিন বৎসর শেষ করিয়াই যাইতে হইবে। ৩৬

আমার জন্য কি প্রস্তুত করিতে হইবে, বাড়িওয়ালী তাহা ভাবিয়া পাইতেন না।... আমার বন্ধু[১] সর্বদাই মাংসাহারের পক্ষে যুক্তি দিতেন, আমি সর্বদাই ব্রতের কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম।... একদিন বন্ধু আমাকে বেন্থাম-এর 'থিওরি অফ্ ইউটিলিটি' পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আমি তো হতভম্ব। ভাষা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। তিনি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, 'মাপ করিবেন। এই-সব ভাবগত আলোচনা আমার নাগালের বাহিরে। মাংসাহারের প্রয়োজন আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমি আমার ব্রতভঙ্গ করিতে পারি না, কিংবা এ-বিষয়ে তর্ক করিতে পারি না।' ৩৭

প্রত্যহ দশ-বারো মাইল জোরে হাঁটিয়া একটা সস্তা রেস্তোরাঁতে গিয়া ভরপেট রুটি খাইতাম। কিন্তু কখনো তৃপ্তি হইত না। এই-সব ঘোরা-ঘুরির সময় ফ্যারিংডন স্ট্রীটে একটা নিরামিষ রেস্তোরাঁর একবার সন্ধান পাইলাম। ছোট শিশু তাহার মনোমত জিনিস পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, ইহা দেখিয়া আমার তেমনি আনন্দ হইল। প্রবেশ-পথে দরজার নিকট কাচের জানলার নীচে কতকগুলি বই বিক্রয়ের জন্যে সাজানো আছে দেখিতে পাইলাম। তাহাদের মধ্যে সল্ট-এর 'প্লী ফর্ ভেজেটেরিয়ানিজম্' নিরামিষ ভোজনের পক্ষে যুক্তি— দেখিতে পাইয়া এক শিলিং দিয়া তাহা কিনিলাম। কিনিয়া সোজা খাবার ঘরে চলিয়া গেলাম। ইংলণ্ডে আসিবার পর এই আমার প্রথম তৃপ্তি করিয়া ভোজন। ভগবান আমার সহায় হইয়াছেন।

সল্ট-এর বইখানি আমি আগাগোড়া পড়িলাম। আমার খুবই ভালো লাগিল। বলিতে পারি যে এই বইখানি পড়িবার দিন হইতে আমি যথার্থ যুক্তিবাদী নিরামিষাশী হইলাম। যে-দিন মায়ের নিকট ব্রতধারণ করিয়াছিলাম সেই দিনের কথা মনে পড়িল, সেই দিনকে ধন্যবাদ। সত্যরক্ষা করিবার জন্য এবং ব্রতপালনের জন্য সর্বদা মাংসাহারে বিরত ছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ইচ্ছাও ছিল যে ভারতবাসী প্রত্যেকেরই মাংসাহারী হইতে হইবে, আমিও একদিন স্বেচ্ছায় ও খোলাখুলি ভাবে মাংসাহারী হইয়া অন্যকেও দলভুক্ত করিব। এখন তো নিরামিষ আহারের পক্ষ বাছিয়া লইলাম, এখন হইতে ইহার প্রচারই আমার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ৩৮

যে-ধর্মে মানুষের জন্ম সেই ধর্মে তাহার যতটা না উৎসাহ, ধর্মান্তরিত

---

১ জনৈক বন্ধু, গান্ধীজি ইঁহার সঙ্গে রিচমন্ড-এ এক মাস বাস করিয়াছিলেন।

ব্যক্তির নূতন ধর্মে উৎসাহ তদপেক্ষা অনেক বেশি। ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজন তখন নূতন ধর্ম ছিল। আমার পক্ষেও নূতন ধর্ম, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, আমি সেখানে মাংসভোজনে বিশ্বাস লইয়াই গিয়াছিলাম, পরে তো বুদ্ধির দিক দিয়া নিরামিষ ভোজন গ্রহণ করিয়াছিলাম। নবধর্মে-দীক্ষিতের উৎসাহ তখন নিরামিষ ভোজনের জন্য ভরপুর। আমার পল্লীতে, বেজওয়াটার-এ, একটা নিরামিষাশীদের সমিতি খুলিব ঠিক করিলাম। স্যার এডুইন আর্নল্ড্ সেখানে থাকিতেন, তাঁহাকে সহ-সভাপতি হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম। 'ভেজেটেরিয়ান্' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ওল্ডফিল্ড সভাপতি হইলেন। আমি নিজে হইলাম সম্পাদক। ৩৯

ভেজেটেরিয়ান্ সোসাইটির কার্যকরী সমিতিতে আমি সভ্য নির্বাচিত হইলাম। প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত হইতাম, কিন্তু সর্বদাই আমার মুখ কে যেন চাপা দিয়া রাখিত।... কথা বলিবার লোভ যে কখনো হইত না, তাহা নয়। কিন্তু কি করিয়া নিজের ভাব প্রকাশ করিব তাহা মোটেই বুঝিতাম না।... ইংলণ্ডে থাকার সময় বরাবর এই লজ্জা আমার ছিল। এমন কি যখন বন্ধুভাবে কাহারও বাড়ি যাইতাম, ছয় জন কি আরো বেশি লোক থাকিলে আমি বোবা হইয়া যাইতাম। ৪০

এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে মাঝে মাঝে হাসির খোরাক জোগাইতাম বটে, কিন্তু আমার স্বভাবের এই লজ্জার ভাব আমাকে কোনো অসুবিধায়ই ফেলে নাই। বরং আমি দেখিতে পাইতেছি যে ইহাতে আমার পুরাপুরি সুবিধাই হইয়াছে। কথা বলিতে যে ঠেকিয়া যাইতাম তাহাতে এক সময়ে বিরক্ত বোধ হইত, এখন মজাই লাগে। ইহাতে সবচেয়ে লাভ হইয়াছে এই যে, আমাকে ইহা কম শব্দ প্রয়োগ করিতে শিখাইয়াছে। ৪১

প্যারিসে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটা বড় প্রদর্শনী হইল। ইহার প্রস্তুতির সমারোহের কথা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, প্যারিস দেখিবারও খুব ইচ্ছা ছিল। ভাবিলাম যে একসঙ্গে দুইটা জিনিসই হইবে, এই সময়ে ওইখানে যাইব। প্রদর্শনীর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল ইফেল টাওয়ার, একেবারে লোহা দিয়া তৈয়ারী, আর প্রায় হাজার ফুট উচ্চ হইবে। অবশ্য আরো অনেক দেখিবার জিনিস ছিল, কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিল ঐ টাওয়ার, কারণ তখন পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে অত উচ্চ জিনিস নিরাপদে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। ৪২

প্রদর্শনীটি খুব প্রকাণ্ড ও বিচিত্র, এ-ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই। ইফেল টাওয়ার মোটামুটি মনে আছে, কারণ দুইবার কি তিনবার তাহার উপর উঠিয়াছিলাম। প্রথম প্ল্যাটফরমের উপর একটি ভোজনাগার ছিল। খুব উচ্চে মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছি, এই কথা বলিতে পারার আনন্দে সাত শিলিং নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

প্যারিসের পুরানো গীর্জাঘরগুলি এখনো আমার মনে আছে। তাহাদের গাম্ভীর্য ও শান্তি ভুলিবার নয়। 'নোত্র দাম'-এর অদ্ভুত গড়ন ও তাহার ভিতরের জটিল অলংকরণ ও সুন্দর ভাস্কর্য ভোলা যায় না। তখন আমার মনে হইয়াছিল, যাহারা কোটি কোটি টাকা ভগবানের ক্যাথেড্রলে এরূপ ব্যয় করিয়াছে তাহাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম থাকিবেই। ৪৩

ইফেল টাওয়ার সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে হইবে। আজ ইহা কি কাজে লাগে তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু তখন ইহার নিন্দাও শুনিয়াছি, প্রশংসাও শুনিয়াছি বিস্তর। নিন্দাকারীদের মধ্যে টলস্টয় প্রধান ছিলেন মনে পড়ে। তিনি বলিতেন যে ইফেল টাওয়ার মানুষের বুদ্ধির নয়, বুদ্ধিহীনতার স্মৃতিস্তম্ভ। তাঁহার যুক্তি ছিল : তামাক হইল মাদকদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, কারণ যে-ব্যক্তি তামাকের দাস সে যে-সমস্ত পাপ-কার্য করিতে যাইবে, একজন মদ্যপ কখনো তাহা করিতে সাহস করিবে না। মদ মানুষকে পাগল করে, কিন্তু তামাক তাহার বুদ্ধিকে ঘোলাটে করিয়া দেয়, তাহাকে দিয়া আকাশকুসুম রচনা করায়। ইফেল টাওয়ার হইল এরূপ প্রভাবগ্রস্ত মানুষের অন্যতম কৃতি। ইফেল টাওয়ারের চারি দিকে কোনো শিল্প নাই, প্রদর্শনীর প্রকৃত সৌন্দর্যের দিকে ইহা যে কোনো-কিছু দান করিয়াছে তাহা কোনোক্রমেই বলা যায় না। লোকে ইহা দেখিতে আসিয়া ভিড় করিত, এবং ইহা যেন একটা নতুন কিছু, অদ্ভুত ইহার অবয়ব, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য উপরে উঠিত। ইহা ছিল প্রদর্শনীর খেলনা। আমরা যতদিন ছেলেমানুষ থাকি খেলনা ততদিন আমাদের আকর্ষণ করে, আর আমরা যে সকলেই ছেলেমানুষ, খেলনার প্রতি আমাদের যে সকলেরই আকর্ষণ আছে, টাওয়ারটি তাহার একটি ভালো প্রমাণ। ইফেল টাওয়ার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া দাবি করিতে পারা যায়। ৪৪

আমি পরীক্ষাগুলি পাস করিলাম, ১০ই জুন ১৮৯১ সালে 'বার'-এ ভর্তি হইলাম, ১১ই হাইকোর্টে নাম লেখাইলাম। ১২ই জাহাজে দেশে রওনা হইলাম। ৪৫

আমার দাদার আমার উপর খুবই ভরসা ছিল। টাকাকড়ি নাম যশ অর্জনের ইচ্ছা তাঁহার খুবই ছিল। তাঁহার হৃদয় ছিল প্রশস্ত, উদারতা দোষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ছিল তাঁহার সরল স্বভাব। ফলে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা ছিল অনেক, তাহাদের সাহায্যে তিনি আমাকে 'ব্রিফ' জোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও ধরিয়া লইয়াছিলেন যে আমার জোর পসার হইবে, এবং সে-আশায় গৃহ-খরচ উপরের দিকে বাড়িতে দিয়াছিলেন। আমার পসার যাহাতে বাড়ে সেজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ৪৬

কিন্তু বোম্বাইতে চার-পাঁচ মাসের বেশি চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনো সমতাই রহিল না।

এইভাবে আমার জীবনের আরম্ভ। ব্যারিস্টারের ব্যবসায় আমি দেখিলাম বড় গোলমালের— ভড়ং বেশি, জ্ঞান কম। আমার দায়িত্বজ্ঞান আমাকে যেন পিষিয়া ফেলিতে লাগিল। ৪৭

নিরাশচিত্তে আমি বোম্বাই ছাড়িয়া রাজকোটে গেলাম, সেখানে অফিস খুলিলাম। সেখানে নিতান্ত মন্দ চলিল না। দরখাস্ত ও স্মারকলিপির মুসাবিদা করায় আমার গড়ে মাসে তিন শত টাকা আয় হইতে থাকিল। ৪৮

ইতিমধ্যে পোরবন্দর হইতে এক মেমন বাণিজ্য-সংস্থা আমার দাদাকে নিম্নরূপ প্রস্তাব পাঠাইয়া পত্র লিখিল : 'আমাদের দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্যবসায় আছে— বড় কারবার। কোর্টে আমাদের একটি বড় মকদ্দমা আছে, চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের দাবি; অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছে। সবচেয়ে বড় উকিল-ব্যারিস্টার আমরা নিযুক্ত করিয়াছি। যদি আপনি আপনার ভাইকে সেখানে পাঠান, তিনি আমাদের কাজে লাগিবেন, তাঁহারও কাজ হইবে। আমরা যতটা পারি তাহার চেয়ে তিনি আমাদের উকিল-ব্যারিস্টারদের আরো ভালো করিয়া বুঝাইতে পারিবেন। তাহার উপর তাঁহার সুবিধা হইবে, জগতের একটা নূতন দিক তিনি দেখিবেন, নূতন নূতন পরিচয় লাভ হইবে।' ৪৯

ঠিক ব্যারিস্টার হইয়া যাওয়া নয়, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মী হইয়া যাওয়া। কিন্তু কোনোপ্রকারে আমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম। নূতন দেশ দেখিব, নূতন অভিজ্ঞতা হইবে, তাহারও লোভনীয় সুযোগ। দাদাকেও ১০৫ পাউণ্ড পাঠাইয়া গৃহব্যয়-নির্বাহে সাহায্য

করিতে পারিব। কোনো দরদস্তুর না করিয়া প্রস্তাবে সম্মত হইলাম এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ৫০

ইংলণ্ড যাওয়ার সময় যেমন অনুভব করিয়াছিলাম, দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাওয়ার সময় সেরূপ বিয়োগব্যথা বোধ করি নাই। আমার মাতা এ-সময়ে আর জীবিত ছিলেন না। সংসারের ও বিদেশভ্রমণের কিছু জ্ঞান হইয়াছিল, রাজকোট হইতে বোম্বাই যাওয়া মামুলি ব্যাপারই ছিল।

এবার শুধু আমার স্ত্রীর নিকট বিদায় লইবার ব্যথাই অনুভব করিলাম। আমার বিলাত হইতে ফিরিবার পর আর-একটি শিশু জন্মিয়াছিল। এখনো আমাদের ভালবাসা কামগন্ধহীন বলা যাইত না, কিন্তু তাহা ক্রমেই পবিত্র হইতেছিল। আমার ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর আমরা খুব কমই একত্র থাকিয়াছি; এখন তো আমি তাঁহার শিক্ষক, শিক্ষাদানে যতই অপটু হই। কতকগুলি বিষয়ের সংস্কারে তাহাকে সাহায্য করিতেছিলাম; আমরা দুজনেই আরো একত্র থাকিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলাম, সংস্কারগুলি চালাইয়া যাইতেও তাহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার আকর্ষণ এই বিরহকে সহনীয় করিয়া তুলিল। ৫১

নাটালের বন্দরের নাম ডারবান, পোর্ট নাটালও ইহার একটি নাম। আবদুল্লা শেঠ আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ যখন বন্দরঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, লোকেরা জাহাজে উঠিয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, তখন লক্ষ্য করিলাম, ভারতীয়দের লোকে তেমন শ্রদ্ধা করে না। আবদুল্লা শেঠকে যাহারা জানিত তাহাদের আচরণে এক ধরনের মুরুব্বিয়ানা লক্ষ্য না করিয়া পারিলাম না। ইহাতে মনে ব্যথা পাইলাম। যাহারা আমার দিকে তাকাইল, তাহাদের দৃষ্টিতে ছিল একটা কৌতূহলের ভাব। আমার পরনে ছিল একটা ফ্রক কোট, মাথায় ছিল পাগড়ি। ৫২

আমার আসার পরে দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে তিনি আমাকে ডারবান কোর্ট দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং তাঁহার অ্যাটর্নির পাশে আমাকে বসাইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলেন, অবশেষে আমার পাগড়ি খুলিতে বলিলেন। আমি তাহা করিতে অস্বীকার করিয়া কোর্ট ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। ৫৩

আমার আসার সাত দিনের দিন কি আট দিনের দিন আমি ডারবান ছাড়িয়া প্রিটোরিয়া যাত্রা করিলাম। আমার জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর আসন নির্দিষ্ট ছিল।... প্রায় রাত্রি নয়টায় ট্রেন নাটালের রাজধানী মারিজ-বার্গে পৌঁছিল। এই স্টেশনে বিছানা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রেলওয়ে কর্মী একজন আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বিছানা চাই কি না। আমি বলিলাম, 'না, আমার সঙ্গেই বিছানা আছে।' সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরে একজন যাত্রী আসিল। সে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল আমি 'কালা' আদমি। ইহাতে সে অস্থির হইল। বাহিরে গিয়া দুই-একজন কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া আবার আসিল। সকলে চুপচাপ, এমন সময়ে আর-একজন কর্মচারী আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'এসো, তোমাকে আগের দিকে যে-কামরা আছে সেখানে যাইতে হইবে।'

'কিন্তু আমার তো প্রথম শ্রেণীর টিকেট আছে,' আমি বলিলাম।

'তাহাতে কিছু আসে যায় না,' লোকটি উত্তর দিল। 'আমি বলিতেছি, তোমাকে আগের কামরায় যাইতেই হইবে।'

'আমি আপনাকে বলিতেছি, ডারবানে এই কামরাতে আমাকে উঠিতে দেওয়া হইয়াছে, এই কামরাতেই আমি যাইব।'

'না, আপনি যাইবেন না,' কর্মচারীটি বলিল। 'আপনাকে এই কামরা ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, না হইলে আপনাকে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য পুলিস কনস্টেবল ডাকিতে হইবে।'

'হাঁ, তা আপনি পারেন। আমি নিজের ইচ্ছায় যাইব না।'

কনস্টেবল আসিল। সে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল। আমার লগেজও বাহিরে আনা হইল। আমি অন্য কামরায় যাইতে অস্বীকার করিলাম. ট্রেন ধোঁওয়া ছাড়িয়া বাহির হইল। আমি গিয়া ওয়েটিং-রুমে বসিলাম. হাতব্যাগ আমার কাছে থাকিল। অন্য লগেজ যেখানকার সেখানে পড়িয়া রহিল। রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষ ইহার ভার লইলেন।

তখন শীতকাল, দক্ষিণ-আফ্রিকার উচ্চতর অংশে শীতকাল বড়ই ঠাণ্ডা। মারিজবার্গ বেশ উঁচুতে বলিয়া কড়া শীত পড়িয়াছিল। আমার ওভার-কোটটা ছিল লগেজের মধ্যে, তাহা চাহিতে গিয়া যদি আবার অপমানিত হই সেইজন্য আমি সাহস করিয়া চাহিলাম না। সুতরাং বসিয়া বসিয়া শীতে কাঁপিতে হইল। ঘরে কোনো আলো ছিল না। প্রায় মধ্যরাত্রে একজন যাত্রী আসিল. সম্ভবত তাহার ইচ্ছা ছিল যে আমার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু আমার মনোভাব গল্প করিবার মতো ছিল না।

আমার কর্তব্যের কথা চিন্তা করিতে থাকিলাম। আমার অধিকারের

জন্য সংগ্রাম করিব, না ভারতে ফিরিয়া যাইব, না অপমান গ্রাহ্য না করিয়া প্রিটোরিয়া যাইব এবং মামলা শেষ করিয়া ভারতে ফিরিব? আমার দায়িত্ব পালন না করিয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া যাওয়া কাপুরুষতা হইবে। যে-কষ্ট আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে তাহা উপর-উপর, যে-বিদ্বেষের গভীর রোগ ভিতরে ভিতরে আছে তাহার লক্ষণ মাত্র। সম্ভব হইলে রোগ নির্মূল করিয়া ফেলাই উচিত, সে-কাজে তো কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। অন্যায়ের প্রতিকার সেইটুকুই চাহিব, বর্ণবিদ্বেষ দূর করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন।

সুতরাং পরে যে-ট্রেন পাইব তাহাতেই প্রিটোরিয়া যাওয়া স্থির করিলাম। ৫৪

আমার প্রথম কাজ হইল, প্রিটোরিয়ায় সকল ভারতবাসীকে এক সভায় ডাকিয়া ট্রান্সভালে তাহাদের অবস্থার একটা চিত্র তাহাদের সম্মুখে রাখা। ৫৫

এই সভায় যে-বক্তৃতা দিই তাহাই আমার জীবনে সাধারণ্যে প্রথম বক্তৃতা বলা যাইতে পারে। আমি মোটামুটি আমার বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলাম, বিষয় হইল ব্যবসায়ে সত্যপরায়ণতা। ব্যবসায়ীদের আমি সর্বদাই বলিতে শুনিতাম যে ব্যবসায়ে সত্য আচরণ চলে না। আমি তখনো সে-কথা মানিতাম না, এখনো মানি না। এখনো এমন-সব ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন যাঁহারা ধরিয়া আছেন যে সত্য পালনের সঙ্গে ব্যবসা করা খাপ খায় না। তাঁহারা বলেন, ব্যবসায় হইল কর্মজগতের কথা, আর সত্য হইল ধর্মজগতের; তাঁহাদের যুক্তি হইল, কর্ম একপ্রকারের বস্তু, আর ধর্ম একেবারে স্বতন্ত্র প্রকারের। তাঁহাদের মতে বিশুদ্ধ সত্য ব্যবসায়ে একেবারে অচল, যতটা সম্ভব ততটাই আচরণ করা যায়। আমার বক্তৃতায় আমি প্রবলভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলাম এবং ব্যবসায়ীদের তাঁহাদের দ্বিবিধ কর্তব্যে উদ্‌বুদ্ধ করিলাম। বিদেশে তাঁহাদের সত্যপরায়ণ হইবার দায়িত্ব আরো বেশি, কারণ অল্প কয়জন ভারতীয়ের আচরণ তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আচরণের পরিমাপ। ৫৬

রাস্তার ফুটপাথ দিয়া চলিবার যে-সব নিয়মকানুন তাহার ফল আমার পক্ষে একটু বিষম হইয়া দাঁড়াইল। আমি সর্বদা প্রেসিডেণ্ট স্ট্রীটের ভিতর দিয়া এক উন্মুক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে যাইতাম। এই রাস্তার উপরই প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ি ছিল— খুবই সাধারণ গোছের, অনাড়ম্বর ভবন,

তাহাতে কোনো বাগান ছিল না, কাছাকাছি অন্যান্য বাড়ি হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবার মতো কিছু ছিল না। প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে অনেক লক্ষপতির বাসস্থান, তাঁহাদের অনেকের বাড়িতে ইহার চেয়ে অনেক বেশি জাঁকজমক ছিল, চারি দিকে বাগান ছিল। সত্য কথা বলতে কি, প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের সরল জীবনযাপন প্রবাদবাক্যে দাঁড়াইয়াছিল। কেবল বাড়ির সামনে পুলিশ প্রহরা থাকায় বুঝাইত যে উহা কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর আবাস। আমি প্রায় সর্বদাই ফুটপাথের উপর দিয়া এই পুলিস প্রহরার পাশ দিয়া যাইতাম, সামান্য অসুবিধা বা বাধা পাই নাই।

এখন প্রহরায় রত লোক সময় হিসাবে বদল হইত। একদিন ইহাদের একজন আমাকে সতর্ক হইবার জন্য মুহূর্তের অবকাশ না দিয়া, এমন-কি ফুটপাথ ছাড়িয়া আমাকে যাইতে না বলিয়া, আমাকে ধাক্কা দিয়া ও লাথি মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। আমি তো হতভম্ব। তাহার আচরণের বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মিঃ কোটস, যিনি ঘোড়ায় চড়িয়া ঐখান দিয়া যাইতেছিলেন, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন :

'গান্ধী, আমি সবই দেখিয়াছি। লোকটার বিরুদ্ধে নালিশ করিলে আমি কোর্টে আপনার হইয়া সানন্দে সাক্ষী দিব। আপনাকে এত বর্বরের মতো মারিয়াছে সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত।'

আমি বলিলাম: 'আপনি দুঃখিত হইবেন কেন? ও বেচারা কি-বা জানে? তাহার কাছে সব কালা আদমিই সমান। আমার প্রতি উহার যে-আচরণ, নিগ্রোদের প্রতিও নিশ্চয় সেই আচরণ করিয়া থাকিবে। ব্যক্তিগত অভিযোগ লইয়া আদালতে না যাওয়ার নীতি আমি গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং উহার বিরুদ্ধে আমি নালিশ করিব না।' ৫৭

এই ঘটনা ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের জন্য আমার বেদনা গভীরতর করিয়া তুলিল।... এইরূপে আমি শুধু পড়িয়া বা শুনিয়া নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াও ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের কষ্টকর অবস্থা বিশেষভাবে জানিয়াছি। আমি দেখিলাম, আত্মসম্মানজ্ঞান আছে এমন ভারতীয়ের পক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকা উপযুক্ত দেশ নয়। কি করিয়া এই অবস্থার উন্নতি করা যায় সেই চিন্তাই ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। ৫৮

প্রিটোরিয়ায় এক বৎসর বাসের ফলে আমার জীবনে খুব মূল্যবান অভিজ্ঞতা জন্মিল। এখানেই আমি সর্বপ্রথম সাধারণের হিতকর কাজ করিবার সুযোগ পাইলাম এবং ইহার জন্য আমার ক্ষমতার একটা পরিমাপও পাইলাম। এখানেই আমার অন্তর্নিহিত ধর্মের ভাব একটা জীবন্ত শক্তি

হইয়া উঠিল, এখানেই আমি আইন ব্যবসায়েরও একটা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিলাম। ৫৯

আমি বুঝিতে পারিলাম, আইনজীবীর প্রকৃত কার্য হইল যে-দুই দল পৃথক হইয়া গিয়াছে তাহাদের একত্র করা। এই ভূমিকা আমার মধ্যে এমন দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল যে আইন ব্যবসায়ের কুড়ি বৎসরের অনেক অংশ শত শত ক্ষেত্রে আদালতের বাহিরে আপস-নিষ্পত্তি করিতে কাটিয়াছে। তাহাতে আমার কোনো ক্ষতি হয় নাই— এমন কি টাকারও নয়, আত্মার তো নয়ই। ৬০

হৃদয়ের অকপট ও পবিত্র ইচ্ছা সর্বদাই পূর্ণ হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এই নিয়ম অনেকবার সত্য হইতে দেখিয়াছি। দরিদ্রের সেবা আমার অন্তরের বাসনা ছিল, ইহা সর্বদা আমাকে দরিদ্রদের মধ্যে রাখিয়াছে, তাহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে দিয়াছে। ৬১

সবে তিন-চার মাস পসার, কংগ্রেসেরও[১] তখন শৈশব অবস্থা, একজন তামিলভাষী লোক আমার সম্মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে ও অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কাপড় ছিন্নভিন্ন, হাতে টুপি, সামনের দুইটা দাঁত ভাঙা, মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। তাহাকে তাহার মনিব খুব প্রহার করিয়াছে। তাহার সমস্ত বিবরণ আমি পাইলাম আমার কেরানির নিকট হইতে— সেও ছিল তামিলভাষী। লোকটির নাম বালসুন্দরম্— সে ডারবানের এক সুপরিচিত ইউরোপীয় অধিবাসীর নিকটে চুক্তিবদ্ধ ছিল। মনিব তাহার উপর রাগ করিয়া নিজের আত্মসংযম হারাইয়া ফেলেন, বালসুন্দরমকে খুব নির্দয়ভাবে মারেন, মারিয়া দুইটি দাঁত ভাঙিয়া ফেলেন।

আমি তাহাকে একজন ডাক্তারের নিকট পাঠাইলাম। সেকালে শুধু শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারদেরই পাওয়া যাইত। বালসুন্দরমের আঘাতের প্রকৃতি সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাহিয়াছিলাম। সার্টিফিকেট পাইয়া আহত ব্যক্তিকে লইয়া সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গেলাম এবং তাহার অভিযোগপত্র

---

১ নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস। নাটাল লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লিতে ভারতীয়দের ভোটদানের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করার জন্য আনীত বিলের প্রতিবাদ-কল্পে গান্ধীজির দ্বারা সংগঠিত।

দাখিল করিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট পড়িয়া খুব রাগ করিলেন এবং মনিবের বিরুদ্ধে সমন জারি করিলেন। ৬২

বালসুন্দরমের মামলার কথা প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের কানে গিয়া পৌঁছিল, আমাকে সকলে তাহাদের বন্ধু বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। এই যোগাযোগ আমি সানন্দে বরণ করিয়া লইলাম। আমার কার্থালয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের দল নিয়মিতভাবে আসিতে লাগিল। তাহাদের সুখ-দুঃখ জানিবার পরম সুযোগ পাইয়াছিলাম। ৬৩

মানুষ যে মানুষের অবমাননার দ্বারা কেমন করিয়া নিজেদের সম্মানিত বোধ করিতে পারে ইহা সর্বদা আমার কাছে রহস্যই থাকিয়া গেল। ৬৪

আমি যে নিজেকে গোষ্ঠীর সেবায় একেবারে ডুবাইয়া দিতে পারিয়াছিলাম, আমার আত্মোপলব্ধির ইচ্ছাই ছিল তাহার কারণ। আমি সেবা-ধর্মকে আমার নিজের ধর্ম করিয়া লইয়াছিলাম, কারণ আমি বুঝিয়াছিলাম, ভগবানকে শুধু সেবার দ্বারাই পাওয়া যায়। আর সেবার মানে ছিল ভারতেরই সেবা, কারণ তাহার জন্য আমার প্রবণতা থাকায় আমি না খুঁজিতেই তাহা আমার কাছে আসিয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমি গিয়াছিলাম ভ্রমণের জন্য, কাঠিয়াওয়াড়ের ষড়যন্ত্র হইতে পলায়নের পথ বাহির করিবার, আমার জীবিকা অর্জনের জন্য। কিন্তু দেখিলাম আমি ভগবানের সন্ধানে ঘুরিতেছি, আত্মোপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছি। ৬৫

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার যে-আনুগত্য তেমনটি আর কাহারও বড় একটা দেখি নাই। আমি এখন দেখিতেছি যে আমার সত্যানুরাগ এই আনুগত্যের মূলে ছিল। আমি কখনো আনুগত্য বা অন্য কোনো গুণের ভান করিতে পারি নাই। নাটালে যে-সব সভায় যাইতাম প্রত্যেকটিতে ইংলণ্ডের জাতীয় সংগীত গাওয়া হইত। আমার তখন মনে হইত গানে আমারও যোগ দেওয়া চাই। আমি যে ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম তাহা নয়, কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম দোষে গুণে মোটামুটি উহা গ্রহণীয়। সেকালে আমার বিশ্বাস ছিল যে মোটামুটি ব্রিটিশ শাসন শাসিতের পক্ষে হিতকর।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যে-বর্ণবৈষম্য দেখিলাম তাহা ব্রিটিশ ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে উহা শুধু সাময়িক এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং

ইংলণ্ডের সিংহাসনের প্রতি আনুগত্যে ইংরাজদের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়াইতাম। সযত্নে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি 'জাতীয় সংগীতে'র সুর শিখিয়া যেখানেই উহা গাওয়া হইত সেখানেই গাহিতাম। যখনই আড়ম্বর বা ভড়ং না করিয়া আনুগত্য প্রকাশের উপলক্ষ্য হইত, আমি সহজেই তাহাতে যোগ দিতাম।

জীবনে আমি কখনো এই আনুগত্যের দোহাই দিয়া কাজ হাসিল করি নাই, কখনো ইহার সাহায্যে স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহি নাই। ইহা আমার কাছে একটা অবশ্যকৃত্যের মতো ছিল, এবং পুরস্কারের আশা না করিয়াই আমি এই কর্তব্য পালন করিতাম। ৬৬

দক্ষিণ-আফ্রিকায় তিন বৎসর থাকা হইল। এখানকার জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, তাহারাও আমাকে জানিয়াছে। ১৮৯৬ সালে ছয় মাসের জন্য দেশে যাওয়ার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কারণ বুঝিয়াছিলাম যে অনেক দিন এখানে থাকিতে হইবে। পসার মন্দ হয় নাই, লোকেরা আমার উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ করিতেছে ইহাও দেখিলাম। সুতরাং দেশে গিয়া স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া এখানে ফেরা ও বসবাস করা স্থির করিলাম। ৬৭

স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা।... যে সময়কার কথা লিখিতেছি তখন আমার বিশ্বাস ছিল যে সভ্য দেখাইতে হইলে, আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন যতটা সম্ভব ইউরোপীয় মানের কাছাকাছি হওয়া উচিত। কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, শুধু এইরূপেই আমাদের কিছু মর্যাদা থাকিতে পারে, আর মর্যাদা ছাড়া সমাজের সেবা করা যাইবে না।... সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানদের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রকৃতি স্থির করিলাম।... তখনকার দিনে পার্শিদের লোকে ভারতবাসীর মধ্যে সবচেয়ে সভ্য মনে করিত, তাই যখন সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধরন সুবিধা হইবে না বলিয়া মনে হইল, তখন আমরা পার্শি ধরন গ্রহণ করিলাম।... সেই ভাবে এবং আরো অনিচ্ছার সহিত ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিল। যখন সভ্যতার এই-সব চিহ্নের প্রতি আমার মোহ কাটিয়া গেল তখন তাহারাও ছুরি-কাঁটা ছাড়িল। দীর্ঘকাল এই-সব নূতন ধরনে অভ্যস্ত হইয়া পুনর্বার পুরাতন রীতিতে ফিরিয়া আসা আমাদের পক্ষেও বোধ হয় কম অসুবিধার কারণ হয় নাই। কিন্তু আজ আমি দেখিতে পাইতেছি 'সভ্যতার' উপরের খোলস ফেলিয়া দিয়া আমরা সকলে বেশ মুক্ত ও হালকা বোধ করিতেছি। ৬৮

9.4.2002

১৮ই কি ১৯শে ডিসেম্বর জাহাজ ডারবান বন্দরে নোঙর ফেলিল। ৬৯

বোম্বাই হইতে রওনা হওয়ার তেইশ দিনের দিন পর্যন্ত আমাদের জাহাজকে কোয়ারাণ্টিনে আটক রাখার নির্দেশ হইল। কিন্তু এই কোয়ারাণ্টিনের নির্দেশের পিছনে স্বাস্থ্য ভিন্ন অন্য কারণও ছিল।

ডারবানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা আমাদের দেশে ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছিল। নির্দেশের কারণগুলির মধ্যে এই আন্দোলন অন্যতম।... কোয়ারাণ্টিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপে কোনোপ্রকারে যাত্রীদিগকে বা জাহাজের কোম্পানিকে ভয় দেখাইয়া যাত্রীদিগকে ফিরিতে বাধ্য করা। কারণ এখন আমাদেরও ভয় দেখানো আরম্ভ হইল; বলা হইল : 'তোমরা যদি ফিরিয়া না যাও তোমাদের সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি ফিরিতে সম্মত হও, তবে তোমাদের ফিরিবার ভাড়াও পাইতে পার।' আমি সর্বদা আমার সঙ্গী যাত্রীদের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের মনে সাহস দিতে থাকিলাম। ৭০

অবশেষে যাত্রীদের ও আমাদের শেষ কথা জানানো হইল। যদি প্রাণ লইয়া ফিরিতে রাজী থাকি তবে যেন আত্মসমর্পণ করি। আমাদের উত্তরে, অন্য যাত্রীরা ও আমি সকলেই নাটাল বন্দরে আমাদের নামিবার অধিকার বজায় রাখিলাম, এবং যে-কোনো বিপদ হউক না, নাটালে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের দৃঢ়সংকল্পের কথা জানাইলাম।

তেইশ দিন পরে জাহাজগুলিকে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল, যাত্রীদিগকে নামিবার নির্দেশ দিয়া হুকুমও বাহির হইল। ৭১

আমরা জাহাজ হইতে নামিবামাত্র অল্পবয়স্ক ছেলেরা আমাকে চিনিয়া 'গান্ধী, গান্ধী' বলিয়া চীৎকার করিল। অমনি জন-কয়েক লোক সেখানে ছুটিয়া আসিল এবং চীৎকারে যোগ দিল।... আমরা যেমন অগ্রসর হইতে থাকিলাম, ভিড় তেমনি বাড়িতে থাকিল, অবশেষে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।... তখন তাহারা আমাকে পাথর ঢিল পচা ডিম ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। কেহ ছোঁ মারিয়া আমার পাগড়ি লইয়া গেল, কেহ আমাকে লাথি ও কিল মারিতে থাকিল। আমি ক্ষণেকের জন্য অজ্ঞান হইয়া গেলাম এবং একটা বাড়ির সামনের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম— দম ফুরাইয়া গিয়াছিল, দম নিবার জন্য। কিন্তু তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তাহারা কিল-ঘুষা মারিতে মারিতে আমার উপর চড়াও হইল। ঘটনাচক্রে

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের স্ত্রী সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আমাকে জানিতেন। সেই সাহসী মহিলা আসিয়া, তখন রোদ না থাকিলেও, ছাতাটা খুলিয়া ভিড় ও আমার মাঝখানে দাঁড়াইলেন। ইহাতে জনতার ক্রোধে বাধা পড়িল, কারণ মিসেস অ্যালেকজাণ্ডারকে আহত না করিয়া আমাকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। ৭২

স্বর্গীয় চেম্বারলেন সাহেব তখন উপনিবেশগুলির সচিব ছিলেন। তিনি নাটাল সরকারকে আমার আক্রমণকারীদের চালান দিতে বলিলেন। মিঃ এসকোম্ব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আমি যে-সব আঘাত পাইয়াছি তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন; বলিলেন : 'বিশ্বাস করুন, আপনার দেহে সামান্যতম ক্ষতি হইলেও আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। আক্রমণকারীদের যদি চিনাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি তাহাদের ধরিয়া চালান দিতে প্রস্তুত আছি। মিঃ চেম্বারলেনেরও ইচ্ছা সেইরূপ করি।'

আমি এ-কথার উত্তরে জানাইলাম :

'আমি কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে চাই না। দুই-এক জনকে হয়তো সনাক্ত করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের শাস্তি দিয়া কি ফল? তা ছাড়া আক্রমণকারীদের আমি নিন্দা করি না। তাহাদের বুঝানো হইয়াছে, আমি নাটালের শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষে অনেক বাড়াইয়া বিবৃতি দিয়াছি ও তাহাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করিয়াছি। যদি তাহারা এই-সব সংবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের যে রাগ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! যদি অনুমতি দেন তো বলি, নেতারা ও আপনিই দোষী। আপনারা লোকদের ঠিকমত চালাইতে পারিতেন, কিন্তু আপনারাও রয়টারকে বিশ্বাস করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে আমি নিশ্চয় অত্যুক্তিতে আনন্দ পাইয়াছি, অত্যুক্তি করিয়াছি। আমি কাহাকেও জবাবদিহি করিতে বলি না। আমি নিশ্চয় জানি, সত্য প্রচার হইলে তাহারা নিজেদের আচরণের জন্য দুঃখিত হইবে।' ৭৩

জাহাজ হইতে নামিবার দিন, হরিদ্রাবর্ণ পতাকা নীচু করিবামাত্র, 'নাটাল অ্যাডভের্টাইজার' কাগজের একজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উত্তরে আমি আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলাম।.., এই সাক্ষাৎকার, ও আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আমার অস্বীকার, ইহার ফল এমন গভীর হইল যে ডারবানের ইউরোপীয়েরা তাহাদের আচরণের জন্য লজ্জিত

হইল। সংবাদপত্রগুলি আমাকে নির্দোষ বলিল, জনতার নিন্দা করিল। এইভাবে টুকরা টুকরা করিয়া আমাকে ছিঁড়িবার চেষ্টা পরিণামে আমার পক্ষে, অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যের পক্ষে, শুভ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের মর্যাদা বাড়িল এবং আমার কাজ সহজ হইল। ৭৪

আমার পসার সন্তোষজনক ভাবেই বাড়িতেছিল, কিন্তু তাহাতে আমার মোটেই তৃপ্তি হইতেছিল না।... তথাপি আমি স্বচ্ছন্দবোধ করিতেছিলাম না। স্থায়ী ভাবের কোনো মানবসেবার কাজের জন্য আমার অন্তরে ছিল আকাঙ্ক্ষা।... সুতরাং আমি ছোট হাসপাতালে সেবা করিবার সময় করিয়া লইলাম। হাসপাতালে যাওয়া-আসার সময়টুকু ধরিলে, প্রতিদিন সকাল বেলা এই কাজে আমাকে দুই ঘণ্টা সময় দিতে হইত। এই কাজ আমাকে খানিকটা শান্তি দিল। আমার কাজ ছিল রোগীদের অসুখ নিরূপণ করা, ডাক্তারের নিকট প্রকৃত সংবাদ দেওয়া, ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ দেওয়া। রোগে কষ্ট পাইতেছে এমন-সব ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এইভাবে আসিলাম; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল চুক্তিবদ্ধ তামিল তেলুগু অথবা উত্তর-ভারতের অধিবাসী।

বুয়র যুদ্ধে রুগ্ন ও আহত সৈন্যদের সেবা করিবার কাজে আমি যখন ব্রতী হইতে চাহিলাম এই অভিজ্ঞতা আমার খুব কাজে লাগিয়াছিল। ৭৫

শেষ শিশুটির জন্মে আমাকে কঠিনতম পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। হঠাৎ প্রসব-বেদনা উঠিল। তখন-তখনই ডাক্তার পাওয়া গেল না। ধাত্রীকে আনিতে খানিকটা সময় গেল। সে তখন ওখানে উপস্থিত থাকিলেও, প্রসবে সাহায্য করিতে পারিত না। আমাকেই সুপ্রসব হওয়া পর্যন্ত দেখিতে হইল। ৭৬

আমার দৃঢ় ধারণা, ছেলেপিলে ঠিকমত মানুষ করিতে হইলে, শিশুদের যত্ন ও শুশ্রূষার সাধারণ জ্ঞান পিতামাতার থাকা চাই। এ-বিষয়ে আমি যে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছি তাহার সুবিধা প্রতি পদে দেখিয়াছি। যদি আমি বিষয়টি ভালো করিয়া না জানিতাম এবং আমার জ্ঞানকে কাজে না লাগাইতাম তাহা হইলে আমার সন্তানেরা আজ যে সাধারণ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে তাহা কখনোই করিত না। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুর শিখিবার কিছু নাই, ইহা এক ধরনের কুসংস্কার। প্রত্যুত, শিশু প্রথম পাঁচ বৎসরে যাহা শিখে তাহার পর কখনো তাহা শিখে না। গর্ভে আসা মাত্র শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। ৭৭

যে-দম্পতি এই-সব বিষয় উপলব্ধি করিবেন তাঁহারা কখনোই কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মিলিত হইবেন না, শুধু সন্তানার্থ মিলিত হইবেন। আমি মনে করি এ-কথা বিশ্বাস করা খুবই অজ্ঞতার পরিচয় যে আহারনিদ্রার মতো যৌনসংগম বা মৈথুনও একটা স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয় কাজ। সন্তান-উৎপাদনের উপর জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে, এবং জগৎ যখন ভগবানের ক্রীড়াক্ষেত্র ও তাঁহার মহিমার ছায়া, তখন জগতের সুশৃঙ্খল বিকাশের জন্য প্রজনন-ক্রিয়ায় সংযত হওয়া উচিত। যে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবে সে অবশ্যই সর্বপ্রকারে কাম সংযত করিবে, তাহার সন্তানদের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিবে, এবং সেই জ্ঞানের ব্যবহার ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য দান করিবে। ৭৮

পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও পরিণত চিন্তার পর আমি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিলাম। এ-পর্যন্ত আমি স্ত্রীর সঙ্গে এই-সব চিন্তার আদানপ্রদান করি নাই, শুধু ব্রত গ্রহণের সময় তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। তাঁহার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময় আমার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। আমার প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল না। কি করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিব? স্ত্রীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বর্জন করা তখন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাসে ভরসা রাখিয়া আমি যাত্রা শুরু করিলাম।

ব্রতযাপনের কুড়ি বৎসরের কথা যখন ভাবিয়া দেখি, আমার মন আনন্দে ও বিস্ময়ে ভরিয়া যায়। আত্মসংযমের এই-যে অল্প হউক বেশি হউক সার্থক আচরণ, ইহা ১৯০১ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ব্রতগ্রহণের পরে যে মুক্তি ও আনন্দ জন্মিল তাহা ১৯০৬ সালের পূর্বে কখনো অনুভব করি নাই। ব্রতগ্রহণের পূর্বে আমি যে-কোনো মুহূর্তে লোভের অধীন ও পরবশ হইতে পারিতাম। এখন ব্রতগ্রহণ হইল লোভ হইতে মুক্তি পাওয়ার রক্ষাকবচ। ৭৯

কিন্তু যদিও ইহাতে আনন্দ ক্রমশ বাড়িতেছিল, কেহ যেন বিশ্বাস না করেন যে আমার পক্ষে একাজ সহজ ছিল। আমার ৫৬ বৎসর বয়স হইয়াছে, তথাপি ইহা যে কত কঠিন তাহা আমি উপলব্ধি করি। যত দিন যায় ততই বোধ করি, ইহা যেন তরবারের ধারের উপর দিয়া হাঁটা, প্রতি মুহূর্তে নিরন্তর সতর্কতার প্রয়োজন।

ব্রতপালনে প্রথম কথা হইল আহারে সংযম। আমি দেখিলাম

আহারে পূর্ণ সংযমে ব্রতপালন খুব সহজ করিয়া আনে, তাই এখন হইতে শুধু নিরামিষাশীর দিক হইতে নয়, ব্রহ্মচারীর দিক হইতেও আমার খাদ্য-পরীক্ষা চালাইতে থাকিলাম। ৮০

এমন বলা হয় যে আত্মা পান ভোজন কিছুই করে না, সুতরাং লোকে কি পান বা ভোজন করিল তাহাতে আত্মার কিছু আসে যায় না; যাহা-কিছু ভিতরে গ্রহণ করো তাহা নয়, যাহা ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ করো তাহাই হইল আসল কথা। ইহাতে কিছু যুক্তি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুক্তি বিশ্লেষণ করার চেয়ে আমি বরং আমার দৃঢ় ধারণা প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব যে সাধক যদি ভগবানকে ভয় করিয়া চলিতে চাহেন এবং যদি তাঁহার ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা থাকে, তবে এ-কথা মানিয়া লইতে হইবে যে চিন্তায় ও বাক্যে যেমন, তেমনি আহারেও গুণগত ও পরিমাণগত সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। ৮১

আরাম করিয়া সচ্ছলতার মধ্যে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এরূপ বেশি দিন চলিল না। যদিও সযত্নে বাড়িঘর সাজাইয়া তুলিয়াছিলাম, ঘর আমাকে কোনোমতেই বাঁধিতে পারিল না। ঐ জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে না করিতেই খরচপত্র কমাইতে শুরু করিলাম। ধোপার খরচ খুবই বেশি হইত, কিন্তু তাহার সময় রক্ষা করিয়া চলার গুণ মোটেই ছিল না, তাই দুই-তিন ডজন শার্ট ও কলারেও আমার কুলাইত না। কলার প্রত্যহ বদলাইতে হইত এবং শার্ট প্রত্যহ না হইলেও একদিন অন্তর বদলাইতে হইত। ইহাতে দ্বিগুণ ব্যয় হইত, এবং আমার কাছে তাহা অনাবশ্যক মনে হইত। তাই আমি এই ব্যয় বাঁচাইবার জন্য কাপড় কাচার একদফা সরঞ্জাম জোগাড় করিলাম। কাপড় কাচা সম্বন্ধে একখানি বই কিনিয়া কাজটি বুঝিয়া লইলাম এবং আমার স্ত্রীকে শিখাইলাম। ইহাতে আমার কাজের বোঝা অবশ্য ভারি হইল, কিন্তু নূতনত্বে আনন্দও হইল।

প্রথম যে-কলারটি আমি ধুইয়াছিলাম তাহার কথা কখনো ভুলিব না। দরকারের তুলনায় বেশি মাড় লাগাইয়াছিলাম, ইস্ত্রি যথেষ্ট গরম হয় নাই, কলারটি পুড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি তাহাতে যথেষ্ট চাপও দিই নাই। ফলে কলারটি মোটামুটি শক্ত হইলেও, বাড়তি মাড় ক্রমাগত ঝরিয়া পড়িতেছিল। ঐ কলারটি পরিয়াই কোর্টে গেলাম, এবং ব্যারিস্টারদের ঠাট্টাবিদ্রূপের ভাজন হইলাম। কিন্তু তখনকার দিনেও ঠাট্টাবিদ্রূপ আমি গায়ে মাখিতাম না। ৮২

ধোপার দাসত্ব হইতে যেভাবে নিজেকে মুক্ত করিলাম, নাপিতের অধীনতা হইতেও সেইভাবে নিজেকে ছাড়াইয়া লইলাম। যাহারা ইংলণ্ডে যায় তাহারা সেখানে অন্ততঃ দাড়ি কামাইবার বিদ্যাটা শেখে। কিন্তু যতদূর আমার জানা, জ্ঞাতসারে কেহ তাহাদের নিজেদের চুল কাটিতে শেখে না। আমাকে তাহাও শিখিতে হইয়াছিল। আমি একবার প্রিটোরিয়ায় এক ইংরেজ নাপিতের কাছে গিয়াছিলাম। সে ঘৃণার সঙ্গে আমার চুল কাটিতে অস্বীকার করিল। আমি অবশ্যই আঘাত পাইলাম, কিন্তু তখনই একজোড়া চুলকাটার যন্ত্র কিনিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল কাটিলাম। সামনের দিকের চুলটা মোটামুটি কাটিতে পারিলাম, কিন্তু পিছনটা খারাপ করিয়া ফেলিলাম। আদালতে বন্ধুদের হাসি আর ধরে না।

'গান্ধী! তোমার চুলের কি হইল? ইন্দুরে খাইয়াছে না কি?'

'না। সাদা নাপিত আমার কালা চুল স্পর্শ করিতে চাহিল না, তাহার সম্মানে বাধিল। সুতরাং যতই খারাপ হউক, নিজে কাটাই পছন্দ করিলাম।'

এই উত্তরে বন্ধুরা আশ্চর্য বোধ করিলেন না।

নাপিত যে আমার চুল কাটিতে অস্বীকার করিল, ইহাতে তাহার কোনো দোষ নাই। কালা আদমির কাজ করিলে তাহার মক্কেল হারাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। ৮৩

যুদ্ধ-ঘোষণা হইলে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি সবই বুয়রদের জন্য ছিল, কিন্তু তখন আমি বিশ্বাস করিতাম যে এইরূপ সব ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মতামত জোর করিয়া অন্যের উপর চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার আমার তখনো হয় নাই। আমার লেখা দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে এ-বিষয়ে আমার মানসিক সংগ্রামের কথা আমি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি, এবং এখানে তাহার পুনরুক্তি করা চলিবে না। এখানে এ-কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যই আমাকে সেই যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষ অবলম্বন করাইয়াছিল। আমি অনুভব করিয়াছিলাম যে যদি ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে অধিকার চাই তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগদান করাও আমার কর্তব্য। তখন আমার ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া, এবং তাহারই সাহায্যে, ভারত তাহার স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং যত জন সম্ভব সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া, অতি কষ্টে তাহাদের লইয়া অ্যাম্বুলান্স বাহিনী গঠন করিয়া, তাহাদের সেবার প্রস্তাব গ্রহণ করাইলাম। ৮৪

এইরূপে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের সেবা করিতে গিয়া প্রতি পদে

সত্যের নিত্য নূতন ব্যঞ্জনা দেখিতে পাইতেছিলাম। সত্য বিশাল মহীরুহের ন্যায়, ইহাকে যতই পুষ্ট করিবে ইহা ততই ফল প্রসব করিবে। সত্যের খনিতে যতই খনন করিবে, ততই সেখানে আরও মূল্যবান ধনরত্নের সন্ধান পাইবে, সেবার নানা বিচিত্র পথ ততই খুলিয়া যাইবে। ৮৫

মানুষ ও তাহার কর্ম দুই স্বতন্ত্র বস্তু। সৎকর্ম প্রশংসা ও অসৎকর্ম নিন্দার বাহক হইবে, কিন্তু ভালো হউক মন্দ হউক, কর্মকর্তা ক্ষেত্রানুসারে সম্মান বা দয়ার ভাজন হইবে। 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়,' এই নীতি বোঝা সহজ, কিন্তু আচরণে কদাচিৎ পালিত হয়, সেইজন্য ঘৃণার বিষ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে।

অহিংসাই হইল সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি। আমি প্রত্যহ উপলব্ধি করিতেছি, অহিংসার ভিত্তিতে না হইলে এই সন্ধান বৃথা। বিশেষ প্রণালীর বিরোধিতা করা ও তাহাকে আক্রমণ করা খুবই যুক্তিসংগত। কিন্তু সেই প্রণালীর রচয়িতাকে আক্রমণ করা বা তাঁহার প্রতিরোধ করা নিজের প্রতি আক্রমণ ও নিজের বিরোধিতার শামিল। কারণ আমাদের সকলের ধরন একই, সকলেই এক স্রষ্টার সন্তান, সেই হেতু আমাদের মধ্যে অনন্ত ভাগবত শক্তি আছে। একজন মানুষকেও তাচ্ছিল্য করার অর্থ হইল ঐ-সকল ভাগবত শক্তিকে তাচ্ছিল্য করা, এবং এইভাবে শুধু তাহার নয় তাহার সহিত সমগ্র জগতের ক্ষতিসাধন করা। ৮৬

আমার জীবনের নানা ঘটনার ফলে আমি বহু ধর্মমত ও বহু সম্প্রদায়ের লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছি; এবং তাহাদের সকলের সঙ্গে মিশিয়া আমার যে-অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে এই মতেরই পোষকতা করে যে আমি আত্মীয় ও অপরিচিত, স্বদেশবাসী ও বিদেশী, সাদা ও কালা, এবং মুসলমান, পারশি, খ্রীস্টান, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয় ও হিন্দুর মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমি এ-কথা বলিতে পারি যে আমার হৃদয় এরূপ কোনো ভেদ করিতে অপারগ হইয়াছে। ৮৭

সংস্কৃতে আমার গভীর পাণ্ডিত্য নাই। বেদ ও উপনিষদ আমি অনুবাদেই পড়িয়াছি। তাই আমার সেগুলির অধ্যয়ন পণ্ডিতের অধ্যয়ন নয়। তাহাদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও তেমন গভীর নয়, কিন্তু হিন্দু হিসাবে আমার যতখানি পড়া উচিত ততখানি পড়িয়াছি এবং তাহাদের

প্রকৃত ভাব বুঝিতে পরিয়াছি বলিয়া দাবি করি। আমার ২১ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার মধ্যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

এমন এক সময় ছিল যখন আমি হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম এই উভয়ের মধ্যে দুলিতেছিলাম। যখন মনের সাম্য খুঁজিয়া পাইলাম তখন অনুভব করিলাম, শুধু হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়াই আমার পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব; হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, আমি আরো আলো পাইতে লাগিলাম।

কিন্তু তখনো আমার বিশ্বাস ছিল যে অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অংশ নয়; আর যদি হইতও, তবে সে-হিন্দুধর্ম আমার জন্য নয়। ৮৮

বহুকাল পূর্বে পড়িয়াছিলাম যে ইতিহাস হিসাবে অধিকাংশ আত্ম-জীবনীই অসম্পূর্ণ; আজ সে-কথার তাৎপর্য আরো স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি। আমি জানি যে এই কাহিনীতে আমার যাহা মনে আছে সব কথাই লিখিতেছি না। সত্যের অনুরোধে কতখানি লিখিব আর কতখানি বাদ দিব, তাহা কে বলিতে পারে? আর আমার জীবনে কতকগুলি ঘটনার যে-বিবরণ দিয়াছি অসম্পূর্ণ একতরফা সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে তাহার মূল্য কি হইবে? যদি কোনো ছিদ্রান্বেষী যে-সব পরিচ্ছেদ লিখিয়াছি তাহা লইয়া আমাকে জেরা করিতেন, তবে হয়তো তিনি তাহাদের উপর অনেক আলোকপাত করিতে পারিতেন, আর তাহা যদি প্রতিকূল সমালোচকের জেরা হইত তবে তিনি এমন-কি আমার দাবিগুলির মধ্যে অনেকখানি যে ফাঁকা তাহা দেখাইয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিতে পারিতেন।

তাই এক-এক সময় মনে হয়, এই পরিচ্ছেদগুলি লেখা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে কি না। কিন্তু যতক্ষণ ভিতর হইতে কোনো নিষেধ না আসে ততক্ষণ লিখিয়া চলিতে হইবে। একবার কোনো কিছু আরম্ভ করিলে তাহা নৈতিক অন্যায় বলিয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়, এই জ্ঞানের নীতি অনুসরণ করিব। ৮৯

'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'১-এর প্রথম মাসেই বুঝিতে পারিলাম যে সাংবাদিকতার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেবা। সংবাদপত্র একটা মহাশক্তি বটে, কিন্তু অসংযত জলস্রোত যেমন সমগ্র পল্লীঅঞ্চল প্লাবিত করিয়া শস্যাদির সর্বনাশ করে, ঠিক তেমনি অসংযত লেখনী শুধু নাশই করে। সংযম যদি বাহির হইতে চাপানো হয়, তবে তাহার ফল সংযম অপেক্ষা

---

১ গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকায় এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আরও বিষময় হয়। অন্তর হইতে যে-সংযম তাহাই শুধু লাভজনক। যুক্তির এই প্রণালী যদি ঠিক হয় তবে জগতে কয়টি সাময়িকপত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে? কিন্তু যেগুলি ব্যর্থ ও অকেজো, তাহাদিগকে কে বন্ধ করিবে? কে বা বিচার করিবে? ভালো ও মন্দের মতো কাজের জিনিস ও অকাজের জিনিস সাধারণত একত্র থাকে, এবং মানুষকে বাছিয়া লইতে হয়। ৯০

ইহাই ['আন্‌টু দিস লাস্ট'] রাস্‌কিনের প্রথম বই যাহা আমি পড়িয়াছিলাম। আমার শিক্ষার সময়ে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে আর কিছু পড়িয়াছিলাম কি না সন্দেহ এবং কর্মজীবন আরম্ভ করিবার পর আমার পড়ার সময় খুব কমই ছিল। সুতরাং আমার কেতাবী জ্ঞান বেশি কিছু আছে বলিয়া আমি দাবি করিতে পারি না। যাহা হউক, এই বাধ্যতামূলক সংযমের ফলে বেশি কিছু ক্ষতি হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বরং পুস্তক পাঠ এইরূপ সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে আমি যাহা পড়িতাম তাহা সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করিতাম বলা যাইতে পারে। এই-সব বইয়ের মধ্যে যে বইখানি তৎক্ষণাৎ ও কার্যত আমার জীবন রূপান্তরিত করিয়াছিল তাহা হইল 'আন্‌টু দিস লাস্ট।' আমি ইহা পরে গুজরাটীতে অনুবাদ করিয়াছিলাম। ইহার নাম দিয়াছিলাম 'সর্বোদয়' (সকলের কল্যাণ)।

মনে হয় রাস্‌কিন-এর এই মহৎ পুস্তকে আমার মনের গভীরতম চিন্তার কিছু কিছু প্রতিফলন দেখিয়াছিলাম এবং তাহাতেই ইহা আমাকে এমনভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং জীবনে আমার সব কিছুর পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। মানুষের হৃদয়ে যে-মঙ্গল সুপ্ত আছে তাহা যিনি জাগ্রত করিতে পারেন তিনিই কবি। কবিদের প্রভাব সকলের উপর সমানভাবে পড়ে না, কারণ সকলের সমানভাবে বিবর্তন হয় না। ৯১

জোহানেসবার্গে স্থির হইয়া বসিলাম। এ-কথা ভাবিবার পরও আমার ভাগ্যে স্থির হইয়া বসা আর হইল না। ঠিক যখন আমার মনে হইল আমি শান্তিতে থাকিব, তখনই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সংবাদপত্রে নাটালে জুলু-বিদ্রোহের খবর বাহির হইল। জুলুদের প্রতি আমার কোনো বিরোধী মনোভাব ছিল না। তাহারা ভারতীয় কাহারও কিছু ক্ষতি করে নাই। 'বিদ্রোহ' ব্যাপারটির সম্বন্ধেই আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস করিতাম যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগতের কল্যাণসাধনের জন্যই রহিয়াছে। প্রকৃত আনুগত্যবোধ আমাকে সাম্রাজ্যের অশুভ চিন্তা হইতেও বিরত রাখে। 'বিদ্রোহ' কথাটা ঠিক না ভুল সে-চিন্তার প্রভাব তাই

আমার সিদ্ধান্তের উপর পড়া সম্ভব ছিল না। নাটালের প্রতিরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল। আরো লোকসংগ্রহের অবকাশ ছিল। আমি পড়িলাম যে 'বিদ্রোহ' দমনের জন্য এই বাহিনী ইতিমধ্যেই সংঘবদ্ধ হইয়াছে। ৯২

ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিলাম যে 'বিদ্রোহ' নামের পোষকতা করিবার কিছু সেখানে ছিল না। আক্রমণ প্রতিরোধই কিছু দেখা গেল না। জুলুদের একজন প্রধান ব্যক্তি তাহার লোকদের উপর যে-এক নূতন কর ধার্য হইয়াছিল তাহা দিতে বারণ করিয়াছিল এবং যে-সার্জেণ্ট তাহা আদায় করিতে গিয়াছিল তাহাকে ছুরি মারিয়াছিল, এই শান্তিভঙ্গকেই বাড়াইয়া বিদ্রোহ বলা হইয়াছিল। যাহা হউক, আমার সহানুভূতি ছিল জুলুদেরই প্রতি, এবং কেন্দ্রস্থলে গিয়া যখন জানিতে পারিলাম যে আহত জুলুদের শুশ্রূষার ভার প্রধানত আমাদের উপর পড়িবে তখন আমার আনন্দ হইল। যে-ডাক্তারটির উপর ভার ছিল, তিনি আমাদের স্বাগত জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে শ্বেতাঙ্গেরা আহত জুলুদের শুশ্রূষা করিবার জন্য তেমন ইচ্ছুক নয়, তাহাদের ক্ষতস্থান পচিয়া যাইতেছিল। তিনি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিলেন না যে কি করিবেন। এই-সব নির্দোষ লোকের সাহায্যে আমরা গিয়াছি। আমাদের আগমনে তিনি ভগবানের হাত দেখিতে পাইলেন এবং ব্যাণ্ডেজ, ছোঁয়াচ নিবারণের ঔষধাদি দিয়া তিনি আমাদিগকে তখনকার মতো যে-হাসপাতাল করা হইয়াছিল সেখানে লইয়া গেলেন। জুলুরা আমাদিগকে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইল। তাহাদের ও আমাদের মধ্যে যে-বেড়া ছিল তাহার ফাঁক দিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা আমাদের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিত এবং ক্ষতস্থান যাহাতে না ধোয়াই সেজন্য বলিত। আমরা তো তাহাদের কথা শুনিব না, তাই তাহারা রাগ করিয়া জুলুদের অকথ্য গালাগালি দিত। ৯৩

যে-সকল আহত ব্যক্তির ভার আমাদের উপর দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যুদ্ধে আহত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে একদলকে সন্দেহবশে বন্দী করা হইয়াছিল। সেনাপতি তাহাদিগকে বেত মারিতে আদেশ দিয়াছিলেন। বেত মারার ফলে ভীষণ ঘা হইয়াছিল। ঘাগুলির দিকে মন দেওয়া হয় নাই বলিয়া পচিয়া উঠিয়াছিল। অন্য যাহারা ছিল তাহারা বন্ধুভাবাপন্ন জুলু। যদিও 'শত্রু' হইতে তাহাদের পৃথক দেখাইবার জন্য তাহাদের 'ব্যাজ' দেওয়া হইয়াছিল তথাপি সৈন্যেরা ভুল করিয়া তাহাদিগকে গুলি করিয়াছিল। ৯৪

জুলু 'বিদ্রোহে' অনেক নূতন নূতন অভিজ্ঞতা হইল এবং ইহা চিন্তার অনেক খোরাক জোগাইল। এই ঘটনার ফলে যুদ্ধের ভীষণ রূপ যেমন স্পষ্ট করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তেমনটি বুয়র যুদ্ধেও হয় নাই। ইহাকে তো যুদ্ধই বলা যায় না। শুধু আমার মতে নয়, যে-সব ইংরাজের সঙ্গে আমি কথা বলিয়াছিলাম তাঁহাদের মতেও ইহা ছিল এক-প্রকার মানুষ-শিকার। প্রত্যহ সকালে নিরপরাধীদের কুটিরে সৈনিকদের রাইফেল বাজির মতো দাগা হইতেছে— তাহার শব্দ শোনা এবং তাহাদের মধ্যে থাকা একটা পরীক্ষাই বটে। আমাদের এই কাজ ছিল অতি কঠিন ও তিক্ত, বিশেষ করিয়া আমার বাহিনীর কাজ যখন শুধু আহত জুলুদের শুশ্রূষা করা। আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম যে আমরা না থাকিলে জুলুদের দেখাশুনা করিবার কেহ থাকিবে না। সুতরাং এই কাজে আমার বিবেকবুদ্ধির ভার লঘু হইল। ৯৫

কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য যেমন ব্যস্ত ছিলাম, বেশির ভাগ সময় সত্যাগ্রহ সংগ্রামে এবং নিজেকে শুদ্ধ করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত করিবার জন্যও তেমনি ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং আমাকে খাদ্য-ব্যাপারে আরো পরিবর্তন করিতে হইল, নিজেকে আরো সংযত করিতে হইল। পূর্বের পরিবর্তনের মূলে অধিকাংশ স্থলেই ছিল স্বাস্থ্য-বিষয়ক বিচার-বিবেচনা, নূতন পরীক্ষা করা হইল ধর্মের ভিত্তিতে।

উপবাস ও খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আমার জীবনে আরো গুরুত্ব-পূর্ণ হইয়া দেখা দিল। রসনাতৃপ্তির জন্য লোভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত মানুষের মধ্যে কামপ্রবৃত্তি দেখা দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কাম ও স্বাদ-সুখ সংযত করিতে আমাকে বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল। এখনো তাহাদের সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারিয়াছি বলিয়া দাবি করিতে পারি না। আমি নিজেকে খুব 'খাইয়ে' লোক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি। আমার বন্ধুরা যাহাকে আমার সংযম বলিয়া মনে করেন তাহা কখনো সেভাবে আমার নিকট প্রকাশ পায় নাই। আমি যেটুকু সংযম করিতে পারিয়াছি তাহা না করিলে আমি পশুরও অধম হইতাম, বহু পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম। যাহা হউক, আমি নিজের দোষ-ত্রুটি যথেষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাহা দূর করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিলাম এবং এই চেষ্টার ফলেই আমি এত বৎসর ধরিয়া শরীর টানিতে পারিলাম এবং এই শরীর দিয়া আমার ভাগে যাহা কাজ ছিল তাহা করিতে পারিলাম। ৯৬

আমি ফলাহার দিয়া আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সংযমের দিক হইতে ফলাহার ও শস্য উভয়ের মধ্যে তফাত কিছু পাইলাম না। পরেরটির বিষয়ে যেমন প্রথমটির বিষয়েও তেমন, অভ্যাস হইলে রুচি অনুসারে খাওয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। সুতরাং উপবাসের উপর অথবা ছুটির দিনে একবেলা মাত্র আহারের উপর গুরুত্ব অর্পণ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায়শ্চিত্ত কিংবা ঐরূপ কোনো উপলক্ষ থাকিলে সানন্দে সে-দিন উপবাস করিয়া কাটাইতাম।

কিন্তু আমি ইহাও দেখিলাম যে শরীরের আবর্জনা এখন আরো ভালো-ভাবে দূর হইয়া যাওয়ায় খাদ্যের স্বাদ আরো বাড়িত, ক্ষুধাও বেশি হইত। ক্রমে আমি বুঝিলাম যে উপবাস যেমন বিলাসের তেমনি সংযমেরও প্রবল অস্ত্র হইতে পারে। এই আশ্চর্য ব্যাপারের প্রমাণস্বরূপ পরবর্তীকালে আমার ও অন্য লোকের অভিজ্ঞতার কথা ধরা যাইতে পারে। আমি শরীরের উন্নতি করিতে ও উহাকে কর্মপটু করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার প্রধান উদ্দেশ্য সংযমে সিদ্ধিলাভ ও স্বাদ জয় করা, তাই আমি প্রথমে একপ্রকার খাদ্য, পরে অন্যপ্রকার বাছিয়া লইলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণও কমাইয়া দিলাম। কিন্তু স্বাদ যেন আমার পিছনে লাগিয়াই থাকিল। একটা জিনিস ছাড়িয়া অন্য জিনিস ধরি, আর পরেরটি প্রথমটির চেয়ে আরো স্বাদু, আরো চমৎকার লাগে। ৯৭

কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে জানিয়াছি, আহারের স্বাদ লইয়া এতখানি ভাবা অন্যায় হইয়াছে। মানুষে খায় জিহ্বার তৃপ্তি-সাধন করিতে নয়, শরীর-রক্ষা করিতে। যখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দেহকে পুষ্ট করে এবং দেহের মাধ্যমে আত্মাকেও পুষ্ট করে, তখন ইহার বিশেষ স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা চলিয়া যায়, এবং শুধু তখনই ইহা প্রকৃতি যেভাবে ইহাকে চালিত করিতে চাহিয়া-ছিল সেইভাবে চলিতে আরম্ভ করে।

প্রকৃতির সহিত এইরূপ সামঞ্জস্য করার পক্ষে কোনো ত্যাগস্বীকারই বেশি নয়, কোনো পরীক্ষাই প্রচুর নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জীবনস্রোত প্রবলভাবে এখন বিপরীত দিকে চলিতেছে। নশ্বর দেহের অলংকরণে বিপুল সংখ্যায় অন্যের প্রাণ-বলিদান দিতে অথবা সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত ইহার অস্তিত্ব বাড়াইতে আমরা লজ্জিত হই না, ফলে আমরা দেহ ও আত্মা, উভয় বস্তুই ধ্বংস করিয়া থাকি। ৯৮

১৯০৮ সালে আমার কারাজীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। দেখিলাম, বন্দীদের যে-সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় তাহার কিছু কিছু স্বেচ্ছায়

ব্রহ্মচারীদের পালন করা উচিত। যেমন, সন্ধ্যার পূর্বে শেষ আহার গ্রহণ করিবার নিয়ম। ভারতীয় বা আফ্রিকার বন্দীদের চা বা কফি দেওয়া হইত না। তাহারা ইচ্ছা করিলে রান্না খাদ্যের সঙ্গে লবণ মিশাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু শুধু জিহ্বার তুষ্টির জন্য কিছু পাইত না। ৯৯

অনেক অসুবিধার পর অবশেষে এই-সব বিধিনিষেধের পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দুইটি নিয়মই আত্মসংযমের পক্ষে হিতকর ছিল। বাহির হইতে চাপানো নিয়মে বড় একটা কাজ হয় না। কিন্তু নিজ হইতে প্রবর্তিত নিয়মের ফল ভালো না হইয়া যায় না। সুতরাং জেল হইতে মুক্তি পাইবার পরই আমি নিয়ম দুইটি নিজের উপর চাপাইলাম। তখন যতটা সম্ভব আমি চা ছাড়িয়া দিলাম, আমার দিনের শেষ আহার সূর্যাস্তের পূর্বেই করিতে লাগিলাম। এখন আর নিয়ম মানিয়া চলিতে কোনো চেষ্টারই প্রয়োজন হয় না। ১০০

উপবাসে ইন্দ্রিয় দমন করিতে সাহায্য করে, যদি আত্মসংযমের দিক হইতে উপবাস করা হয়। আমার বন্ধুরা কেহ কেহ উপবাসের ফলে তাহাদের ইন্দ্রিয়-পিপাসা ও জিহ্বাসুখের পিপাসা বাড়িতে দেখিয়াছে। অর্থাৎ, উপবাসে কোনো কাজ হয় না যদি ইহার সঙ্গে আত্মসংযমের জন্য অবিরাম আকাঙ্ক্ষা না থাকে। ১০১

উপবাস ও অনুরূপ ব্যবস্থা আত্মসংযম-সাধনের একটি উপায় মাত্র। কিন্তু ইহাই সব নহে। আর যদি দৈহিক উপবাসের সঙ্গে মানসিক উপবাস না থাকে, তবে তাহার পরিণাম হয় ভণ্ডামি ও সর্বনাশ। ১০২

টলস্টয় ফার্মে[১] আমরা একটা নিয়ম করিয়াছিলাম। শিক্ষকেরা যাহা করিবে না, ছোটদের তাহা করিতে বলা হইবে না; তাই যখনই তাহাদের কোনো কিছু করিতে বলা হইত, সর্বদাই একজন শিক্ষক তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া সেই কাজে হাত লাগাইতেন। সুতরাং ছোটরা যাহাই শিখুক, খুশিমনে শিখিত। ১০৩

---

১ টলস্টয় ফার্ম ও ফিনিক্স কলোনি নামে গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকায় দুইটি বসতি বা আশ্রম খুলিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহকর্মীদের সহিত তিনি আত্মসংযম ও সেবার ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে আমরা কত-কিছু শুনি, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের জন্য আমাদের কখনো অভাববোধ ছিল না। যে-সব বই পাওয়া যাইত তাহাও খুব ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ভূরি ভূরি পুস্তক দিয়া ছেলেদের ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন মোটেই অনুভব করি নাই। আমি সর্বদাই অনুভব করিয়াছি যে ছাত্রের প্রকৃত পাঠ্যপুস্তক হইল তাহার শিক্ষক। আমার শিক্ষকেরা পুস্তক হইতে যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহার খুব কমই আমার মনে আছে, কিন্তু পুস্তক ভিন্ন যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহা এখনো পরিষ্কার মনে আছে।

শিশুরা তাহাদের চোখ অপেক্ষা কান দিয়া বেশি শেখে এবং কম পরিশ্রমে শেখে। কোনো বই আমি ছেলেদের সঙ্গে আগাগোড়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমি নানা পুস্তক হইতে পড়িয়া যাহা হজম করিয়াছি আমার নিজের ভাষায় তাহা তাহাদের বলিতাম এবং আমার বিশ্বাস তাহাদের মনে এখনো তাহার স্মৃতি আছে। বই হইতে যাহা শিখিয়াছিল তাহা মনে রাখা কষ্টকর ছিল, কিন্তু মুখে মুখে যাহা শিখাইতাম তাহা খুবই সহজে তাহারা পুনরায় বলিতে পারিত। বই পড়া তাহাদের পক্ষে মেহনতের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমার কথা শোনা ছিল আনন্দের কাজ, যদি না আমার বিষয় মনোরম করিতে না পারিয়া তাহাদের ক্লান্ত করিয়া তুলিতাম। আর তাহারা আমার মুখের কথা শুনিয়া যে-সব প্রশ্ন করিত তাহা হইতে তাহাদের বুদ্ধিশক্তির একটা পরিমাপ পাইতাম। ১০৪

দৈহিক শিক্ষা যেমন দৈহিক ব্যায়ামের মাধ্যমে হয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষাও তৈমনি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে হওয়াই সম্ভব। আধ্যাত্মিক অনুশীলন আবার সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের জীবন ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে। শিক্ষকের সর্বদাই খুঁটিনাটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়, ছেলেরা তাঁহার সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। ১০৫

আমি নিজে মিথ্যাবাদী হইলে ছেলেদের সত্য কথা বলিতে শেখানোর চেষ্টা সফল হইতে পারে না। যে-শিক্ষক কাপুরুষ তিনি কখনো ছেলেদের সাহসী করিয়া তুলিতে পারিবেন না। আর যাঁহার বিন্দুমাত্র আত্মসংযম নাই তিনি ছাত্রদের কখনো আত্মসংযম শিখাইতে পারিবেন না। সুতরাং আমি বুঝিতে পারিলাম আমার সঙ্গে যে-সব ছেলেমেয়ে আছে তাহারা আমাকেই সর্বদা দেখিয়া শিখিবে। এইরূপে তাঁহারাই হইল আমার শিক্ষক। আমি শিখিলাম, শুধু তাহাদের জন্য হইলেও আমাকে ভালো

হইতে হইবে, জীবন সরল রাখিতে হইবে। আমি বলিতে পারি যে টলস্টয় ফার্মে আমি ক্রমেই যে শিক্ষা ও সংযম আমার উপরে চাপাইতে থাকিলাম তাহার অধিকাংশই আমার এই-সব শিক্ষানবিশদের জন্য।

তাহাদের একজন ছিল বন্য প্রকৃতির, মিথ্যা-কথনে অভ্যস্ত, কলহপ্রিয়। একবার সে খুবই উদ্দাম হইয়া উঠিল। আমার ক্রোধের সীমা রহিল না। আমি আমার ছেলেদের কখনো মারিতাম না, কিন্তু এইবার আমার বড়ই রাগ হইল। আমি তাহাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে শক্ত হইয়া রহিল, আমাকেও হারাইবার চেষ্টা করিল। অবশেষে আমি, হাতের কাছে একটা রুলার ছিল, তাহা উঠাইয়া লইয়া তাহার হাতে তাহা দিয়া মারিলাম। তাহাকে আঘাত করিবার সময় আমার শরীর কাঁপিতে থাকিল। আমার বিশ্বাস সে তাহা দেখিতে পাইল। তাহাদের সকলের পক্ষে ইহা ছিল এক নূতন অভিজ্ঞতা। ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিল, ক্ষমা চাহিল। আঘাত তাহার লাগিয়াছিল বলিয়া কাঁদে নাই। সতেরো বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক, ইচ্ছা করিলে সেও আমাকে আঘাত করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু হিংসার আশ্রয় লইতে বাধ্য হওয়ায় আমার যে কি কষ্ট, তাহা সে বুঝিতে পারিল। এই ঘটনার পরে আর কখনো সে আমার অবাধ্য হয় নাই কিন্তু আমি এখনো এই হিংসার জন্য অনুতাপ বোধ করি। আমার আশঙ্কা হয়, আমি সে-দিন আমার মধ্যে যে-আত্মা তাহাকে নয়, আমার মধ্যে যে-পশু তাহাকেই তাহার সম্মুখে ধরিয়াছিলাম।

শারীরিক শাস্তির আমি সর্বদাই বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছি। একবার মাত্র আমি আমার একটি ছেলেকে শারীরিক শাস্তি দিয়াছিলাম। সুতরাং আমি এ-পর্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই, রুলার দিয়া আঘাত করায় আমি ঠিক করিয়াছিলাম কি ভুল করিয়াছিলাম। সম্ভবত তাহা সংগত হয় নাই, কারণ তাহার পিছনে ছিল ক্রোধ ও শাস্তি দিবার ইচ্ছা। ইহা যদি শুধু আমার অস্বস্তিবোধের প্রকাশ হইত তবে আমি ইহা সংগত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল মিশ্রিত। ১০৬

ইহার পরে ছেলেদের অসদাচরণের দৃষ্টান্ত প্রায়ই ঘটিত, কিন্তু আমি আর কখনো দৈহিক শাস্তি দিই নাই। এইরূপে আমার অধীনে যে-সব ছেলেমেয়ে ছিল তাহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতে গিয়া, আত্মার শক্তি যে কত তাহা আমি ক্রমেই আরো ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম। ১০৭

সেকালে আমাকে জোহানেসবার্গ ও ফিনিক্সের মধ্যে যাওয়া-আসা

করিতে হইত। আমি জোহানেসবার্গে থাকিতে আশ্রমবাসীদের দুইজনের নৈতিক অবনতির সংবাদ আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের আপাতব্যর্থতা বা পরাজয়ের সংবাদ পাইলে আমি আঘাত পাইতাম না, কিন্তু এই সংবাদ আমার কাছে বজ্রপাতের মতো আসিয়া পড়িল। সেই দিনই আমি ট্রেনে করিয়া ফিনিক্স যাত্রা করিলাম। ১০৮

ট্রেনে থাকিতে থাকিতেই আমার কর্তব্য আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া দেখা দিল। আমি বুঝিতে পারিলাম, ছাত্র কিংবা আশ্রিতের যদি কোনো বিচ্যুতি ঘটে, তার জন্য, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে, তাহার শিক্ষক বা অভিভাবকই দায়ী। সুতরাং ঐ ঘটনাটির সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হইয়া গেল। আমার স্ত্রী আমাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার প্রকৃতি বিশ্বাস করিতে ভালোবাসিত বলিয়া আমি তাঁহার সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমি অনুভব করিলাম যে দোষীদের আমার দুঃখ ও তাহাদের পতনের গভীরতা বুঝাইতে গেলে একটিমাত্র পথ খোলা আছে, তাহা হইল আমার নিজের কিছু প্রায়শ্চিত্ত করা। সুতরাং আমি সপ্তাহব্যাপী অনশন এবং সাড়ে-চার মাস দিনে একাহার ব্রত স্বেচ্ছায় বরণ করিলাম। ১০৯

আমার প্রায়শ্চিত্ত সকলের পক্ষে পীড়াদায়ক হইল। কিন্তু আবহাওয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিল যে পাপাচরণ কি ভীষণ ব্যাপার এবং ছেলেমেয়েদের সহিত আমার বন্ধন আরো দৃঢ়, আরো সত্য হইয়া উঠিল। ১১০

আমি আমার ব্যবসায়ে কখনো মিথ্যার আশ্রয় লই নাই এবং আমার পসারের অনেকটা সাধারণ হিতকল্পে ব্যয় হইয়াছে, যাহার জন্য আমি পকেট-খরচা ছাড়া আর কিছু লই নাই এবং তাহাও আমি কখনো কখনো নিজেই বহন করিতাম।... ছাত্র হিসাবে শুনিতাম বটে যে উকিলের পেশা তো নয়, মিথ্যাবাদীর পেশা। কিন্তু এ-কথার কোনো প্রভাব আমার উপর পড়ে নাই, কারণ মিথ্যা বলিয়া পদ বা অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।... বহুবার দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমার এই নীতির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। প্রায়ই জানিতাম যে বিরোধী পক্ষ সাক্ষীদের শিখাইয়া পড়াইয়া দিয়াছে। যদি আমি আমার মক্কেল বা তাঁহার সাক্ষীদিগকে মিথ্যা বলিতে উৎসাহ দিতাম, হয়তো মকদ্দমায় আমাদের জয় হইত। কিন্তু আমি সর্বদাই এই লোভ দমন করিতাম। একবার মাত্র মনে পড়ে, মকদ্দমা জেতার

পরে সন্দেহ হইল, আমার মক্কেল বুঝি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে। অন্তরে অন্তরে আমি সর্বদাই চাহিতাম যে আমার মক্কেলের মামলা ন্যায়-সংগত হইলেই যেন আমার জয় হয়। আমার ফি ঠিক করার সময় কখনো মামলায় জয় হইবার শর্তে উহা ঠিক করি নাই। আমার মক্কেল হারুক আর জিতুক, আমি আমার ন্যায্য ফি চাহিতাম, তাহার বেশি কি কম চাহিতাম না।

প্রত্যেক নূতন মক্কেলকে প্রথম হইতেই সতর্ক করিয়া দিতাম যে তিনি যেন আশা না করেন যে আমি মিথ্যা মকদ্দমা গ্রহণ করিব অথবা সাক্ষীদের মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শিখাইব। ফলে আমার এমন নাম হইল যে মিথ্যা মামলা আমার কাছে আসিতই না। প্রকৃতপক্ষে আমার মক্কেলদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের পরিষ্কার অর্থাৎ সত্যমূলক মকদ্দমা আমার কাছে আনিত, সন্দেহ-জনক কিছু থাকিলে তাহা অন্যত্র লইয়া যাইত। ১১১

আমার পেশার কাজে ইহাও আমার অভ্যাস ছিল যে আমি আমার অজ্ঞতা কখনো আমার মক্কেল ও সহকর্মীদের নিকট গোপন করি নাই। যখনই দিশাহারা হইয়াছি, মক্কেলকে অন্য কোনো কৌঁসুলির পরামর্শ লইতে বলিয়াছি। এই সরল ব্যবহারের ফলে আমার মক্কেলরা আমাকে অশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিত। যখনই বড় কৌঁসুলির সঙ্গে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইত তাহারা ফি দিতে প্রস্তুত থাকিত। এই স্নেহ ও বিশ্বাস আমার সাধারণ হিতকর কর্মে কাজে লাগিয়াছিল। ১১২

১৯১৪ সালে, সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের শেষে, আমি গোখেলের কাছ হইতে নির্দেশ পাইলাম, লণ্ডন হইয়া যেন দেশে ফিরি। ৪ঠা আগস্ট যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। আমরা লণ্ডনে পৌঁছিলাম ৬ই তারিখে। ১১৩

আমার মনে হইল, ইংলণ্ডবাসী ভারতীয়দের যুদ্ধে যথাসাধ্য কাজ করা উচিত। ইংরেজ ছাত্ররা সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার জন্য ইচ্ছা জানাইয়াছিল, ভারতীয়েরাও ইহার চেয়ে কম কিছু করিবে না। এই যুক্তিধারার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠিল। বলা হইল, ভারতীয় ও ইংরেজ, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আমরা দাস, তাহারা প্রভু। দাস কি করিয়া প্রভুর প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবে? মুক্তিকামী দাসের কি কর্তব্য নয় যে তাঁহার প্রয়োজনের সুযোগ গ্রহণ করে? এই যুক্তি তখন আমার মর্ম স্পর্শ করিতে পারিল না। একজন ইংরেজ ও একজন ভারতীয়ের মধ্যে মর্যাদার প্রভেদ আমি জানিতাম, কিন্তু আমরা যে একেবারে

দাসের পর্যায়ে নামিয়াছি তাহা আমি বিশ্বাস করিতাম না। আমার তখন মনে হইত যে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ কর্মচারীরা দায়ী, ব্রিটিশ শাসন-প্রণালী নয়, এবং আমরা প্রেমের দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করিতে পারিব। যদি ব্রিটিশদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় আমাদের মর্যাদা বাড়াইতে চাই, তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য তাহাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাহাদের পাশে দাঁড়ানো। শাসনপ্রণালী দোষযুক্ত হইলেও আজিকার মতো তাহা অসহনীয় বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু যদি শাসনপ্রণালীতে আস্থা হারাইয়া আমি বর্তমানের ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করি, তবে বন্ধুরা কি করিয়া সহযোগিতা করিতেন? তাহাদের তো না ছিল প্রণালীতে বিশ্বাস, না ছিল কর্মচারীদের উপর আস্থা? ১১৪

আমি ভাবিয়াছিলাম যে ইংলণ্ডের প্রয়োজনের সুযোগ আমরা লইব না। ভাবিয়াছিলাম, যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন আমাদের দাবিদাওয়ার কথা লইয়া পীড়াপীড়ি না করাই শোভন ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে। সুতরাং আমার পরামর্শ আমি ছাড়িলাম না এবং যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের স্বেচ্ছাসেবক-দলে নাম লিখাইতে বলিলাম। ১১৫

আমাদের সকলেই নীতির দিক হইতে যুদ্ধের বীভৎসতা দেখিতে পাইয়াছিলাম। যদি আমার আক্রমণকারীকে অভিযুক্ত করিতে প্রস্তুত না হইয়া থাকি তবে তো যুদ্ধে যোগদান করিতে আরো অনিচ্ছুক হইব, বিশেষ করিয়া যখন বিবদমান পক্ষ দুইটির বিবাদের কারণ সংগত কি না তাহা মোটেই জানি না। বন্ধুরা অবশ্য জানিতেন যে আমি পূর্বে বুয়র-যুদ্ধে সেবা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে তখন হইতে আমার মতামতের একটা পরিবর্তন হইয়াছে।

বুয়র-যুদ্ধে যোগ দিতে যে-চিন্তাধারা আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, এই ব্যাপারেও বস্তুত সেই যুক্তিধারাই আমার নিকটে বড় হইয়া দেখা দিল। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে যুদ্ধে যোগদান কখনোই অহিংসার সহিত সংগতি রাখিতে পারে না। কিন্তু কেহ সর্বদা সমানভাবে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিতে পারে না। সত্যসন্ধানী প্রায়ই অন্ধকার পথে হাৎড়াইয়া চলিতে বাধ্য হয়। ১১৬

দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ইংলণ্ডে অ্যাম্বুল্যান্স কাজের জন্য লোক এবং ভারতবর্ষে রণক্ষেত্রের জন্য রংরুট সংগ্রহ করিয়া আমি যুদ্ধের অনুকূলতা করি

নাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে প্রতিষ্ঠানটিকেই সাহায্য করিয়াছিলাম। তখন এই প্রতিষ্ঠানের হিতকর পরিণামের উপর আমার বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধের প্রতি আমার বিরাগ এখন যেমন প্রবল তখনো তেমনি প্রবল ছিল। আমি তখনো রাইফেল ঘাড়ে করিতামও না, করিতে চাহিতামও না। কিন্তু মানুষের জীবন সরল রেখায় চলে না, প্রায়ই তাহা খুব পরস্পরবিরোধী কর্তব্যের ভার মাত্র। মানুষকে অবিরাম দুইটি কর্তব্যের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হয়। তখন তো যুদ্ধের প্রতিকূলে আন্দোলন পরিচালনের অগ্রণী হিসাবে নয়, নাগরিক হিসাবেই আমি সেই-সকল লোককে পরামর্শ দিয়া তাহাদের নেতৃত্ব করিতাম, যাহারা ভীরুতার জন্য কিংবা হীন উদ্দেশ্য লইয়া অথবা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধবশত সৈন্যদলে নাম লিখাইতে বিরত ছিল। আমি তাহাদের এই পরামর্শ দিতে ইতস্তত করি নাই যে যতক্ষণ তাহারা যুদ্ধে বিশ্বাসী ও ব্রিটিশ সংবিধানের অনুগত বলিয়া স্বীকার করে, ততক্ষণ তাহারা সৈন্যদলে নাম লেখাইয়া ইহাকে সমর্থন করিতে কর্তব্যের দিক দিয়া বাধ্য।... আমি নিজে প্রতিশোধে বিশ্বাসী নই। কিন্তু চার বৎসর পূর্বে বেতিয়ার নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের এ-কথা বলিতে সংকোচ করি নাই যে যাহারা অহিংসার কিছুই জানিত না তাহারা মেয়েদের মানমর্যাদা ও নিজেদের ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ না করিয়া কাপুরুষপদবাচ্য হইতেছে। এবং আমি... সম্প্রতি হিন্দুদের এ-কথা বলিতে ইতস্তত করি নাই যে যদি তাহারা ষোলো-আনা অহিংসায় বিশ্বাসী না হয় এবং সেইমত আচরণ না করে, তবে নারী-অপহরণেচ্ছু শত্রুর বিরুদ্ধে মেয়েদের মান-মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ না করিলে তাহারা ধর্ম ও মনুষ্যত্বের নিকট অপরাধী হইবে। এই-সব পরামর্শ ও আমার পূর্বকার আচরণ আমার ষোলো-আনা অহিংসাবাদের সঙ্গে শুধু সংগতই মনে করি না, তাহার প্রত্যক্ষ পরিণাম বলিয়াই মনে করি। সেই উদার মত বাক্যে প্রকাশ করা খুবই সহজ। কিন্তু দিনে দিনে আমি ক্রমেই বুঝিতেছি, উহা জানিয়াও তদনুসারে আচরণ করা কত কঠিন, বিশেষ করিয়া কলহ-বিবাদ, হিংসা-দ্বেষ ও গোলযোগে ভরা এই জগতে। তথাপি প্রতিদিন এই দৃঢ় ধারণা গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে যে ইহা না হইলে জীবনযাপনের কোনো অর্থ নাই। ১১৭

শুধু অহিংসার তৌলে ওজন করিলে আমার আচরণের কোনো সাফাই নাই, যাহারা মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে এবং যাহারা রেডক্রসের কাজ করে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। উভয়েই যুদ্ধে যোগদান করে এবং ইহার পক্ষে কাজ করে। কিন্তু এত বৎসরের অন্তর্বিচার সত্ত্বেও আমি বুঝিতেছি

যে আমার অবস্থা-বিবেচনায় বুয়র-যুদ্ধে, ইউরোপের মহাযুদ্ধে, এবং সেই হিসাবে ১৯০৬ সালে নাটালের তথাকথিত জুলু-বিদ্রোহের সময়েও, যাহা করিয়াছি তাহা করিতে আমি বাধ্য ছিলাম।

জীবন বহুবিধ শক্তির দ্বারা পরিচালিত। জীবনতরণী সহজে ভাসিয়া চলিত যদি কেহ নিজের কর্মধারা শুধু একটি নীতির দ্বারা স্থির করিতে পারিত, যদি কোনো নির্দিষ্ট ক্ষণে সে-নীতির প্রয়োগ এমনই স্পষ্ট হইত যে এক মুহূর্তেরও চিন্তার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এত সহজে স্থির করা যাইবে এমন একটি কাজও মনে মনে খুঁজিয়া পাই না।

পাকা যুদ্ধবিরোধী আমি, শিক্ষা লইবার সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও মারণাস্ত্র প্রয়োগের শিক্ষা গ্রহণ করি নাই। সম্ভবত এইরূপেই আমি প্রত্যক্ষ মানবজীবনের ধ্বংসসাধন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলাম। কিন্তু যতদিন শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসনের অধীনে দিন যাপন করিতেছি এবং স্বেচ্ছায় ইহার বিস্তর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতেছি, ততদিন যুদ্ধ-নিরত অবস্থায় ইহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে আমি বাধ্য, যদি না আমি এই শাসনতন্ত্রের সহিত অসহযোগ করিয়া ইহার সুযোগ-সুবিধাগুলি যতদূর সাধ্য প্রত্যাখ্যান করি।

একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক : আমি একটি সংস্থার সদস্য; সংস্থাটির কয়েক একর জমি আছে, কিন্তু ফসলগুলি বানরদের হাতে নষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। সকল জীবনেরই পবিত্রতায় আমি বিশ্বাসী, তাই বানরদের কোনো দৈহিক ক্ষতিসাধন করা আমি অহিংসা-ব্রতের স্খলন বলিয়া মনে করি। কিন্তু ফসলগুলি রক্ষার জন্য বানরদের বিরুদ্ধে অভিযানে উৎসাহ দান ও তাহা পরিচালনা করিতে আমি দ্বিধাবোধ করি না। যদি এই অন্যায় হইতে আমি দূরে থাকিতে চাই তবে সংস্থা ত্যাগ করিয়া বা তাহা ভাঙিয়া দিয়া সেরূপ করা আমার পক্ষে সম্ভব। যেখানে কৃষি হইবে না, সুতরাং জীবনের কোনো-না-কোনো প্রকার ধ্বংস হইবে না, সেরূপ সমাজ খুঁজিয়া পাইব বলিয়া আশা করি না। তাই কম্পিত-বক্ষে বিনীতভাবে ও প্রায়শ্চিত্তের মনোবৃত্তি লইয়া তখন আমি বানরদের দৈহিক ক্ষতি সাধনে যোগদান করি। আশায় থাকি যে কোনো-না-কোনো দিন মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিব।

ঠিক সেইভাবেই আমি ঐ তিনটি যুদ্ধকর্মে যোগদান করিয়াছিলাম। আমি যে সমাজের লোক তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। তাহা আমার পক্ষে বাতুলতা হইত। ঐ তিন ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করিবার চিন্তা আমার মনের মধ্যে আসে নাই। সরকার সম্বন্ধে আজ আমার মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক, সুতরাং আমি স্বেচ্ছায়

ইহার যুদ্ধবিগ্রহে যোগ দিব না। যদি ইহার সমর-ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতে হয় বা অন্য ভাবে যোগ দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহা অমান্য করিয়া জেলে যাইতে এমন-কি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেও রাজী আছি।

কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। যদি জাতীয় সরকার থাকিত, তবে আমি প্রত্যক্ষভাবে কোনো সংগ্রামে যোগ না দিলেও, এমন-সকল অবস্থা কল্পনা করিতে পারি যখন যাহারা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণের অনুকূলে ভোট দেওয়া আমার কর্তব্য হইবে। কারণ আমি জানি, আমি অহিংসায় যতখানি বিশ্বাসী তাহারা সকলে ততখানি বিশ্বাসী নহে। কোনো মানুষকে বা কোনো সমাজকে জোর করিয়া অহিংস করা যায় না।

অহিংসার শক্তি এক রহস্যময়ভাবে কাজ করে। অহিংসার ভাষায় প্রায়ই মানুষের কর্ম বিশ্লেষণ করা যায় না; যখন সে শ্রেষ্ঠ অর্থে অহিংস এবং পরেও পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে সে অহিংসই ছিল, তখনো অনেক সময় তাহার কাজকর্মে হিংসার আকার দেখা যায়। তাহা হইলে আমার আচরণের পক্ষে এই পর্যন্ত দাবি করিতে পারি যে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে অহিংসার জন্যই আমি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। হীন জাতীয় বা অন্য কোনো স্বার্থের চিন্তা সেখানে ছিল না। কোনো স্বার্থ বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বার্থ বা অন্য স্বার্থ সংরক্ষণে আমি বিশ্বাস করি না।

আমার যুক্তির আর জের টানিব না। মানুষের চিন্তা পুরাপুরি প্রকাশ করিবার পক্ষে ভাষা দুর্বল বাহন মাত্র। অহিংসা আমার নিকট শুধু দার্শনিক নীতি নয়, ইহা আমার জীবনের নিয়ামক, আমার প্রাণের প্রাণ। আমি জানি, কখনো জ্ঞাতসারে, বেশির ভাগ সময় অজ্ঞাতসারে, আমি প্রায়ই ব্রত হইতে বিচ্যুত হই। ইহা বুদ্ধির কথা নয়, হৃদয়ের কথা। সত্যকার পথনির্দেশ আসিতে পারে অবিরাম ভগবৎ-নির্ভরের পথ দিয়া, পরম দীন ভাব অবলম্বন করিলে, আত্মবিলোপ-সাধনে ও সর্বদা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত হইলে। ইহার আচরণের জন্য চাই অভয় ও উচ্চকোটির সাহস। আমি আমার ত্রুটিবিচ্যুতির সম্বন্ধে খুবই অবহিত আছি এবং তাহা আমাকে পীড়া দিতেছে।

কিন্তু আমার মধ্যে যে-আলো আছে তাহা স্পষ্ট, ম্লান নহে। সত্য ও অহিংসা ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আমি জানি যে যুদ্ধ অন্যায়, এমন এক অমঙ্গল যার কোনো 'কাটান' নাই। আমি ইহাও জানি যে যুদ্ধকে অপসৃত হইতেই হইবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে রক্তপাত বা চালাকির দ্বারা যে-স্বাধীনতা পাওয়া যায় তাহা স্বাধীনতাই নয়। আমার কোনো কর্মের ফলে অহিংসার নামে হিংসার সহিত আপস-রফা করিয়াছি; কিংবা

যে-কোনো প্রকারে হউক না কেন, হিংসা বা অসত্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছি, এইরূপ অপবাদ অপেক্ষা আমার নিকট বহুগুণে শ্রেয় হইবে লোকে যদি আমার প্রতি আরোপিত কর্মকে একেবারে অযৌক্তিক বিবেচনা করেন। হিংসা নয়, অসত্য নয়, অহিংসা ও সত্যই আমাদের জীবনের ধর্ম। ১১৮

আমি আমার শক্তির সীমা জানি। সেই ধারণাই আমার একমাত্র শক্তি। জীবনে যাহা-কিছু করিতে পারিয়াছি তাহা অন্যান্য কারণ অপেক্ষা আমার নিজের সীমিত শক্তির ধারণা হইতে উদ্ভূত। ১১৯

সারাজীবন আমাকে লোকে ভুল বুঝিয়াছে, তাহা আমার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক লোকসেবকেরই এই ভাগ্য। তাহার চামড়া শক্ত হওয়া চাই। জীবন ভার হইত যদি প্রত্যেক ভুল-বোঝাবুঝির জবাবদিহি করিতে হইত। ভুল-বোঝাবুঝির জবাবদিহি না করাই ছিল আমার জীবনের নীতি। যখন আদর্শের খাতিরে সংশোধন করা প্রয়োজন হইত তখন অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। এই নিয়ম আমাকে অনেক সময় অপচয় ও উদ্বেগের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। ১২০

যে-গুণ আমার আছে বলিয়া দাবি করিতে পারি তাহা হইল সত্য ও অহিংসা। কোনো অতিমানবিক শক্তি আমার আছে, এ-দাবি আমি করি না। আমি সে-রকম কিছু চাইও না। অন্য লোকের যেমন রক্তমাংসের শরীর, আমারও তেমনি। অন্য লোকের যেমন ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, আমারও তেমনি। আমার সেবা অনেক দিক হইতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এ-পর্যন্ত ভগবানের আশীর্বাদ পাইয়াছি, যতই ত্রুটি থাকুক।

কারণ ভুলভ্রান্তির স্বীকার সম্মার্জনীর মতো, মনের ময়লা ঝাঁটাইয়া ফেলে, ও মনের উপরিতল পূর্বাপেক্ষা পরিষ্কার রাখে। ইহাতে আমার দোষ স্বীকারের জন্য আমি আরো শক্তি পাই। পুনরায় ভুল পথ ছাড়িয়া ঠিক পথ ধরায় নিশ্চয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিকট পেঁছাইব। সরল পথ হইতে সরিয়া যাওয়ার জন্য জিদ করিয়া মানুষ কখনো তাহার গন্তব্য স্থানে পেঁছায় নাই। ১২১

মহাত্মার ভাগ্যে যাহা থাকে থাকুক। আমি অসহযোগী হইয়াও সরকার যদি এমন আইনের প্রস্তাব করেন, যাহা আমাকে মহাত্মা নামে ডাকা ও পা ছুঁইয়া প্রণাম করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবে তাহাতে

আমি সানন্দে স্বাক্ষর করিব। আশ্রমে আমি নিজেই আইন করিতে পারি, তাই সেখানে এরূপ আচরণ দণ্ডনীয় অপরাধ। ১২২

এই অধ্যায়গুলি শেষ করিবার সময় হইয়া আসিল।... এই সময় হইতে আমার জীবন এতখানি সর্বসাধারণের হইয়া গিয়াছে যে আমার জীবনের এমন বিশেষ কিছু নাই যাহা লোকের অজানা।... আমার জীবন পাতা-খোলা বইয়ের মতো। আমার গোপন বলিয়া কিছু নাই। অন্যকেও গোপন রাখিতে আমি উৎসাহ দিই না। ১২৩

সত্য ছাড়া অন্য কোনো ভগবান নাই, আমার নিরন্তর অভিজ্ঞতার ফলে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। আর এই অধ্যায়গুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যদি পাঠকের নিকট এই কথা ঘোষিত করা না হইয়া থাকে যে সত্য-উপলব্ধির একমাত্র উপায় হইল অহিংসা, তাহা হইলে এই অধ্যায়গুলি লেখার পরিশ্রম বৃথা হইল মনে করিব; এবং যদিও এই দিকে আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকে, পাঠকেরা জানিয়া রাখুন যে তাহা সুমহতী নীতির ব্যর্থতা নয়, মাধ্যমের অকৃতার্থতা। ১২৪

আমার ভারতবর্ষে ফেরার পর হইতে আমার মধ্যে যে-সকল বাসনা লুকাইয়া ছিল তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে। তাহাদের অস্তিত্ব আমাকে পরাভূত না করিলেও, আমি যে হীন এ-বোধ জন্মাইয়াছে। এই-সকল অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ও আমাকে প্রভূত আনন্দ দিয়াছে, কিন্তু আমি জানি যে এখনো আমার সম্মুখে দুস্তর পথ রহিয়াছে। আমার নিজেকে তুচ্ছ ও অপদার্থ জ্ঞান করিতে হইবে। যতক্ষণ মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় নিজেকে সকলের নিম্নে না রাখিবে ততক্ষণ তাহার মুক্তি নাই। অহিংসা হইল দৈন্যের শেষ সীমা। ১২৫

নির্বিচারে প্রদত্ত খ্যাতির বিড়ম্বনা আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। লোকে যদি ঘৃণায় আমাকে দেখিয়া থুতু ফেলিত, তবেই আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি তাহা বুঝিতে পারিতাম। তখন আর পর্বতপ্রমাণ ভুল স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইত না, পূর্ব সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার বা পুনর্বিন্যাসেরও প্রয়োজন হইত না। ১২৬

মানের জন্য আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। উহা তো রাজদরবারে বসিবার আসন। আমি যেমন হিন্দু, তেমনি খ্রীষ্টান, মুসলমান, পার্শি, জৈন,

সকলের দাস। ভৃত্যের মানের কোনো প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন স্নেহ-ভালোবাসার। যতদিন বিশ্বস্তভাবে সেবা করিব, ততদিন নিশ্চয় ভালো-বাসা পাইব। ১২৭

যে কারণেই হউক, ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাওয়ার নামে আমার ভয় হয়। ঐ দুই মহাদেশের লোককে যে আমি আমার দেশবাসীদের অপেক্ষা বেশি অবিশ্বাস করি তাহা নয়, আমি নিজেকেই বিশ্বাস করিতে পারি না। স্বাস্থ্যের জন্য বা দেশভ্রমণের জন্য আমার পাশ্চাত্ত্যে যাওয়ার অভিপ্রায় নাই। জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। লোকে আমায় মাথায় তোলে, ইহা আমি ঘৃণা করি। আমি যে আবার কখনো প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিবার বা সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার মতো স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি ভগবান আমাকে কখনো পশ্চিমে পাঠান তবে সেখানে জনগণের হৃদয় জয় করিবার জন্য যাইব। সেখানকার তরুণদের সহিত শান্তভাবে আলাপ করিবার জন্য এবং সমধর্মীদের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ লাভের জন্য যাইব— সমধর্মী আমি তাঁহাদেরই বলি যাঁহারা সত্য ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থের বিনিময়ে শান্তিকামী।

কিন্তু এখনো আমার মনে হয় যে ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমের নিকট দিবার মতো আমার কোনো বাণী নাই। আমি বিশ্বাস করি আমার বাণী সর্বজনীন, কিন্তু এখনো আমি মনে করি দেশে আমার কাজের মধ্য দিয়াই সেই বাণী সবচেয়ে ভালো করিয়া দিতে পারি। যদি ভারতবর্ষে বলিবার মতো কোনো উন্নতি দেখাইতে পারি, তবে আমার বাণী সার্থক হইবে। ভারতবর্ষ আমার বাণী শুনিতে চাহে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ যদি ঘটে, তথাপি, নিজের বাণীতে আস্থা থাকা সত্ত্বেও শ্রোতার সন্ধানে অন্যত্র যাইতে চাহিব না। যদি ভারতবর্ষের বাহিরে যাই, তবে আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাইব, যদিও সকলের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পারি না যে যতই ধীরে হউক না কেন ভারতবর্ষ আমার এ-বাণী গ্রহণ করিতেছে।

বাহির হইতে যে-সকল বন্ধু আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত সংকোচের সঙ্গে পত্রালাপ যখন চলিতেছিল, তখন দেখিলাম যে শুধু রম্যাঁ রলাঁকে দেখিবার জন্য হইলেও আমার ইউরোপ যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সাধারণভাবে দেখাশোনায় আমার নিজের উপরে আস্থা নাই, সেইজন্য আমি পশ্চিমের সেই বিজ্ঞজনের দর্শনই আমার ইউরোপে যাওয়ার প্রাথমিক কারণ করিতে চাহিয়াছিলাম। সেইজন্য আমি নিজের অসুবিধার

কথা জানাইয়া যথাসম্ভব সরলভাবে প্রশ্ন করিলাম, তাঁহাকে দেখার জন্য আমার এই ইচ্ছাকে তিনি আমার ইউরোপ ভ্রমণের মূল কারণরূপে ধরিতে দিবেন কি না। তিনি সত্যের নামে জানাইলেন, যদি তাঁহার সঙ্গে দেখা করাই মূল কারণ হয়, তবে তিনি আমাকে ইউরোপে যাইতে দিবেন না। আমাদের দেখাশোনার জন্য তিনি আমার এখানকার কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাইতে চান না। এই দেখাশোনা ছাড়া আমি নিজের মধ্যে কোনো জরুরি আহ্বান শুনিতে পাইলাম না। আমার সিদ্ধান্তের জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু মনে হয় ঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছিলাম। কারণ ভিতর হইতে ইউরোপে যাওয়ার জন্য যেমন কোনো প্রেরণা নাই, তেমনি এখানে এত-কিছু করিবার আছে বলিয়া ভিতর হইতে অবিরাম ডাক শুনিতেছি। ১২৮

পৃথিবীতে কাহাকেও ঘৃণা করিতে অসমর্থ বলিয়া আমি নিজেকে মনে করি। বহুকালের প্রার্থনাময় ও সংযত জীবন যাপনের ফলে চল্লিশ বৎসরেরও বেশি হইল কাহাকেও ঘৃণা করা হইতে বিরত আছি। আমি জানি যে এই দাবি খুব বড় রকমের, তথাপি সবিনয়ে আমি এই দাবি করি। কিন্তু যেখানেই পাপ থাকুক আমি তাহা ঘৃণা করিতে পারি এবং করিও। ইংরেজেরা ভারতবর্ষে যে-শাসনপ্রণালী চালাইতেছে তাহা আমি ঘৃণা করি। লক্ষ লক্ষ হিন্দু যে-কুৎসিত অস্পৃশ্যতা-রীতির জন্য নিজেদের দায়ী করিয়া রাখিয়াছে আমি অন্তরের অন্তস্তল হইতে তাহা যেমন ঘৃণা করি, ভারতের নির্মম শোষণকেও তেমনি ঘৃণা করি। কিন্তু যে-হিন্দুরা কর্তৃত্ব করিতেছে তাহাদের ঘৃণা করিতে যেমন অস্বীকার করি, তেমনি যে-সব ইংরেজের হাতে কর্তৃত্ব আছে তাহাদেরও ঘৃণা করি না। আমার কাছে যে-সব প্রেমের পথ খোলা আছে তাহা দিয়া আমি তাহাদের সংস্কার সাধন করিতে চাই। ১২৯

কিছুদিন পূর্বে একটি বাছুর বিকলাঙ্গ হইয়া আশ্রমে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। সাধ্যমত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা হইল। যে-ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া হইল তিনি বলিলেন এ-ব্যাপারে কোনো সাহায্যের পথ নাই, আশাও নাই। উহার কষ্ট এত বেশী হইতেছিল যে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা ছাড়া পাশ ফিরিতেও পারিতেছিল না।

এ-অবস্থায় আমার মনে হইল যে মনুষ্যত্বের দিক হইতে জীবনের অবসান ঘটাইয়াই উহার যন্ত্রণা শেষ করিয়া দেওয়া উচিত। সমগ্র আশ্রমের অধিবাসীদের সম্মুখে বিষয়টি তোলা হইল। আলোচনা-প্রসঙ্গে জনৈক ভদ্র প্রতিবেশী ব্যথার অবসানের জন্যও নিধনের প্রস্তাব জোর গলায়

প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার প্রতিবাদের ভিত্তি হইল, যে-জীবন লোকে সৃষ্টি করিতে পারে না, সেই জীবন লওয়ারও তাহার অধিকার নাই। তাঁহার যুক্তি এ-ক্ষেত্রে নিরর্থক বলিয়া আমার মনে হইল। যুক্তি থাকিত, যদি জীবন লওয়ার মূল উদ্দেশ্য থাকিত স্বার্থসিদ্ধি। অবশেষে অত্যন্ত দীনচিত্তে কিন্তু সুস্পষ্ট দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া এক ডাক্তারের সাহায্য লইলাম, তিনি বিষ-সূচিকা-প্রয়োগে অনুগ্রহ করিয়া বাছুরটিকে শান্তি দিলেন। দুই মিনিটের কমে সমস্ত শেষ হইয়া গেল।

আমি জানিতাম যে সাধারণ জনমত, বিশেষ করিয়া আমেদাবাদে, আমার কার্যের সমর্থন করিবে না এবং ইহার মধ্যে হিংসা ভিন্ন কিছু দেখিতে পাইবে না। কিন্তু আমি ইহাও জানিতাম যে কর্তব্যপালনে জনমতের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সর্বদাই এই ধারণা পোষণ করিয়াছি যে যাহা নিজের নিকট ন্যায্য বলিয়া মনে হয় তাহাই করা উচিত, যদিচ অন্যের নিকট তাহা ভুল বা অন্যায় বলিয়া মনে হইতে পারে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছি যে এই নীতিই শুদ্ধ। তাই কবি গাহিয়াছেন : 'প্রেমের পথ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া, যাহাদের সংকোচ আছে তাহারা সে-পথ হইতে ফিরিয়া যায়।' অহিংসার পথে, অর্থাৎ প্রেমের পথে, প্রায়ই একলা চলিতে হয়।

এই প্রশ্ন আমাকে সংগতভাবেই করা যাইতে পারে— বাছুরের সম্পর্কে যে-নীতি বলিয়াছি, মানুষের বিষয়েও কি তাহা প্রয়োগ করিতে চাই? আমার নিজের জীবনেও কি তাহা প্রয়োগ করিব? আমার উত্তর হইল, হাঁ, উভয় ক্ষেত্রেই এক আইন চলিবে। এই আইন, 'একের সম্বন্ধে যাহা, সকলের সম্বন্ধেও তাহা', ইহার কোনো ব্যতিক্রম নাই। থাকিলে বাছুরটির নিধনও অন্যায় ও হিংসাপ্রণোদিত হইত। আচরণে বা কার্যত আমরা কিন্তু আমাদের নিকট-আত্মীয়দের রোগ হইলে মৃত্যুর দ্বারা তাহাদের দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাই না, কারণ সাধারণত সর্বদাই তাঁহাদের সাহায্য করিবার উপকরণ আমাদের সঙ্গে আছে এবং তাঁহাদের নিজেদের চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু মনে করা যাক একজন বন্ধু রোগে ভুগিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোনোপ্রকার সাহায্য করিতে পারিতেছি না, আরোগ্যেরও কোনো সম্ভাবনা নাই। রোগী যন্ত্রণায় জ্ঞান-হারা হইয়া পড়িয়া আছেন। এ-অবস্থায় মৃত্যুর দ্বারা তাঁহার যন্ত্রণার অবসান ঘটাইলে কোনো হিংসা এ-কাজের মধ্যে আমি দেখিতে পাই না।

একজন শল্য চিকিৎসক যেমন ছুরি চালাইলে হিংসা হয় না, শুদ্ধতম অহিংসাই হয়, তেমনি কোনো জরুরি অবস্থার তাগিদে আর-এক ধাপ অগ্রসর হইয়া রোগীর স্বার্থে দেহ হইতে প্রাণ বিমুক্ত করারও প্রয়োজন

হইতে পারে। আপত্তি উঠিতে পারে যে শল্য চিকিৎসক রোগীর জীবন-রক্ষার্থে অস্ত্রপ্রয়োগ করে, অন্য ক্ষেত্রে আমরা ঠিক তাহার বিপরীত করিতেছি। কিন্তু গভীরতর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখি, উভয়েরই লক্ষ্য এক, অন্তরে যে-আত্মা কষ্ট পাইতেছে তাঁহার কষ্টের লাঘব করা। এক ক্ষেত্রে আমরা তাহা করি রুগ্ন অঙ্গ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া, অন্য ক্ষেত্রে যে-দেহ আত্মার যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে তাহা আত্মা হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়া। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হইল ব্যথা-বেদনা হইতে আত্মাকে মুক্ত করা, অন্তরের জীবনের বাহিরে যে-দেহ, তাহা তো ব্যথা ও আনন্দ-বোধে অসমর্থ। অন্য ঘটনাও কল্পনা করা যাইতে পারে, যেখানে নিধন না করার অর্থই হইবে হিংসা, নিধন হইবে অহিংসা। যেমন, মনে করা যাক, আমার কন্যা, যাহার মনোভাব তন্মুহূর্তে সঠিকভাবে জানার আমার উপায় নাই, আসন্ন বলাৎকারের সম্মুখীন এবং তাহাকে বাঁচাইবার অন্য কোনো উপায় নাই, তখন তাহার জীবনের অবসান ঘটাইয়া নিজেকে ক্রুদ্ধ পাষণ্ডের ক্রোধোন্মত্ততার কাছে সমর্পণ করা বিশুদ্ধ অহিংসার নিদর্শন।

আমাদের অহিংসাব্রতীদের লইয়া বিপদ এই যে তাঁহারা অহিংসাকে একটা অন্ধসংস্কার রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের মধ্যে প্রকৃত অহিংসা বিস্তারের পথে প্রচণ্ড বাধা রাখিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে অহিংসা সম্বন্ধে যে-ধারণা প্রচলিত আছে, আমার মতে তাহা ভ্রান্ত ধারণা—আমাদের বিবেককে যেন আফিং খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে, এবং রূঢ় বাক্য, কর্কশ বিচার, অশুভ কামনা, ক্রোধ, ঈর্ষা এবং কামের মতো হিংসার বহু ও জটিলতর রূপ সম্বন্ধে আমাদের চেতনাহীন করিয়াছে; মানুষ ও জীব-জন্তুর মন্দ মন্দ উৎপীড়ন, স্বার্থপর লোভের বশে তাহাদের অনশন ও শোষণ, স্বেচ্ছাচারের ফলে দুর্বলেরা যে-অত্যাচার ও হীনতা সহ্য করে এবং তাহাদের আত্মসম্মানের যে-হত্যা আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই—হিতকর প্রাণনাশের অপেক্ষা এ-সকলে যে হিংসার আরো বেশি প্রকাশ থাকিতে পারে, তাহা আমাদের ভুলাইয়া দিয়াছে। কেহ কি মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করে যে অমৃতসরের সেই কুখ্যাত গলিতে যাহাদের উৎপীড়ন করিয়া কীটের মতো বুকে হাঁটিতে বাধ্য করা হইয়াছিল তাহাদের সংক্ষেপে মারিয়া ফেলিলে আরো অনেক দয়া দেখানো হইত? যদি কেহ ইহার জবাব দিতে চায় এই বলিয়া যে আজ এই লোকেরাই অন্যরূপ মনে করে, মনে করে যে বুকে হাঁটিয়া তাহাদের কোনো ক্ষতি হয় নাই, তাহা হইলে এ-কথা বলিতে আমার কোনো দ্বিধা নাই যে সে অহিংসার অ-আ-ক-খ জানে না। মানুষের জীবনে এমন-সব অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যখন তাহার প্রাণ দিয়াও কর্তব্যপালন করা অবশ্যকরণীয় হয়; মানুষ এই

গোড়ার কথাটা না বুঝিলে অহিংসার ভিত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বাহির হইয়া পড়ে। যেমন সত্যের পূজারী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন মিথ্যাময় জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য মৃত্যুদূত পাঠাইতে, ঠিক সেইরূপ অহিংসাব্রতীও নতজানু হইয়া তাঁহার শত্রুকে অনুনয় করিবেন, যেন তাঁহাকে অপমানিত না করিয়া বা মানুষের মর্যাদার অনুচিত কোনো কিছু করিতে বাধ্য না করিয়া মৃত্যুমুখে প্রেরণ করেন। কবি গাহিয়াছেন, 'প্রভুর পথ বীরের জন্য, কাপুরুষদের জন্য নয়।'

অহিংসার প্রকৃতি ও গণ্ডি সম্বন্ধে এই মৌলিক ভ্রান্ত ধারণা, পারস্পরিক মূল্যায়নের এই বিশৃঙ্খলা— ইহার জন্যই আমরা ভুল করি যে শুধু নিধন হইতে বিরত থাকার নামই অহিংসা; এবং ইহার জন্যই আমাদের দেশে অহিংসার নামে ভীষণ সব হিংসার ব্যাপার চলিতে থাকে। ১৩০

আমার কাছে 'মহাত্মাগিরির চেয়ে সত্যের মূল্য অনন্তগুণ বেশি, 'মহাত্মা'-গিরি তো নিছক ভার মাত্র। আমার নিজের শক্তির সীমা ও আমার অকিঞ্চিৎকরতার জ্ঞানই এ-পর্যন্ত আমাকে মহাত্মাগিরির চাপানো বোঝা হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। জীবনধারণের ইচ্ছা আমাকে অবিরত হিংসার কাজে লিপ্ত রাখিয়াছে এ-কথা বেদনার সহিত আমি জানি, তাই আমি আমার এই জড়দেহের প্রতি ক্রমেই উদাসীন হইতেছি। যেমন ধরুন, আমি জানি যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে আমি অসংখ্য অদৃশ্য বায়ুচর জীবাণু নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। তাই বলিয়া আমি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিতেছি না। শাকসবজি খাওয়ার মানেও হিংসা, কিন্তু তাহা আমি ছাড়িতে পারি না। আবার পচন-প্রতিষেধক বস্তুর প্রয়োগেও হিংসা আছে, কিন্তু আমি এখনো মশক প্রভৃতি কীটপতঙ্গের ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেরোসিন তেলের মতো পচন-প্রতিষেধক দ্রব্য বর্জন করিব বলিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারি নাই। আশ্রমে যখন সাপ ধরিয়া তাহারা যাহাতে ক্ষতি করিতে না পারে এমনভাবে দূরে ফেলিয়া আসা অসম্ভব হইল, সর্পবধও আমি তখন সহ্য করি। আশ্রমে বলদ তাড়াইবার জন্য ছোট লাঠির প্রয়োগও আমি মানিয়া লই; আমার সম্মতি অনুসারেই তাহা হয়। এইরূপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে হিংসা বরণ করিতেছি তাহার কোনো শেষ নাই। এখন আমি আবার সম্মুখে বানর-সমস্যা দেখিতে পাইতেছি। পাঠককে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে বলি যে মারিয়া ফেলিবার মতো চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আমি তৎপর হইব না। বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের মারিয়া ফেলা সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত আমি মন স্থির করিতে পারিব কি না সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমি এই প্রতিশ্রুতিও দিতে

পারিব না যে আশ্রমের ফসল সব নষ্ট করিলেও বানরদের কখনো মারিয়া ফেলিব না। আমার এই স্বীকারোক্তির ফলে বন্ধুরা যদি আমার বিষয়ে হাল ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব বটে, কিন্তু অহিংসার আচরণে আমার ত্রুটিবিচ্যুতি লুকাইবার চেষ্টা কিছুতেই করিব না। আমি নিজের জন্য শুধু এইটুকুই দাবি করিব যে আমি অহিংসার মতো বড় বড় আদর্শের ব্যঞ্জনা অনবরত বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, কায়মনো-বাক্যে আচরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, এবং মনে করি খানিকটা সার্থকও হইয়াছি। কিন্তু আমি জানি এখনো এই দিকে আমাকে বহু দীর্ঘ পথ চলিতে হইবে। ১৩১

আমি দরিদ্র ভিখারি। আমার পার্থিব সম্পত্তির মধ্যে ছয়টি চরকা, জেলের থালা বাটি, ছাগলের দুধের একটি পাত্র, ছয়খানি হাতে-কাটা সুতার ছোট ধুতি ও তোয়ালে, আর আমার সুনাম— তাহার মূল্য আর কত হইবে?১ ১৩২

যখন রাজনীতির আবর্তে আসিয়া পড়িলাম, নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দুর্নীতির দ্বারা, অসত্যের দ্বারা, রাজনৈতিক লাভালাভের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া থাকিতে হইলে আমার পক্ষে কি প্রয়োজন। আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম যে যাহাদের মধ্যে আমার জীবনযাপন করিতে হইবে এবং যাহাদের দৈনন্দিন দুঃখকষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাদের সেবা করিতে হইলে আমাকে সকল ধন-সম্পত্তি বর্জন করিতে হইবে।

যখন এই বিশ্বাস হইল তখনই যে আমি সব বর্জন করিতে পারিলাম সে-কথা সত্য করিয়া বলিতে পারি না। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রথম প্রথম অগ্রগতি বড় মন্থর হইয়াছিল। আজ যখন সেই-সব দিনের কথা মনে করি তখন দেখি সেই-সব ছাড়িতে কষ্টও হইয়াছিল। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল আমি দেখিলাম আমাকে আরো অনেক কিছু ছাড়িতে হইবে, এবং এই বর্জনে আমি সত্যকার আনন্দ লাভ করিলাম। তখন একে একে, প্রায় জ্যামিতিক নিয়মে, জিনিসগুলি আমাকে ছাড়িতে লাগিল। আজ পিছনের দিকে চাহিলে দেখিতে পাই, আমার মনের উপর হইতে যেন একটা বোঝা সরিয়া গেল: মনে হইল এখন আমি স্বচ্ছন্দে পথ চলিতে ও সমধিক আনন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে আমার দেশবাসীর সেবা

---

১ মার্সেই-বন্দরে শুল্ক-কর্মচারীদের নিকট, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১।

করিতে পারিব। যে-কোনো সম্পত্তিই তখন আমার কাছে বিরক্তিকর এবং বোঝা-স্বরূপ মনে হইতে লাগিল।

এই আনন্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম, নিজের বলিয়া কিছু থাকিলেই সমগ্র জগতের কাছ হইতে তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। দেখিতে পাইলাম জগতে অসংখ্য লোক আছে যাহাদের কিছু নাই, অথচ পাইতে চায়। আমাকে কোনো নির্জন স্থানে যদি বুভুক্ষু দলের হাতে পড়িতে হয়, তাহারা আমার সঙ্গে আহার্য ভাগ করিয়া খাইয়াই শুধু সন্তুষ্ট থাকিবে না, আমার সর্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিবে, তখন তাহা রক্ষাকল্পে আমাকে পুলিসের সাহায্য লইতে হইবে। তখন আমি নিজেকে বুঝাইলাম, ইহারা বিদ্বেষের বশে এরূপ করিবে এমন নয়, যদি লইতে চায় তবে ইহাদের প্রয়োজন আমার অপেক্ষা বেশি বলিয়াই চাহিবে।

আমি স্থির করিলাম, পরিগ্রহ পাপ; পরিগ্রহ করা তখনই চলে যখন আমার যাহা-কিছু আছে, অপরেও ইচ্ছা করিলে তাহা পাইতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, আর নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, এরূপ একটা অবস্থা একেবারেই অসম্ভব। সেজন্য অপরিগ্রহই, কোনো কিছু না থাকাই, একমাত্র ব্রত যাহা সকলেই গ্রহণ করিতে পারে। অন্য কথায় স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ।... সুতরাং ইহাই যখন আমার একান্ত বিশ্বাস, তখন আমার মনে সততই এই আকাঙ্ক্ষা যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইলে যেন এই দেহও স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিতে পারি; আর যতদিন আমার দেহ থাকিবে ততদিন সুখসম্ভোগের জন্য, আত্মতৃপ্তির জন্য, স্বেচ্ছাচারের জন্য তাহার ব্যবহার না করি, যতক্ষণ জাগ্রত থাকি প্রতিনিয়ত কেবল মানবের সেবায় উহা নিযুক্ত রাখি। দেহের সম্বন্ধে যদি এই কথা সত্য হয়, তবে পরিধেয় বা আমাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে তাহা আরো কত বেশি সত্য?

এই স্বেচ্ছায়-বরণ-করা দারিদ্র্যের ব্রত যাহারা পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়াছেন— অবশ্য অখণ্ড সম্পূর্ণতা লাভ কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়— তবু যথাসাধ্য পালন করিয়া যাঁহারা ঐ আদর্শে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে নিজের সব কিছু ত্যাগ করিলেই তবে জগতের সম্পদ লাভ করা যায়। ১৩৩

তরুণ বয়স হইতেই নৈতিক শিক্ষার দিক হইতে আমি ধর্মশাস্ত্রগুলির মূল্য যাচাই করিতে শিখিয়াছিলাম। অলৌকিক শক্তিতে আমার কোনো-দিন আস্থা ছিল না। যিশুখ্রীষ্ট যে-সব অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত আছে, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসও যদি থাকিত তবু সর্বজনীন নীতির সঙ্গে সংগতি না থাকিলে আমি সে-সব মানিয়া

লইতে পারিতাম না। যে করিয়াই হউক, ধর্মগুরুদের কথাকে আমি যেমন জীবন্ত শক্তির আকর মনে করি কোনো সাধারণ মানুষের কথাকে তেমন মনে করি না।

যিশু আমার কাছে জগতের শিক্ষাগুরুদের একজন। তাঁহার সমসাময়িক লোকেদের মতে তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র। তাহাদের বিশ্বাস আমার বিশ্বাস এক না হইতে পারে। ঈশ্বরের অনেক পুত্রের একজন হিসাবেই তিনি আমার জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জন্ম অপেক্ষা "জাত" কথাটার এক গভীরতর, সমৃদ্ধতর অর্থ আছে। যিশুকে তাঁহার কালে ঈশ্বরের প্রায় সমান সমান মনে করা হইত। যিশুর শিক্ষা ও মত যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সম্মুখে এক অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া তিনি তাহাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা তাহা দেখিয়াও জীবনে পরিবর্তন সাধন করিল না, তাহাদের কাছে ঐ দৃষ্টান্তের মূল্য কি? খাদ-মিশ্রিত সোনা যেমন পুড়িয়া বিশুদ্ধ হয় তেমনি অনুতপ্ত ব্যক্তি অনুতাপের দ্বারা তাহার পূর্ব কালিমা হইতে মুক্ত হয়।

আমি আমার অনেক দোষের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু আমি সে-সব দোষের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বেড়াই না। আমি যদি ঈশ্বরের অভিমুখে চলি, এবং আমার বিশ্বাস আমি সে-ভাবে চলিতেছি, তাহা হইলে আমার কোনো ভয় নাই। কারণ তাঁহার সত্তার কিরণ যে আমি অনুভব করি। আমি জানি, উপবাস, প্রার্থনা, কৃচ্ছ্রসাধন, এ-সবের কোনো মূল্য থাকিত না, যদি আমি শুধু ইহাদের উপরই নির্ভর করিতাম। কিন্তু এগুলির মধ্য দিয়া ব্যাকুল এক আত্মা সৃষ্টিকর্তার ক্রোড়ে তাহার ক্লান্ত মস্তক রক্ষা করিতে চাহিতেছে, এইজন্য এ-সবের অনির্বচনীয় মূল্য। ১৩৪

প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে হিন্দু ধর্মে অনন্ত নরক ছাড়া আর কিছু নাই, এবং আমার খ্রীষ্টান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জেলে থাকিতে আমি বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে তিন-চারি খানি 'সিস্টার টেরেসার জীবনী' উপহার পাই। যাঁহারা বইটি পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের এই আশা ছিল, আমি যেন এই বই পড়িয়া ভগ্নী টেরেসার পথ অনুসরণ করি ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করি ও যিশুকে একমাত্র ত্রাণকর্তা মনে করি। আমি প্রার্থনাশীল হৃদয়ে ঐ বই পড়ি, কিন্তু ভগ্নী টেরেসার সাক্ষ্য আমি মানিতে পারিলাম না। আমার মন যতটা সম্ভব উদার আছে— এই বয়সে যদি অবশ্য আমার মন এই ব্যাপারে উদার আছে এ কথা বলা যায়। যাহা হউক, আমি বলিতে চাই যে এই অর্থে আমার মন উদার যে যদি পল হইবার পূর্বে সল-এর সম্মুখে যাহা

ঘটিয়াছিল আমার সম্মুখে তাহা ঘটে তবে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে আমি দ্বিধা করিব না। কিন্তু বর্তমানে আমি গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, কারণ স্পষ্টই দেখিতেছি খ্রীষ্টানরা তাঁহার উপদেশবাণীর অর্থ বিকৃত করিয়াছে। তিনি এসিয়ার লোক, নানা ভাষা নানা লোকের মধ্য দিয়া তাঁহার বাণী প্রচারিত হইয়াছে। ক্রমে যখন এই ধর্ম রোম-সম্রাটদের সমর্থন লাভ করিল, তখন ইহা রাজকীয় ধর্মে পরিণত হইল এবং এখনো তাহাই। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম আছে, যদিও তাহা খুবই কম; কিন্তু সাধারণ ধারা রাজকীয়তার দিকে। ১৩৫

আমার মন সংকীর্ণ, আমি অনেক সাহিত্য পড়ি নাই, পৃথিবীর অনেক কিছু দেখি নাই। জীবনের কয়েকটি দিকের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাহার বাহিরে আর কোনো কিছুর জন্য আমার আগ্রহ বা ঔৎসুক্য ছিল না। ১৩৬

যে-কোনো পুরুষ বা নারী যদি আমার মতো চেষ্টা করে এবং আমার মতো আশা ও বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে, তবে আমি যাহা-কিছু করিতে পারিয়াছি, তাহারাও তাহা করিতে পারিবে। ১৩৭

আমি জীবন-শিল্পী, আমি মনে করি অহিংস ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার ও মরিবার কৌশল আমার জানা আছে, কিন্তু তাহার চরম প্রমাণ দেওয়া এখনো বাকি। ১৩৮

গান্ধীবাদ বলিয়া কিছুই নাই, আর আমি চাই না আমার পরে এই নামে কিছু চলে। কোনো নূতন নীতি বা শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছি বলিয়া আমি দাবি করি না। কেবল আমার নিজের মতে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ও সমস্যায় ঐ-সব শাশ্বত নীতির প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং আমার মনুসংহিতার মতো কোনো সংহিতা রাখিয়া যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। মনুর মতো এত বড় আইনের বিধানদাতার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। আমি জীবন-সমস্যার যে-সব সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহাই শেষ কথা নয়, আমি হয়তো কালই মত পরিবর্তন করিব। জগৎকে আমার নূতন কিছু শিক্ষা দিবার নাই। সত্য আর অহিংসা পর্বতের মতো প্রাচীন। আমি শুধু যথাসম্ভব ব্যাপক ভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া চলিয়াছি। ঐরূপ করিতে গিয়া কতবার ভুল করিয়াছি, সেই ভুল হইতে শিক্ষাও লাভ করিয়াছি। আমার নিকট জীবন

ও জীবনের সমস্যাগুলি তাই সত্য ও অহিংসার পরীক্ষার ক্ষেত্র। সহজাত প্রকৃতিতেই আমি সত্যপরায়ণ, কিন্তু অহিংস নই। জনৈক জৈন মুনি সত্যই বলিয়াছিলেন যে আমি যে-পরিমাণে সত্যের পূজারী, সেই পরিমাণে অহিংসার পূজারী নই, আমি সত্যকে প্রথম স্থান দিয়া অহিংসাকে তাহার পরে স্থান দিয়াছি, কারণ, তাঁহার মতে আমি সত্যের খাতিরে অহিংসাকে ত্যাগ করিতে পারি। প্রকৃতই আমার সত্যানুসন্ধানের পথেই আমি অহিংসাকে আবিষ্কার করি। আমাদের শাস্ত্রে বলে, সত্য হইতে বড় ধর্ম নাই, কিন্তু অহিংসা তাঁহাদের মতে মানুষের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য। আমার মনে হয়, ধর্ম কথাটার প্রয়োগভেদে বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে।

আমি যাহা-কিছু বলিয়াছি তাহার মধ্যেই আমার জীবনদর্শন রহিয়াছে— যদি এত বড় একটা নাম তাহাকে দেওয়া চলে। কিন্তু তোমরা ইহাকে গান্ধীবাদ বলিয়ো না, ইহার মধ্যে কোনো মতবাদ নাই। ইহার জন্য কোনো বিশদ ব্যাখ্যাপূর্ণ সাহিত্যের বা প্রচারের প্রয়োজন নাই। আমার মতের বিরুদ্ধে অনেক বার শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সত্যকে কোনো কারণেই ত্যাগ করা চলে না এই বিশ্বাসকে আমি দৃঢ়তর ভাবে আঁকড়াইয়া রহিয়াছি। আমি যে-সব সহজ নীতির কথা বলিয়াছি তাহাতে যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারা নিজের জীবনের কার্য দিয়াই উহা প্রচার করিতে পারে। আমার চরকাকে অনেকে উপহাস করিয়াছে, একজন তীব্র সমালোচক বলিয়াছেন মৃত্যুর পর ঐ চরকার কাঠে আমার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে; অবশ্য তাহাতে আমার চরকায় বিশ্বাস বিন্দুমাত্র কমে নাই। বইয়ের লেখা দিয়া আমি কি করিয়া জগৎকে বুঝাইব যে আমার গঠন-মূলক কর্মের মূলে অহিংসার মধ্যে নিহিত? আমার জীবনই কেবল তাহার সাক্ষ্য দিতে পারে। ১৩৯

থোরো আমার শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন— তাঁহার ডিউটি অব সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স প্রবন্ধটির মধ্যে আমি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাহা করিতে-ছিলাম তাহার বৈজ্ঞানিক সমর্থন পাইয়া গেলাম। ব্রিটেন আমাকে দিয়াছে রাস্‌কিন, তাঁহার আন্‌টু দিস্‌ লাস্ট পড়িয়া রাতারাতি আমি নগরবাসী আইন-ব্যবসায়ী হইতে গ্রামবাসী হইয়া গেলাম, ডারবান ছাড়িয়া নিকটতম রেলস্টেশনের তিন মাইল দূরে এক খামারে বাস করিতে লাগিলাম। রাশিয়া দিয়াছে টলস্টয়কে, যাঁহার শিক্ষার মধ্যে আমি অহিংসার দৃঢ় ভিত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছি। আমার দক্ষিণ-আফ্রিকার আন্দোলনের শৈশবে, যখন ইহার বিপুল সম্ভাবনা আমার জানা ছিল না, তখনই টলস্টয় ইহাকে শুভকামনা ও আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে ভবিষ্যদ্‌বাণী

করিয়াছিলেন যে আমার এই আন্দোলন কালক্রমে জগতের দলিত, শোষিত জনগণের কানে আশার বাণী শুনাইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, আমার এই আন্দোলন ব্রিটেন বা পাশ্চাত্যের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব লইয়া আরম্ভ করা হয় নাই। আন্‌টু দিস্‌ লাস্ট-এর বাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া, তাহার মর্ম গ্রহণ করিয়া আমি তো আর ফ্যাসিবাদের বা নাৎসীবাদের সমর্থক হইতে পারি না— ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দমনই যে মতবাদদ্বয়ের উদ্দেশ্য। ১৪০

আমার জীবনে গোপন কিছুই নাই। আমার দোষদুর্বলতা আমি স্বীকার করিয়াছি। যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হই তাহাও স্বীকার করিবার সাহস আমার আছে। যখন নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও যৌনসম্পর্কে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিল, তখন নিজেকে বহু ভাবে পরীক্ষার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করিলাম যাহাতে আরো ভালোভাবে দেশের সেবা করিতে পারি। সেদিন হইতে আমার প্রকাশ্য জীবন-যাপন আরম্ভ হইল, আর যেদিন ব্রহ্মচর্য বরণ করিলাম সেদিনই আমরা স্বাধীন হইলাম। স্বামীর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া আমার স্ত্রী স্বাধীন হইলেন। যৌন-তৃষ্ণা, যাহা আমার স্ত্রীকে মিটাইতে হইত, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া আমিও স্বাধীন হইলাম। স্ত্রীর প্রতি যে-আকর্ষণ অনুভব করিতাম, আর কোনো নারীর প্রতি সেইরূপ আকর্ষণ আমি বোধ করি নাই। স্ত্রীর প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বস্ততা ছিল, তাহা ছাড়া মায়ের কাছে অন্য নারীর দাস বনিব না এই প্রতিজ্ঞাও ছিল। কিন্তু যেভাবে আমি ব্রহ্মচর্যের পথ গ্রহণ করিলাম তাহাতে নারীর জননীরূপই আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ব্রহ্মচর্য পালনের গোঁড়া নিয়মগুলি আমার জানা ছিল না। আমি অবস্থা বুঝিয়া নিজের নিয়ম রচনা করিতাম। আমি বিশ্বাস করি না যে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য নারী-সংস্পর্শ একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্দোষ হইলেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো সংস্রব থাকিতে পারিবে না, জোর করিয়া এই অনুশাসন প্রয়োগের মূল্য নাই। কাজের ক্ষেত্রে আমি তাই স্বাভাবিক যোগাযোগের নিষেধ রাখি নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমি অনেক ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান ভগ্নীদের বিশ্বাসভাজন ছিলাম। যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় ভগ্নীদের আমি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করিলাম, দেখিলাম আমি তাহাদেরই একজন হইয়া গিয়াছি। আমি আবিষ্কার করিলাম যে আমি বিশেষভাবে নারীজাতির সেবা করিবারই উপযুক্ত। এই প্রসঙ্গে— যাহা আমার কাছে পরম চিত্তাকর্ষক— সংক্ষেপ করিয়া বলিতে পারি, ভারতে ফিরিয়া অল্প দিনের মধ্যেই আমি ভারতীয়

নারীদের সঙ্গে এক হইয়া গেলাম। যে-রকম সহজে তাহারা আমার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিত, তাহা আমাকে অবাক করিয়া দিল। যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকায় তেমন এখানেও মুসলিম বোনেরা আমার সম্মুখে পর্দা ব্যবহার করিতেন না। আমি আশ্রমে যেখানে ঘুমাই, আমার চারি দিকে কত মেয়ে থাকে। কারণ, আমার কাছে তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভয়। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে সেবাগ্রাম আশ্রমে কোনো পর্দা নাই।

যদি কোনো নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ থাকিত তবে এই বয়সেও আমি বহু বিবাহ করিতাম, সে সাহস আমার আছে। গোপনে বা প্রকাশ্যে অবাধ প্রেম করার আমি সমর্থক নই, এইরকম অবাধ প্রেমকে আমি কুকুরের মতো জীবন-যাপন বলিয়া মনে করি। গোপন মিলনের মধ্যে আবার যথেষ্ট কাপুরুষতা থাকে। ১৪১

একজন পত্রদাতা লিখিয়াছেন, 'আপনি তো নিজের ছেলেকেও আপনার পথে টানিতে পারেন নাই, আগে নিজের ঘর সামলানো কি আপনার কর্তব্য নয়?'

কথাটা বিদ্রূপ হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহাকে সেভাবে দেখি নাই। অন্য কেহ বলিবার আগে আমার নিজের মনেই এই প্রশ্ন জাগিয়াছে। আমি জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাস করি। পূর্বজন্মের যে-সংস্কার আমরা বহন করিয়া আসিতেছি তাহাই পরিণত অবস্থায় আমাদের সকল সম্বন্ধের মধ্যে থাকে। ঈশ্বরের বিধান মানুষের দুর্বোধ্য, অফুরন্ত গবেষণার জিনিস। কেহ তাহার তল পায় না।

আমার ছেলের ব্যাপার তো আমি এইভাবে দেখি। কুপুত্রের জন্ম আমারই দুষ্কৃতির ফল, এ জন্মেরই হউক বা অন্য জন্মের হউক। আমার বড় ছেলের জন্ম হয় যখন যৌন আকর্ষণের প্রবলতায় আমি মুগ্ধ— তাহা ছাড়া তাহার জীবনারম্ভের সময় আমি নিজেকে কতটুকুই বা জানিতাম! এখনই কি আমি নিজেকে সম্পূর্ণ জানিয়াছি? বহুদিন সে আমার নিকট হইতে দূরে ছিল এবং তাহাকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আমার হাতে ছিল না। সেজন্য সর্বদাই সে ভুল পথে চলিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে তাহার চির-দিনের অভিযোগ যে আমি দশের কাজ করিতেছি এই ভ্রান্ত ধারণায় তাহার ও তাহার ভাইদের স্বার্থ বলি দিয়াছি। আমার অন্য ছেলেরাও মোটামুটি এই দোষারোপই করিয়াছে, তবে অনেক দ্বিধাসংকোচের সঙ্গে; এবং তাহারা উদারতার সঙ্গে এজন্য আমাকে ক্ষমা করিয়াছে। আমার প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো বড় ছেলেরই উপর হইয়াছে, তাই আমার জীবনের নানা অবস্থার পরিবর্তনকে সে ভুল বলিয়া মনে করে ও ক্ষমা করিতে পারে না।

সেই জন্য আমিই যে তাহাকে হারানোর কারণ তাহা আমি মানিয়া লইয়াছি ও ধৈর্যসহকারে সেই দুঃখকে বহন করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু তাহাকে যে সম্পূর্ণ হারাইয়াছি এ-কথাও ঠিক নয়, কারণ আমি প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাহার ভুল দেখাইয়া দেন, আর তাহার প্রতি কর্তব্যে আমার ত্রুটি হইয়া থাকিলে যেন আমাকে মার্জনা করেন। মানুষের স্বভাব ক্রমেই তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, আমার এই বিশ্বাস অটুট; সেজন্য আমি বিশ্বাস করি, একদিন তাহার ভুল ভাঙিবে, সে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিবে। সুতরাং সেও আমার অহিংসা-মূলক পরীক্ষার অঙ্গ। কবে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাই না— যাহা কর্তব্য বুঝিয়াছি তাহা সাধনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি না, এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ১৪২

আমাকে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রের একটি কর্তিকা পাঠাইয়াছেন; তাহাতে এই খবর আছে যে কোথায় নাকি এক মন্দির তৈয়ারি হইয়াছে, তাহাতে আমার মূর্তি স্থাপিত হইবে। আমার মতে ইহা অন্ধ পৌত্তলিকতা। ইহার দ্বারা যে-লোক মন্দিরটি তৈয়ারি করাইয়াছে তাহার টাকা অযথা নষ্ট হইবে, যে-সব গ্রামবাসী মন্দিরে যায় তাহাদের ভুল পথে চালানো হইবে, পূজা-উপাসনার যে-অর্থ আমি করিয়াছি তাহাকে বিকৃত করিয়া আমাকে অপমানিত করা হইবে। জীবিকার জন্য চরকা কাটা বা স্বরাজ আনিবার জন্য সুতা কাটা, চরকার উপাসনা। তোতার মতো না বুঝিয়া আবৃত্তি করিলে গীতার উপাসনা হয় না, জীবনে সেই মতো চলিতে হয়। উপদেশ কাজে পরিণত করার জন্য যতটা প্রয়োজন আবৃত্তির ততটাই মূল্য। মানুষের শক্তির জন্য তাহাকে যতটা অনুসরণ করিবে ততটাই তাহার পূজা, তাহার দুর্বলতার জন্য নয়। কোনো জীবিত প্রাণীর মূর্তি গড়িয়া তাহার পূজা করিলে হিন্দুধর্মের অবমাননা করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত কোনো মানুষকে ভালো বলা যায় না। মৃত্যুর পরে তাহার উপর আরোপিত গুণাবলীতে যাহার আস্থা হয় একমাত্র তাহার কাছেই সে-মানুষ ভালো। সত্য বলিতে কি, কেবল ঈশ্বরই মানুষের মন জানেন। সেই জন্য জীবিত বা মৃত কোনো মানুষের পূজা না করিয়া একমাত্র ঈশ্বর, যিনি পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ, তাঁহার পূজা করাই ভালো। তখন প্রশ্ন উঠে, ফোটো রাখাও কি এক রকম পূজা করা নয়? আমি অনেকবার সে-কথাও বলিয়াছি। তবু আমি তাহা মানিয়া লইয়াছি, কারণ এটা তো আজকাল ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্দোষ ফ্যাশান হইলেও ইহা বেশ ব্যয়সাধ্য। কিন্তু আমার এই মানিয়া লওয়ার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ফ্যাশান

সামান্যতম সমর্থন লাভ করিলেও তাহা হাস্যকর ও ক্ষতিকর হইবে। আমি আনন্দে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিব যদি আমার মূর্তি সরাইয়া ফেলিয়া ঐ মন্দিরে চরকা-কেন্দ্র খোলা হয় যেখানে দরিদ্র জীবিকার জন্য, অপরে ব্রত-জ্ঞানে, সুতা কাটিবে, তুলার পাজ করিবে এবং সকলে খদ্দর পরিধান করিবে। তাহাতেই গীতার উপদেশ কাজে পরিণত করা হইবে এবং তাহাই হইবে গীতার এবং আমার সত্যকার ভজনা। ১৪৩

আমার সফলতা ও সদ্‌গুণগুলির মতো আমার অপূর্ণতা ও ব্যর্থতাও ঈশ্বরের আশীর্বাদ, আমি দুই-ই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। আমার মতো অযোগ্যকে কেন তিনি এই মহতী পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করিলেন? বিশেষ উদ্দেশ্যেই তিনি ইহা করিয়াছেন। তাঁহাকে যে দরিদ্র, মূক ও অজ্ঞ জনসাধারণের হিতসাধন করিতে হইবে। অতি মহৎ লোককে দেখিয়া তো তাহাদের হতাশা জন্মিবে। যখন দেখিবে তাহাদেরই মতো দোষ-দুর্বলতাময় একজন অহিংসার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তখন নিজেদের শক্তির উপর তাহাদের আস্থা জন্মিবে। একজন পূর্ণতা প্রাপ্ত লোক যদি আমাদের নেতা হইয়া আসেন, তাঁহাকে হয়তো আমরা স্বীকৃতি দিতে পারিতাম না, হয়তো তাঁহাকে গুহার অন্তরালে আশ্রয় লইতে হইত। আমাকে অনুসরণ যিনি করিবেন তিনি হয়তো আমার অপেক্ষা পূর্ণতর হইবেন এবং তাঁহার উপদেশ-বাণী তোমরা গ্রহণ করিতে পারিবে। ১৪৪

একটি এটম বোমা হিরোশিমাকে জগৎ হইতে মুছিয়া দিয়াছে শুনিয়া আমার একটি মাংসপেশীও নড়ে নাই— বরং আমি মনে মনে বলিলাম, আজও যদি মানুষ অহিংসার পথ গ্রহণ না করে তবে সমগ্র মানবজাতির আত্মঘাতী হওয়া অনিবার্য। ১৪৫

সমস্ত জগতের দুষ্কৃতির বিচারের ভার আমার উপর নয়— আমি বিচার করিতে বসি না, তবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকি কখন তাহাদের ভুল বুঝাইতে পারিব। আমি নিজেও দোষেগুণে মানুষ, আমারও তো ক্ষমার, উদারতার প্রয়োজন আছে। ১৪৬

যখন পাপ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে, যখন অবিনীত উদ্ধত কোনো চিন্তা মুহূর্তের জন্যও আমার মনে আসিবে না, তখনই কেবল আমার অহিংসার কথা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিবে, তাহার আগে নয়। ১৪৭

ঈশ্বরে যে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে ভালোমন্দ, সফলতা-বিফলতা সবই তাঁহার চরণে সঁপিয়া দিবে, নিজের কিছুর জন্যই আর ভাবনা করা চলিবে না। আমি বেশ বুঝিতে পারি, আমি এখনো সেই স্তরে উঠিতে পারি নাই; সেইজন্য আমার সাধনা এখনো অপূর্ণ। ১৪৮

মানুষের জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন তাঁহার চিন্তাধারা বাহিরের আচরণে দূরে থাক, বাক্যেও প্রকাশ করিতে হয় না, কেবল চিন্তাতেই কাজ হয়। তিনি তখন সেই শক্তি অর্জন করেন। তখন তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় যে আপাতনিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই তাঁহার শক্তি কাজ করিতেছে। আর সেই পথেই আমার প্রয়াস। ১৪৯

পৃথিবীর নানা দেশ হইতে আমাকে একটি প্রশ্ন করা হইয়াছে— আমি এখানে তাহার উত্তর দিতে চাই। প্রশ্নটি হইল এই : 'আপনার নিজের দেশে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দলগত স্বার্থ সাধনের জন্য ক্রমেই যে হানাহানি সুরু হইয়াছে, তাহার জবাবে আপনি কি বলিবেন? এই কি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য অহিংস সংগ্রামের পরিণতি? ইহার পরেও জগতের কাছে আপনার অহিংসার বাণীর কোনো তাৎপর্য থাকে কি?' পত্রপ্রেরকদের প্রশ্নের সারমর্ম আমি নিজের কথায় বলিলাম।

জবাবে, আমার দৈন্য স্বীকার করি, কিন্তু তাহা অহিংসার দৈন্য নয়। আমি আগেই বলিয়াছি, গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে অহিংসার সংগ্রাম হইয়াছে তাহা দুর্বলের অহিংসা। উত্তরটা সন্তোষজনক কি না তাহা বিচারের ভার অন্যের উপর। এ-কথাও মানিতে হইবে যে আজিকার অবস্থায় এই অহিংসার কথা খাটিবে না। শক্তিমানের অহিংসা যে কী বস্তু তাহার কোনো অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর নাই; অতএব শক্তিমানের অহিংসা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, এ-কথা বলার সার্থকতা নাই। সত্যকে অবিরত ব্যাপক-ভাবে যাচাই করিতে হয়। আমি এখন সাধ্যমত তাহারই চেষ্টা করিতেছি। আমার সাধ্যের সীমা যদি নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় তবে আমি হয়তো ভুলের স্বর্গে বাস করিতেছি। তবে কেন এই বৃথা অনুসন্ধানে আমার পথে চলার জন্য লোককে আহ্বান করিতেছি? যুক্তিসংগত সব প্রশ্ন, আমার উত্তরও সহজ। আমার পথে চলো, এ-কথা আমি কাহাকেও বলি না, প্রত্যেকে নিজের বিবেকের বাণী অনুসরণ করিবে। সেই বাণী শুনিবার কান যাহার নাই সে যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু কখনো মূঢ় মেষের মতো অন্ধ অনুকরণ করিবে না।

আর-একটি প্রশ্ন বহুবার করা হইয়াছে, এখনো করা হয় : 'আপনি যদি নিশ্চিত জানেন ভারত ভুল পথে চলিতেছে, তবে সেই বিপথগামীদের সংস্পর্শ ছাড়েন না কেন? আপনার পূর্বতন বন্ধুরা আর কর্মসহচরেরা একদিন আপনার পথে আসিবেই এই বিশ্বাসে আপনি একলা নিজের পথে চলেন না কেন?' কথাটি সংগত। ইহার উত্তরে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে আমার বিশ্বাস আজও পূর্বের মতোই অটুট। আমার প্রয়োগ-নীতিতে ভুল থাকা অসম্ভব নয়; এইরকম জটিলতার মধ্যে পথ দেখাইবার পূর্ব-অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নজিরেরও অভাব নাই। কিন্তু যন্ত্রের মতো কাজ করিলে চলিবে না। সুতরাং শুভানুধ্যায়ীদের আমি শুধু বলিতে পারি, তাঁহারা ধৈর্য ধরিয়া আমার কথায় বিশ্বাস করুন যে অহিংসার সংকীর্ণ অথচ সরল পথে চলা ছাড়া এই আর্তপীড়িত পৃথিবীর পরিত্রাণের কোনো আশা নাই। আমার মতো কোটি কোটি লোক হয়তো নিজেদের জীবনে এই সত্যের প্রমাণ করিতে পারিবে না কিন্তু তাহাতে তাহাদেরই ব্যর্থতা, শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। ১৫০

আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত ভাগ হইল। আমি দুঃখ পাইলাম। কিন্তু যেভাবে এই ভাগ হইল তাহাই আমাকে অধিকতর দুঃখ দিয়াছে। বর্তমানে যে-আগুন জ্বলিয়াছে, আমার সর্ব শক্তি দিয়া তাহা নিভাইব, এই আমার পণ। একই ঈশ্বর সকল মানুষের অন্তরে বাস করেন, সেজন্য আমি যেমন আমার স্বদেশবাসীকে ভালোবাসি তেমন ভাবেই সকল মানুষকে ভালো-বাসি। মানবজাতির সেবার মধ্য দিয়াই আমি জীবনের পরম শ্রেয়কে লাভ করিতে চাই। এ-কথা সত্য, আমরা যে-অহিংসা প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তাহা দুর্বলের অহিংসা, অর্থাৎ তাহাকে অহিংসাই বলা চলে না। কিন্তু আমাকে বলিতেই হইবে যে দেশের লোককে আমি ঠিক এইভাবে নির্দেশ দিই নাই। তাহারা দুর্বল, তাহাদের হাতে অস্ত্র নাই, যুদ্ধবিদ্যা জানা নাই— সেই কারণে অহিংসা-নীতি তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরি নাই। তাহা করিয়াছি এই কারণে যে ইতিহাস আমাকে শিক্ষা দিয়াছে যে যত ভালো উদ্দেশ্যেই হউক, দ্বেষ হিংসা কেবল প্রবলতর হিংসাদ্বেষেরই জন্ম দেয় ও শান্তির পথ বিঘ্নিত করিয়া তোলে। প্রাচীন মুনিঋষিদের ঐতিহ্যে আমরা ধন্য— ভারতবর্ষের যদি জগৎকে বিতরণ করিবার মতো কোনো সম্পদ থাকে তবে তাহা এই ক্ষমা আর বিশ্বাসের পরম উত্তরাধিকার। আমি বিশ্বাস করি, এমন দিন আসিবে যখন আণবিক বোমা আবিষ্কারের ফলে মানুষ পৃথিবীতে যে-ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে তাহার প্রতিরোধের শক্তি ভারতেরই হাতে থাকিবে। প্রেম আর সত্যের শক্তি অপরাজেয়; কিন্তু

আমাদের অহিংসার সাধকদের কিছু দোষ আছে, আর সেই দোষেই আমাদের এই আত্মঘাতী সংগ্রাম। আমি তাই নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। ১৫১

আমার জীবনে অনেক পরীক্ষা আসিয়াছে, কিন্তু এই পরীক্ষাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কঠিন হইবে। আমি মনে করি, ভালোই হইল। আমি দেখি, সংগ্রাম যত প্রবল হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ ততই নিকটতর হয় এবং তাঁহার অসীম করুণায় আমার বিশ্বাস বাড়িয়া চলে। এই অবস্থা যতদিন থাকিবে, আমার সব ঠিক আছে। ১৫২

আমি যদি পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতাম, তবে প্রতিবেশীর দুঃখে এত বিচলিত হইতাম না। আমি তাঁহাদের দুঃখদুর্দশা দেখিয়া প্রতিবিধানের উপায় বলিয়া দিতাম এবং আমার ভিতরের অনতিক্রম্য সত্যের বলে তাহারা ঐ বিধান মানিয়া লইত। কিন্তু এখন তো আমি ঘষা কাচের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট ভাবে দেখিতেছি, তাই সব জিনিস ধীরে ধীরে কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হয়, তাহাও আবার সব সময় সফল হয় না। ভারতের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর দুর্দশার কথা জানিয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকার সম্ভব ইহা বুঝিয়াও, যদি আমি তাহাদের হইয়া তাহাদের জন্য দুঃখানুভব না করি তবে আমার মনুষ্যত্ব খর্ব হইবে। ১৫৩

আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে চাই যে কাহারও বন্ধুত্ব বা ভালোবাসা হারাইবার ভয়ে বা কাহারও বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হারাইবার আশঙ্কায়, আমি অন্তরের সেই সত্য— যাহাকে বলি বিবেক— তাহার বাণী অমান্য করিব না। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো বন্ধুর শ্রদ্ধা হয়তো হারাইয়াছি, তাহা মাথা পাতিয়া লইলাম। আমার বেদনার কথা উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিবার জন্য অন্তরের ভিতর হইতে কি একটা যেন জোর তাগিদ দিতেছে। ইহা কি তাহা আমি জানি। আমার বিবেক, যাহা আমাকে কখনো প্রতারণা করে না, সে এখন বলিতেছে : যদি সম্পূর্ণ একা চলিতে হয় তবু তোমাকে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। জগতের রক্তচক্ষুর দৃষ্টিও তোমাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। ভয় করিয়ো না। শোনো, অন্তরবাসী সেই ক্ষুদ্র স্বরটি কি বলিতেছে— 'ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র সব ছাড়ো, তবু যে-আদর্শের জন্য তোমার বাঁচিয়া থাকা, যে-আদর্শের জন্য তুমি মরিতে প্রস্তুত, তাহার সাক্ষ্য দাও।' ১৫৪

প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া যদি একটিও অন্যায় অবিচার, একটিও দুর্দশার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি, তাহাতে আমার চিত্তের সন্তোষ হইতে পারে না। আমার মতো ক্ষীণ দুর্বলের পক্ষে সব অন্যায়ের সংশোধন করা বা সব-কিছুর জন্য নিজেকে দায়ী করা সম্ভব নয়, আবার আমার দায়িত্ব নাই বলিয়া সরিয়া থাকাও সম্ভব নয়। মন এক দিকে টানে, আর দেহবুদ্ধি তাহার বিপরীত দিকে টানে। এই দুইয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই মুক্তি পাইতে হইলে অতি ধীরে ধীরে কঠিন পদক্ষেপে চলিতে হয়। যন্ত্রের মতো নিষ্ক্রিয় থাকিব— আমি ইহা চাই না, নিরাসক্ত থাকিয়া বুদ্ধির আলোকে কাজ করিয়াই আমি মুক্তি চাই। ইহার জন্য প্রতিদিন অবিরত দেহকে পরীক্ষার মধ্যে বিশুদ্ধ করিয়া দেহাতীত আত্মার পূর্ণ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। ১৫৫

সকল ধর্মগুরুর সত্য বাণীতেই আমি বিশ্বাস করি। আমি প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করি যেন আমার অপপ্রচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর আমার একটুও ক্রোধের সঞ্চার না হয়। যদি আততায়ীর গুলিতে আমার মৃত্যু হয় তখনো যেন মুখে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমি তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করি। সেই শেষের মুহূর্তে যদি একটি ক্রোধের বা তিরস্কারের কথা আমার মুখ হইতে বাহির হয়, লোকে যেন আমাকে ভণ্ড প্রতারক বলিয়া জানে। ১৫৬

প্রকৃত সাহসীর অহিংসা কি আমার আছে? আমার মৃত্যুই সে-কথা প্রমাণ করিবে। যদি আমি কাহারও হাতে নিহত হই এবং মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মনের মন্দিরে তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করি, এবং আততায়ীর জন্য প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করিতে পারি, তবেই না বলা যাইবে যে আমার অহিংসা সাহসীর অহিংসা ছিল। ১৫৭

বোধশক্তিগুলি পক্ষাঘাতে একটু একটু করিয়া অবশ হইয়া আসিবে, আমাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এমন মরণ আমি মরিতে চাহি না। আততায়ীর গুলিতে আমার প্রাণ যাইতে পারে, আমি আনন্দে তাহা বরণ করিব। কিন্তু আমি চাই কাজ করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিব, জীবনের অবসান হইবে। ১৫৮

আমি শহিদ হইবার জন্য ব্যগ্র নই, কিন্তু নিজের বিশ্বাসকে রক্ষা করিবার

জন্য যাহা জীবনের পরম কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহার পালনে যদি প্রাণ দিতেই হয় তবে তাহা শহিদের আত্মোৎসর্গই হইবে। ১৫৯

ইহার পূর্বেও আমার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং আততায়ী পরে অনুতপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দুর্বৃত্ত মনে করিয়া কেহ যদি আমাকে বধ করে, তবে যে-গান্ধীকে সে দুর্বৃত্ত মনে করিয়াছে তাহাকেই বধ করিবে, প্রকৃত গান্ধীকে বধ করা হইবে না। ১৬০

আমি যদি দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া, অথবা সামান্য ফোঁড়া বা ফুসকুড়ি হইয়াও মারা যাই, তাহা হইলে তোমাদের কর্তব্য হইবে— যদিও তাহাতে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারে— এই কথা ঘোষণা করা যে, আমি নিজেকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলিয়া যে-দাবি করি তাহা ঠিক নহে। ইহাতেই আমার আত্মার শান্তি হইবে। আরো শুনিয়া রাখো— সেদিন যেমন চেষ্টা হইয়াছিল সেইরকম যদি কেহ আমাকে গুলি করিয়া মারে আর তখন যদি একটিও কাতরোক্তি না করিয়া মুখে ঈশ্বরের নাম লইয়া প্রাণ ত্যাগ করি, তবেই আমার সকল দাবি জীবন দিয়া স্বীকার করা হইবে।১ ১৬১

মৃত্যুর পর আমার শবদেহ যদি শোকযাত্রার মিছিল করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, মৃতের যদি কথা বলিবার শক্তি থাকে তবে মিছিলকারীদের আমি বলিব, আমাকে অব্যাহতি দাও, যেখানে আমার দেহান্ত হইয়াছে সেইখানেই দাহকৃত্য করো। ১৬২

আমার মৃত্যুর পর তোমাদের একজন কেহই আমার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিবে না। কিন্তু তোমাদের অনেকের মধ্যে আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থাকিবে। যদি উদ্দেশ্যকে প্রধান স্থান দিয়া, নিজের কথা ভুলিয়া প্রত্যেকেই চেষ্টা করে, তবে শূন্য স্থান অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইবে। ১৬৩

আমি পুনর্জন্ম চাহি না। কিন্তু যদি আবার জন্মিতেই হয় তবে যেন অস্পৃশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করি, যাহাতে তাহাদের দুঃখ কষ্ট অপমান নির্যাতনের ভাগীদার হইয়া নিজের ও তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে পারি। ১৬৪

---

১ ১৯৪৮ অব্দের ২৯ জানুয়ারি রাত্রিতে, মৃত্যুর কুড়ি ঘণ্টা মাত্র পূর্বে, কথিত।

সত্য ও ধর্ম

ধর্ম বলিতে আমি তাত্ত্বিক ধর্ম বুঝি না, কুলক্রমাগত ধর্মও বুঝি না, বুঝি সেই ধর্ম যাহা সকল ধর্মের মূলে আছে, যাহা আমাদের সৃষ্টি-কর্তাকে প্রত্যক্ষ করায়। ১

ধর্ম বলিতে আমি কি বলি তাহা ব্যাখ্যা করা যাক। ইহা সেই হিন্দুধর্ম নহে যাহাকে আমি অন্যান্য ধর্মের উপরে আসন দিই; ইহা এমন এক ধর্ম যাহা হিন্দুধর্মকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে, যাহা মানুষের প্রকৃতিরই পরিবর্তন করায়, যাহা অন্তর্নিহিত সত্যের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত করে, যাহা সর্বদা শুদ্ধ করে। ইহা মানবপ্রকৃতির সেই চিরন্তন বস্তু, যাহার পূর্ণ প্রকাশের জন্য সে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, যাহা নিজেকে খুঁজিয়া না পাওয়া পর্যন্ত এবং স্রষ্টাকে জানিয়া নিজের ও স্রষ্টার মধ্যে মিল কোথায় তাহা না জানা পর্যন্ত, মানুষের আত্মাকে একেবারে অস্থির করিয়া রাখে। ২

আমি তাঁহাকে দেখিও নাই, তাঁহাকে জানিও না। ভগবানে জগতের বিশ্বাসকে আমি আপনার করিয়া লইয়াছি। আমার বিশ্বাস মুছিয়া ফেলার নয়, তাই আমি সেই বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতার পর্যায়ে ফেলিয়াছি। যাহাই হউক, ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মোপলব্ধি বলিয়া বর্ণনা করিলে সত্যের খানিকটা অপলাপ হইল বলা যাইতে পারে; তাই যদি বলি ভগবানে আমার যে-বিশ্বাস তাহা বর্ণনা করিবার উপযোগী কোনো ভাষা আমার নাই তাহা হইলেই যথার্থ বলা হইবে। ৩

সকল বস্তুর মধ্যে সর্বতোব্যাপ্ত এক অনির্বচনীয় ও দুর্জ্ঞেয় শক্তি আছে। আমি তাহা চোখে দেখি না, কিন্তু অনুভব করি। এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অনুভব করি, কিন্তু কোনো প্রমাণ দিতে পারি না, কারণ আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া যাহা-কিছু দেখি সে-সকলের সঙ্গে ইহার মোটেই মিল নাই। ইহা অতীন্দ্রিয়। কিন্তু যুক্তির সাহায্যে ভগবানের অস্তিত্ব কিছু পরিমাণে বোঝা সম্ভব। ৪

আমি অবশ্য ক্ষীণালোকে দেখিতে পাই যে আমার চার দিকে সকল বস্তু যখন সতত পরিবর্তনশীল, সতত মরণশীল, তখনো সকল পরিবর্তনের

মূলে এমন এক জীবন্ত শক্তি আছে যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা সকলকে ধারণ করে, যাহা সৃষ্টি করে, লয় করে, পুনরায় সৃষ্টি করে। এই প্রাণ-দায়ী শক্তি বা আত্মাই ভগবান। আর আমি শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা-কিছু দেখি তাহা যখন স্থায়ী হইতে পারে না বা হইবে না, তখন তিনিই একমাত্র স্থায়ী। ৫

আর এই শক্তি শুভকর, কি অশুভকর? আমি ইহাকে কেবল শুভকর বলিয়াই দেখি। কারণ আমি দেখিতে পাই যে মরণের মধ্যে জীবন থাকিয়া যায়, অসত্যের মধ্যে সত্য থাকিয়া যায়, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি থাকিয়া যায়। তাই বুঝিতে পারি, ভগবানই জীবন, সত্য ও জ্যোতিস্বরূপ। তিনি প্রেম, তিনিই পরমেশ্বর। ৬

আমি এ-কথাও জানি যে জীবন পণ করিয়া যদি অশুভের সহিত সংগ্রাম না করি, তাহা হইলে কখনো ভগবানকে জানিতে পারিব না। আমার নিজের দীন ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা আমার সে-বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমি যতই শুদ্ধ হইতে চেষ্টা করি ততই ভগবানের কাছে পৌঁছিয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার বিশ্বাস যখন আজিকার মতো নিছক উপলক্ষমাত্র হইবে না, যখন আমার বিশ্বাস হিমালয়ের মতো অটল ও হিমালয়-শিখরে তুষারের মতো শুভ্র ও উজ্জ্বল হইবে, তখন আমি তাঁহার কত নিকটে গিয়া পৌঁছিব! ৭

ভগবানে এই বিশ্বাসের মূলে ধর্মবিশ্বাস থাকা চাই, যাহা যুক্তিকে ছাড়াইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, তথাকথিত উপলব্ধির মূলেও একটা ধর্মবিশ্বাস আছে, নহিলে ইহা বজায় থাকিতে পারে না। স্বভাবক্রমে এমনই তো হইবে। জীবনের সীমা কে ছাড়াইয়া যাইতে পারে? এই দেহে সম্পূর্ণ ঈশ্বর-উপলব্ধি অসম্ভব বলিয়াই আমার ধারণা। আর তাহার প্রয়োজনও নাই। মানুষের পক্ষে যে-পূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব সেখানে পৌঁছাইতে হইলে জীবন্ত অটল ধর্মবিশ্বাস চাই। আমাদের এই পার্থিব আচরণের বাহিরে ভগবান নাই। সুতরাং বাহিরের প্রমাণের যদি কিছু মূল্য থাকিয়াও থাকে, তাহা বিশেষ কাজে আসে না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহাকে দেখা সর্বথা অসম্ভব, কারণ তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত। যদি আমরা শুধু ইন্দ্রিয়গুলি হইতে নিজেদের গুটাইয়া আনিতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করি। আমাদের ভিতরে অবিরাম ভাগবত সংগীতধ্বনি উঠিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রবল অভিঘাতে সেই সুকুমার সংগীত ডুবিয়া

যায়। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা-কিছু দেখি বা শুনি তাহা অপেক্ষা ইহা অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ এবং উভয়ের মধ্যে কোনো মিল নাই। ৮

কিন্তু যে-ঈশ্বর শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে তৃপ্ত করেন— যদি কখনো তাহা করেন— তিনি ঈশ্বরই নহেন। ঈশ্বর যদি ঈশ্বরই হন তবে হৃদয়ের উপর তাঁহার শাসন থাকা চাই, হৃদয়ের রূপান্তর করা চাই। তাঁহার সাধকের সামান্যতম কর্মেও তাঁহার আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যতটা সম্ভব তাহার অপেক্ষাও বাস্তব ও সুস্পষ্ট উপলব্ধির দ্বারাই তাহা হইতে পারে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আমাদের নিকট যতই প্রকৃত মনে হউক না কেন, তাহা মিথ্যা ও অলীক হইতে পারে, এবং প্রায়ই হয়। ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যে উপলব্ধি তাহা অভ্রান্ত। যাঁহারা অন্তরে ভগবানের প্রকৃত অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন তাঁহাদের রূপান্তরিত চরিত্র ও আচরণে তাহার প্রমাণ, বাহিরের সাক্ষ্যে নয়। সকল দেশে, পৃথিবীর সর্বত্র ঋষি ও সাধকদের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরার অভিজ্ঞতায় ইহার প্রমাণ মিলিবে। এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিলে নিজেকেই অস্বীকার করা হইবে। ৯

আমার নিকটে ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। ঈশ্বরই সুনীতি ও সদাচারের আধার।' তিনি অভয়। তিনিই আলোক ও জীবনের নিদান, এবং এ-সকলের ঊর্ধ্বে ও ইহাদের ধরা-ছোঁয়ার অতীত। ভগবানই বিবেক। নাস্তিকের নাস্তিক্যবুদ্ধিও তিনিই।... তিনি বাক্য ও যুক্তির অতীত।... যাহারা ভগবানকে সাকার মূর্তিতে দেখিতে চায় তাহাদের নিকটে তিনি সাকার ঈশ্বর। যাহারা তাঁহার স্পর্শ চায় তাহাদের নিকট তিনি দেহধারী ঈশ্বর। তিনি শুদ্ধতম উপাদান। যাহাদের বিশ্বাস আছে তাহাদের নিকট তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। তিনিই মানুষের যাহা-কিছু সব। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, যুগপৎ আমাদের ঊর্ধ্বে আছেন, আমাদের ছাপাইয়া আছেন।... তিনি বহু কাল ধরিয়া সহ্য করেন। তিনি সহিষ্ণু, কিন্তু তিনি ভীষণও।... তাঁহার নিকটে অজ্ঞতার মার্জনা নাই। অথচ তিনি সতত ক্ষমাশীল, কারণ তিনি সর্বদাই আমাদিগকে অনুতাপ করিবার সুযোগ দেন। জগতের জ্ঞানমতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক, কারণ ভালোমন্দের মধ্যে বাছিয়া লইবার পথ তিনি আমাদের জন্য মুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার মতো স্বেচ্ছাচারী কেহ নাই, কারণ তিনি প্রায়ই আমাদের মুখ হইতে পানপাত্র লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলেন, এবং স্বাধীন ইচ্ছার আচরণে আমাদের পথ এত বেশি সংকীর্ণ করিয়া রাখেন যে তাহাতে শুধু তাঁহার কৌতুকেরই সৃষ্টি হয়।... সুতরাং হিন্দুধর্মে এ-সকলকে তাঁহারই লীলা বলা হয়। ১০

বিশ্বজনীন সর্বব্যাপী সত্যস্বরূপকে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার করিতে হইলে হীনতম প্রাণীকেও নিজের মতো করিয়া ভালোবাসিতে হইবে। যে-ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা এই দিকে, জীবনের কোনো ক্ষেত্র হইতেই তাহার সরিয়া থাকিলে চলিবে না। এজন্যই আমার সত্যানুরাগ আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছে; এবং আমি একটুও ইতস্তত না করিয়া দৈন্য সহকারেই বলিব যে যাহারা বলে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংস্রব নাই, তাহারা ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা জানে না। ১১

আত্মশুদ্ধি না হইলে সকল জীবিত প্রাণীর সঙ্গে একাত্মতাবোধ অসম্ভব; আত্মশুদ্ধি না হইলে অহিংসাধর্ম প্রতিপালন মিথ্যা স্বপ্ন হইয়াই রহিবে; যাহার হৃদয় পবিত্র নয় সে কখনো ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সুতরাং আত্মশুদ্ধির অর্থ হইল জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধি। শুদ্ধি বিশেষভাবে সংক্রামক, আত্মশুদ্ধির ফলে পারিপার্শ্বিকের শুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ১২

কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ কঠিন, বড়ই খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ণ শুদ্ধি লাভ করিতে হইলে মানুষকে চিন্তায়, ভাষায়, কর্মে একেবারে রাগদ্বেষ-বিমুক্ত হইতে হইবে; ভালোবাসা ও ঘৃণা, আসক্তি ও বিকর্ষণ, এই-সকল বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্বের উপরে উঠিতে হইবে। আমি জানি, অবিরাম সর্বক্ষণ চেষ্টা করিয়াও আমি এ-পর্যন্ত ঐ ত্রিবিধ শুদ্ধি আনিতে পারি নাই। তাই জগতের প্রশংসায় আমি বিচলিত হই না, বরং প্রায়ই তাহা আমাকে দংশন করে। অস্ত্রের সাহায্যে ভৌতিক জগৎ জয় করা অপেক্ষা সূক্ষ্ম রিপু জয় করা আমার নিকটে অনেক কঠিন বলিয়া মনে হয়। ১৩

আমি সামান্য একটি আত্মা— সকল রকমে ভালো হইবার জন্য, বাক্যে চিন্তায় কর্মে সম্পূর্ণ সত্যপরায়ণ, সম্পূর্ণ অহিংস হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু যে-আদর্শকে আমি সত্য বলিয়া জানি সেই আদর্শে পৌঁছাইতে সর্বদাই অশক্ত হইতেছি। এই ঊর্ধ্বগতি খুবই ক্লেশকর, কিন্তু ইহার ক্লেশ আমার নিকটে ধ্রুব আনন্দ। উচ্চগতির প্রতিটি পদ-ক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের শক্তি বাড়িল বলিয়া অনুভব করি, নিজেকে পরবর্তী পদক্ষেপের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি। ১৪

মানবের সেবার মধ্য দিয়া আমি ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছি, কারণ

আমি জানি যে ভগবান স্বর্গেও নাই, পাতালেও নাই, প্রত্যেকের মধ্যে আছেন। ১৫

ধর্মকে আমাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে ব্যাপ্ত করা চাই। এখানে ধর্ম অর্থে সাম্প্রদায়িকতা নয়। ধর্ম অর্থে বুঝিতে হইবে, বিশ্বের সুশৃঙ্খল নৈতিক অনুশাসনে বিশ্বাস। ইহা চোখে দেখা যায় না বলিয়া কম বাস্তব নহে। ইহা হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম, ইত্যাদি ছাপাইয়া যায়। অথচ তাহাদের স্থানচ্যুত করে না; সকল ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বাস্তব রূপ প্রদান করে। ১৬

বিভিন্ন ধর্ম হইল বিভিন্ন পথ, একই বিন্দুতে গিয়া মিলিয়াছে। যদি একই উদ্দেশ্যে একই গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করিলে কি আসে যায়? প্রকৃত কথা তো এই, যত লোক, তত ধর্ম। ১৭

মানুষ যদি তাহার নিজের ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করে, তবে সে অন্যান্য ধর্মের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়াছে। ১৮

যতক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থাকিবে, ততক্ষণ তাহাদের প্রত্যেকটিরই বিশেষ বিশেষ প্রতীকের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু প্রতীক যখন সর্বস্ব হইয়া উঠে এবং এক ধর্ম যে অন্য ধর্মের চেয়ে বড় তাহা প্রমাণ করিবার যন্ত্র হিসাবে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহা নিতান্তই বর্জনীয়। ১৯

দীর্ঘকালের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যে (১) সকল ধর্মই সত্য; (২) সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু-না-কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে; (৩) সকল ধর্মই আমার কাছে প্রায় আমার নিজের হিন্দুধর্মের মতোই প্রিয়, যেমন সকল মানুষই আমাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনের মতো প্রিয় হওয়া উচিত। আমার নিজের ধর্মবিশ্বাস যেমন অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসও সেইরূপ শ্রদ্ধার বস্তু; সুতরাং ধর্মান্তর গ্রহণের চিন্তা উঠিতেই পারে না। ২০

ভগবান বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন তিনি বিভিন্ন পূজারীরও সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি গোপনেও কি করিয়া এই চিন্তাকে মনে স্থান দিই যে আমার প্রতিবেশীর ধর্ম আমার ধর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং

এই ইচ্ছা করিতে পারি যে সে তাহার ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া আমার ধর্ম গ্রহণ করুক? প্রকৃত বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে আমি শুধু ইহাই কামনা ও প্রার্থনা করিতে পারি যে সে তাহার নিজের ধর্মে থাকিয়া পূর্ণতা লাভ করুক। ভগবানের গৃহে অনেক প্রকোষ্ঠ আছে, তাহাদের সবগুলিই সমান পবিত্র। ২১

ভক্তিপূর্বক অন্যধর্মের অধ্যয়নে স্বধর্মে বিশ্বাস দুর্বল হইতে পারে বা টলিতে পারে, এ আশঙ্কা কেহ যেন মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান না দেন। হিন্দুদর্শন মনে করে, সকল ধর্মের মধ্যেই সত্যের উপাদান আছে, এবং তাহা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির ভাব পোষণ করিতে নির্দেশ দেয়। অবশ্য বুঝিতে হইবে, ইহার মূলে আছে স্বধর্মে শ্রদ্ধা। অন্যান্য ধর্মের অধ্যয়ন ও সমাদর করিলে সেই শ্রদ্ধা দুর্বল হইবে, এমন কথা নাই; বরং অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও তাহা প্রসারিত হইবে ইহাই আশা করা যায়। ২২

মুখের কথা নয়, আমাদের জীবনই যেন আমাদের পরিচয় দেয়। ভগবান ১৯০০ বৎসর পূর্বেই শুধু ক্রুশ ধারণ করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি আজও তাহা ধারণ করেন; এবং প্রতিদিন তাঁহার মৃত্যু, প্রতিদিন তাঁহার পুনর্জীবন লাভ হয়। যে ঐতিহাসিক ঈশ্বর দুই হাজার বৎসর পূর্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, শুধু জগৎকে যদি তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে তাহাতে জগতের সামান্যই সান্ত্বনা। সুতরাং ঐতিহাসিক ঈশ্বরের কথা প্রচার করিয়ো না, তোমাদের মধ্যে যিনি বাঁচিয়া আছেন, সেই ঈশ্বরকে দেখাও। ২৩

যাঁহারা নিজেদের ধর্মের কথাই বলে, বিশেষ করিয়া অন্য লোককে স্বধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই, তাহাদের উপর আমার কোনো আস্থা নাই। ধর্ম-বিশ্বাস মুখের কথার অপেক্ষা রাখে না। জীবন দিয়া তাহা প্রস্ফুটিত করা চাই, আর তাহা হইলে সে-বিশ্বাস স্বয়ংক্রিয় হইয়া ওঠে, নিজেই নিজেকে প্রচার করে। ২৪

ভাগবত জ্ঞান বই হইতে ধার-করা বিদ্যা নয়। নিজের মধ্যে তাহা অনুভব করা চাই। শাস্ত্র বড়জোর সাহায্য করিতে পারে, প্রায়ই এমন হয় যে শাস্ত্র বাধা হইয়াও দাঁড়ায়। ২৫

জগতের সকল প্রধান ধর্মের মৌলিক সত্যে আমি বিশ্বাস করি। আমি

বিশ্বাস করি সেগুলি সবই ভগবানের দান, আমি বিশ্বাস করি যাহাদের নিকট ঐ-সকল ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে উহারা প্রয়োজনীয় ছিল। আমি আরও বিশ্বাস করি যে আমরা সকলে যদি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র ঐ-সকল ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টি লইয়া পড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতাম যে মূলে তাহারা সবই এক এবং পরস্পরের সহায়ক। ২৬

•

একেশ্বরবাদ সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি। কিন্তু আমি ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া এমন সময় দেখিতে পাই না যখন পৃথিবীতে কার্যত একই ধর্মের অনুসরণ করা হইবে। মতবাদের দিক দিয়া ঈশ্বর যখন এক, তখন ধর্ম একটিই হইতে পারে। কিন্তু কার্যত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এমন দুইজন লোকও দেখিতে পাই নাই, ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা অভিন্ন। সুতরাং মনে হয় অন্তর ও বাহ্য-প্রকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী সর্বদাই নানা ধর্ম থাকিবে। ২৭

আমি বিশ্বাস করি যে জগতের সকল প্রধান ধর্ম অল্পবিস্তর সত্য। 'অল্পবিস্তর' বলি এইজন্য যে আমি বিশ্বাস করি মানুষের হাতের স্পর্শ যেখানে, মানুষ নিজে অসম্পূর্ণ বলিয়া সেখানেই অসম্পূর্ণতা থাকে। পূর্ণতা একমাত্র ভগবানেরই গুণ, ইহার বর্ণনা করা যায় না, রূপান্তর করা যায় না। আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ভগবান যেমন পূর্ণ তেমন পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। আমাদের সকলের পক্ষেই পূর্ণতা কাম্য, কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হইলে তাহা আর বর্ণনা করা যায় না, ভাষায় তাহার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সুতরাং আমি পরম বিনয় সহকারে স্বীকার করি যে বেদ, কোরান, বাইবেল সকলই ভগবানের অপূর্ণ বাণী, এবং আমরা যখন অপূর্ণ প্রাণী, বহু রিপুর দ্বারা আন্দোলিত, তখন আমাদের পক্ষে ভগবানের বাণীর অখণ্ড পূর্ণরূপ বুঝিতে পারাও অসম্ভব। ২৮

বেদই যে শুধু ভগবানের উক্তি তাহা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি যে বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা বেদের মতোই ভাগবত প্রেরণায় উৎপন্ন। হিন্দুশাস্ত্রে আমার বিশ্বাস আছে বলিয়া তাহার প্রত্যেক শব্দের ও শ্লোকের মধ্যে ভাগবত প্রেরণা আছে- এ-কথা স্বীকার করার প্রয়োজন নাই।... যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক, কোনো ব্যাখ্যাতেই আমি বাঁধা পড়িতে চাই না, যদি সে-ব্যাখ্যা যুক্তি বা নৈতিক জ্ঞানের পরিপন্থী হয়। ২৯

মন্দির, মসজিদ, গির্জা।... ভগবানের এই-সকল বিভিন্ন স্থানের মধ্যে আমি কোনো প্রভেদ দেখি না। ধর্মবিশ্বাস যেমন করিয়াছে তাহারা তেমনি হইয়াছে। মানুষ যে-কোনো উপায়ে দৃষ্টির অগোচর পরমেশ্বরকে পাইতে চায়, সেই আকূতির ফলে তাহাদের সৃষ্টি। ৩০

প্রার্থনা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। ইহা না থাকিলে আমি বহুকাল পূর্বেই পাগল হইয়া যাইতাম। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরম তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। সময় সময় সেজন্য আমি নিরাশ হইয়া পড়িতাম। সেই হতাশার ভাব কাটাইতে যে পারিয়াছি, তাহা শুধু প্রার্থনার বলেই। সত্য যেমন আমার জীবনেরই একটা অংশ, প্রার্থনা তেমন নয়। নিছক প্রয়োজনের বশেই প্রার্থনা আমার জীবনে আসিয়াছে, যেহেতু এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম যেখানে ইহা ছাড়া সুখী হইতে পারিতাম না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ভগবানে আমার বিশ্বাস বাড়িতে লাগিল, প্রার্থনার জন্য ব্যাকুলতাও ততই আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারা গেল না। ইহা না হইলে জীবন যেন ফাঁকা ও নীরস হইয়া যাইত। দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমি খ্রীষ্টীয় উপাসনাসভায় গিয়াছি, কিন্তু তাহা আমাকে তেমন আকর্ষণ করে নাই, আমি তাহাদের সহিত যোগ দিতে পারি নাই। তাহারা ভগবানকে মিনতি করিল, আমি তাহা পারিলাম না। আমি চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হইলাম। তাই ভগবান ও প্রার্থনার শক্তিতে অবিশ্বাস লইয়াই আমি যাত্রা করিলাম, এবং আরো অনেক দূরে অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত আমি জীবনে শূন্যতা বলিয়া কিছু একটা বোধ করি নাই। কিন্তু সেই বোধ যখন জাগিল তখন অনুভব করিলাম যে দেহের জন্য আহার না হইলে যেমন চলে না, আত্মার জন্য প্রার্থনা না হইলেও তেমনি চলে না। সত্য বলিতে কি দেহের জন্য আহারের তত প্রয়োজন নাই, আত্মার জন্য প্রার্থনার যত প্রয়োজন। কারণ দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে অনেক সময় অনশনের প্রয়োজন, কিন্তু প্রার্থনার অনশন বলিয়া কিছু নাই। প্রার্থনার পরিমাণ এত হইবে যে আর গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, এমনটা সম্ভব নয়। জগতের তিনজন প্রধান গুরু— বুদ্ধ, যিশু ও মহম্মদ— চূড়ান্ত সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা প্রার্থনার পথে দিব্য আলোক পাইয়াছিলেন, এবং প্রার্থনা ভিন্ন বাঁচিয়া থাকা তাঁহাদের সম্ভব ছিল না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রার্থনার মধ্যেই তাহাদের জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়— তা তাহাদের মিথ্যাবাদীই বল আর আত্ম-প্রবঞ্চকই বল। সত্যান্বেষীরূপে আমি কিন্তু এ-কথা বলিব যে এই 'মিথ্যা' আমাকেও মুগ্ধ করে, কেননা এই মিথ্যাই আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন

হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ইহা নহিলে আমি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিতাম না। ইহার বলে রাজনীতিক্ষেত্রে সম্মুখে যখন নিরাশার অন্ধকার দেখিয়াছি তখনো আমার চিত্তের শান্তি হারাই নাই। সত্য বলতে কি, দেখিয়াছি লোকেরা আমার শান্তি দেখিয়া হিংসা করে। সেই শান্তি আসে প্রার্থনা হইতে। আমি পণ্ডিত নই, কিন্তু প্রার্থনাশীল বলিয়া বিনীত ভাবে দাবি করিতে পারি। প্রার্থনার ধরন কি হইবে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাই না, এ-বিষয়ে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যবস্থায় চলিতে পারেন। কিন্তু কতকগুলি সুচিহ্নিত পথ আছে। প্রাচীন গুরুরা যে-পথ দিয়া গিয়াছেন সেই চালু পথ দিয়া চলা নিরাপদ। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছি। প্রত্যেকে চেষ্টা করিয়া দেখুন, নিত্য প্রার্থনার ফলে তিনিও জীবনে কিছু নূতন যোগ করিয়া দিতে পারিবেন। ৩১

মানুষের চরম লক্ষ্য হইল ভগবানকে উপলব্ধি করা—রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মবিষয়ক, তাহার সকল কর্ম চালিত হইবে পরিণামে ভগবদ্-দর্শনকে লক্ষ্য করিয়া। ভগবানকে পাইবার একমাত্র পথ হইল তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখা, তাঁহার সৃষ্টির সহিত একাত্ম বোধ করা; সুতরাং মানবসমাজের সেবা হইল সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। সকলের সেবার দ্বারাই শুধু ইহা সম্ভব। স্বদেশ-সেবার মধ্য দিয়া না হইলে ইহা চলিতে পারে না। আমি সমগ্রের অবিভাজ্য অংশ। মানবসমাজের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমি তাঁহাকে পাইব না। আমার দেশবাসীরা আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তাহারা এতই অসহায়, এতই নিঃসম্বল, এত জড়প্রকৃতির যে তাহাদের সেবাতেই আমার মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। যদি মনকে বোঝাইতে পারিতাম যে হিমালয়ের গুহাতেই তাঁহাকে পাইব, তবে দেরি না করিয়া তখনি সেখানে যাইতাম। কিন্তু আমি জানি যে মানবসমাজ ব্যতীত কোথাও তাঁহাকে পাইব না। ৩২

ধর্ম আমাদের নিকট আজ পানাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ ভিন্ন আর কিছু নয়, উচ্চনীচ-বোধের প্রতি নিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয় – ইহা মর্মান্তিক দুঃখের কথা। আমি বলিতে চাই, ইহার অপেক্ষা মূর্খতা আর হইতে পারে না। জন্ম ও আচারপালন দ্বারা কে বড় কে ছোট তাহা নির্ণয় করা যায় না। চরিত্রই একমাত্র নির্ণায়ক উপাদান। ভগবান মানুষকে উচ্চনীচে চিহ্নিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; যে-শাস্ত্র মানুষের কোন কুলে জন্ম তাহার কারণে তাহাকে হীন বা অস্পৃশ্য বলিয়া নাম দেন, তাহা আমরা

মানিতে বাধ্য নহি। ইহাতে ভগবানকে অস্বীকার করা হয়, ভগবান-রূপ যে-সত্য তাহাকে অস্বীকার করা হয়। ৩৩

ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জগতের সকল বড় ধর্মই সত্য, ভগবানের দ্বারা বিহিত এবং তাহা ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। যাহারা ঐ-সকল ধর্মবিশ্বাসে বা তাহার অনুকূল পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করে। আমি বিশ্বাস করি না যে কখনো এমন সময় আসিবে যখন আমরা বলিতে পারিব যে জগতে একটিমাত্র ধর্ম আছে। এক অর্থে, আজও জগতে একটি মৌলিক বা মূলগত ধর্ম আছে। কিন্তু প্রকৃতিতে সরল রেখা বলিয়া কিছু নাই। ধর্ম বহুশাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষ। শাখাপ্রশাখা গুনিলে বলিতে পার বহু ধর্ম, কিন্তু বৃক্ষ হিসাবে দেখিলে, ধর্ম এক। ৩৪

একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী যদি আমার কাছে আসিয়া বলে যে ভাগবত পড়িয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে, এইজন্য সে হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে চায়, তাহা হইলে আমি তাহাকে বলিব, "না। ভাগবত যাহা দিতে চায়, বাইবেলও তাহা দিতে চায়; তুমি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর নাই। চেষ্টা করো এবং ভালো খ্রীষ্টান হও।" ৩৫

মানবজাতির বহু কর্মের মধ্যে ধর্ম অন্যতম, আমি ধর্মকে এ-ভাবে দেখি না। একই কর্ম ধর্মভাবে বা অধর্মভাবে পরিচালিত হইতে পারে। সুতরাং ধর্মের জন্য রাজনীতি ত্যাগ করার কথা আমার পক্ষে উঠিতে পারে না। আমার সামান্যতম কর্মও, যাহাকে আমি আমার ধর্ম বলিয়া মনে করি তাহার দ্বারা পরিচালিত হয়। ৩৬

এই প্রাণিজগৎ যে একটা বিধানের দ্বারা অনুশাসিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। যদি তুমি বিধাতার কথা না ভাবিয়া বিধানের কথা ভাবিতে পার, তবে আমি বলিব, বিধানই বিধাতা, অর্থাৎ কিনা ভগবান। আমরা যখন বিধানের নিকট প্রার্থনা করি তখন শুধু বিধান জানিবার জন্য ও বিধান অনুসারে চলিবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহার জন্য ব্যাকুল হই, আমরা তাহাই হই। তাই প্রার্থনার প্রয়োজন। যদিও আমাদের বর্তমান জীবন যেমন আমাদের অতীতের দ্বারা চালিত হয়, সেই-রূপ কার্য-কারণ বিধির দ্বারাই আমরা এখন যাহা করিব তাহার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে। সুতরাং দুই বা ততোধিক পথের

মধ্যে কোন্‌টি বাছিয়া লইব তাহা যে-পরিমাণে মনে মনে বোধ করিব, সেই পরিমাণে আমরা পথ বাছিয়া লইব।

অমঙ্গল আছে কেন, তাহার প্রকৃতিই বা কি, এ-সকল প্রশ্ন আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির অগম্য বলিয়া মনে হয়। মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই আছে, ইহা জানাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। যতক্ষণ আমরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের ভেদ বুঝিতে পারিব, ততক্ষণ একটিকে বর্জন করিয়া অন্যটি গ্রহণ করিব। ৩৭

যাহারা ভগবানের বিধানে বিশ্বাসী তাহারা যথাসাধ্য কাজ করিয়া যায়, কখনো উদ্বিগ্ন হয় না। সূর্য কখনো অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। অথচ তাহার মতো এমন অতুলনীয় নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে আর কে এত কঠোর পরিশ্রম করে! আর সূর্য যে প্রাণহীন এ-কথা আমরা কেন মনে করি? তাহার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে এই প্রভেদ থাকিতে পারে যে সূর্যের বাছিয়া লইবার পথ নাই; আমরা খানিকটা বাছিয়া লইতে পারি, তাহা যত অল্প এবং যতই বিপৎসঙ্কুল হউক না। কিন্তু এরূপ কল্পনার আর প্রয়োজন নাই। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে অক্লান্ত কর্মশিল্পের ব্যাপারে তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে আছে। যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করি এবং নিজেদের শূন্য করিয়া ফেলি, তবে আমরাও স্বেচ্ছায় ভালোমন্দ বিচার করিবার অধিকার ত্যাগ করি, তখন আর আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির কোনো কথা উঠে না। ৩৮

এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে যুক্তি আমাদিগকে বেশি দূর লইয়া যাইতে পারে না, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সকল-কিছু গ্রহণ করিতে হয়। বিশ্বাস তবে যুক্তির বিরোধী নয়, যুক্তিকে ছাপাইয়া যায়। বিশ্বাস ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের মতো, যে-সব ক্ষেত্র যুক্তির বা বুদ্ধির অতীত সেখানে তার ক্রিয়া। তিনটি লক্ষণের সাহায্যে ধর্মের নামে যে-সকল দাবি পেশ করা হয় তাহা পরীক্ষা করিতে কোনো কষ্ট হয় না। তাই যিশুই পরমেশ্বরের একমাত্র ঔরসজাত পুত্র, এ-কথা বিশ্বাস করা আমার নিকট যুক্তি-বিরোধী। কারণ পরমেশ্বর বিবাহ করিতে পারেন না, সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন না। 'পুত্র' কথাটা এখানে আলংকারিক ভাবেই শুধু প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই অর্থে যাঁহারাই যিশুর অবস্থায় আসিয়াছেন তাঁহারাই পরমেশ্বরের ঔরসজাত পুত্র। যদি কেহ আমাদের তুলনায় আধ্যাত্মিক জগতে বহুগুণ অগ্রসর থাকেন তবে আমরা বলিতে পারি, তিনি এক বিশেষ অর্থে পরমেশ্বরের সন্তান, যদিও আমরা সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান।

এই সম্পর্কটা আমাদের জীবনে আমরা অস্বীকার করি, আর তাঁহার জীবন এই সম্পর্কের প্রমাণ বা সাক্ষ্য দিতেছে। ৩৯

ভগবান দেহধারী নহেন।... ভগবান হইলেন শক্তি। তিনি প্রাণের প্রাণ। তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সত্তা। তিনি শাশ্বত। তথাপি, আশ্চর্য এই যে এই সর্বব্যাপী প্রাণশক্তি হইতে সকলে লাভবান হইতে পারে না অথবা ইহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না।

বিদ্যুৎ প্রবল শক্তি। সকলে ইহাকে কাজে লাগাইতে পারে না। কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে তবে ইহা উৎপন্ন হয়। এই শক্তির মধ্যে প্রাণ নাই। মানুষ কঠোর পরিশ্রমে ইহার জ্ঞান অর্জন করিলে তবে ইহাকে কাজে লাগাইতে পারে।

যে-প্রাণশক্তিকে আমরা ভগবান বলিয়া ডাকি তাঁহারও সন্ধান পাওয়া যায় যদি আমরা আমাদের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইবার নিয়ম জানিতে পারি ও সেই নিয়ম পালন করি। ৪০

ভগবানের দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রার প্রয়োজন নাই। বিগ্রহের সামনে ধূপ-দীপের প্রয়োজন নাই, বিগ্রহ অভিষেক করার প্রয়োজন নাই, রক্তবর্ণ সিন্দুর প্রলেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন। যদি আমাদের ভৌতিক দেহের বোধ আমাদের মধ্যে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। ৪১

কাজ চলার মতো কিছু ধরিয়া না লইলে কোনো সন্ধানই সম্ভব নয়। আমরা কিছু না দিলে কিছুই পাই না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই বিশ্বের বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন, পণ্ডিত ও অপণ্ডিত সকলেই এইটা ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে যে যদি আমরা থাকি তবে ভগবানও আছেন, আর যদি ভগবান না থাকেন তবে আমরাও নাই। মানবজাতির সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস এমন ওতঃপ্রোত যে ভগবানের অস্তিত্বকে সূর্যের অস্তিত্ব অপেক্ষাও স্থির তত্ত্ব বলিয়া ধরা হয়। জীবনের বহু সমস্যা এই জীবন্ত বিশ্বাস সমাধান করিয়াছে। ইহা আমাদের দুঃখ লাঘব করিয়াছে; জীবনে স্থিতি আনিয়াছে, মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়াছে। এই বিশ্বাসের জন্যই সত্যের সন্ধানও আকর্ষণীয় হইয়াছে, তাহাকে তাৎপর্য দিয়াছে। কিন্তু সত্যের সন্ধানের অর্থই হইল ভগবানের সন্ধান। সত্যই ভগবান। ভগবান আছেন, কারণ সত্য আছে। আমরা সত্যের সন্ধানে বাহির হই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে সত্য

আছে, এবং সন্ধানের জন্য পরিশ্রম করিলে ও সুপরিজ্ঞাত ও সুপরীক্ষিত সন্ধানের নিয়ম যথাযথভাবে পালন করিয়া চলিলে সত্যে উপনীত হইতে পারা যায়। এরূপ সত্যানুসন্ধান বিফল হওয়ার কোনো নজির ইতিহাসে নাই। নাস্তিকেরাও ভগবানে অবিশ্বাস করিবার ভান করিয়াছে কিন্তু সত্যকে বিশ্বাস করিয়াছে। মজা হইল, তাহারা ভগবানকে আর-একটা নাম দিয়াছে, সে-নাম কিছু নূতন নয়। ভগবানের নাম তো অসংখ্য। সত্য হইল সে-সকল নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভগবান যেমন সত্য, কতকগুলি মৌলিক নৈতিক বিশ্বাসও তেমনি সত্য, অবশ্য তাহার চেয়ে অল্প পরিমাণে। বস্তুত ভগবানে বা সত্যে বিশ্বাসের মধ্যেই তাহারা নিহিত আছে। ইহাদের হইতে দূরে সরিয়া গিয়া বিপথ-গামীরা অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়াছে। সাধনার দুরূহতা আর অবিশ্বাস এক বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। হিমালয়ের অভিযানে সিদ্ধির জন্যও কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত মানিয়া চলিতে হয়। শর্তগুলি পালন করা কঠিন বলিয়া অভিযান অসম্ভব হইয়া উঠে না। তাহাতে শুধু সন্ধানে অনুরাগ বাড়ে, রসও বাড়ে। যাহা হউক, ভগবানের বা সত্যের সন্ধানে এই অভিযান অসংখ্য হিমালয়-অভিযান অপেক্ষা অনন্তগুণ অধিক কঠিন এবং সে কারণে ইহার প্রতি আকর্ষণও অনেক বেশি। আমরা যদি ইহাতে বেশি রস না পাই, তাহা হইলে তাহা আমাদের বিশ্বাস ক্ষীণ বলিয়া। আমরা আমাদের ভৌতিক বা স্থূল চক্ষুতে যাহা দেখি তাহা, আমাদের নিকট একমাত্র সত্য যাহা, তাহা অপেক্ষা বেশি বাস্তব। আমরা জানি যে বাহিরে যাহা দেখি তাহা সত্য দেখি না, তথাপি আমরা যাহা তুচ্ছ তাহাই তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া জ্ঞান করি। যদি যাহা তুচ্ছ তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াই দেখিতাম, তবে অর্ধেক যুদ্ধ জয় হইত। তাহাই তো সত্যের বা ভগবানের সন্ধানের অর্ধেক পথেরও অধিক। এই-সব তুচ্ছ বস্তু হইতে নিজেদের যদি মুক্ত না করি, তাহা হইলে সেই মহাসন্ধানের জন্য অবসরও আমাদের হইবে না। কিন্তু একাজ কি শুধু আমাদের অবসর-কালের জন্যই রাখিতে হইবে? ৪২

ভগবানের অসংখ্য নাম, কারণ তাঁহার অসংখ্য প্রকাশ। সেগুলি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হই, ক্ষণেকের জন্য আমাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু আমি ভগবানের সত্যস্বরূপেরই পূজারী। আমি এখনো তাঁহাকে পাই নাই, তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। এই অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাহা আমার নিকটে প্রিয়তম তাহা বিসর্জন করিতে প্রস্তুত আছি। যদি আমার নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হয়, তাহা হইলেও আশা করি আমি

তাহা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিব। কিন্তু যতক্ষণ সেই অদ্বৈত তত্ত্ব উপলব্ধি না করি, ততক্ষণ আপেক্ষিক তত্ত্ব— আমি যেমন বুঝিয়াছি— তাহা লইয়াই থাকিব। ৪৩

আমার চলার পথে অনেকবার আমি সেই পরম সত্যস্বরূপ ভগবানকে অস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রতিদিন আমার ধারণা দৃঢ় হইতেছে যে তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু, আর সকলই অনিত্য। যাঁহাদের ইচ্ছা তাঁহারা আমার এই ধারণা কি করিয়া দৃঢ় হইল তাহা উপলব্ধি করুন। তাঁহারা আমার পরীক্ষায় আসিয়া যোগ দিন, এবং যদি পারেন তো আমার ধারণারও অংশীদার হউন। আমার আরো ধারণা দৃঢ় হইতেছে যে আমার পক্ষে যাহা সম্ভব, শিশুর পক্ষেও তাহা সম্ভব, এবং এ-কথা বলার পশ্চাতে আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সত্যের সন্ধানের জন্য সাধন-সামগ্রী যেমন সহজ তেমনি কঠিন। একজন উদ্ধত-গর্বিত ব্যক্তির নিকট একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, নিষ্পাপ শিশুর নিকট মনে হইবে একান্ত সহজ। সত্যের যিনি সন্ধানী তাঁহাকে ধূলা অপেক্ষা হীন হইতে হইবে। ৪৪

সমগ্র সত্যের দর্শন যদি আমরা পাইতাম, তাহা হইলে আমরা আর শুধু সন্ধানী থাকিতাম না; ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতাম। কারণ সত্যই ভগবান। কিন্তু শুধু সন্ধানী বলিয়া. আমরা সন্ধান করিয়াই চলি, আমরা যে অপূর্ণ তাহা বোধ করি। কিন্তু যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে অপূর্ণতা থাকে, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা উপলব্ধি করি নাই, যেমন ভগবানকে আমরা উপলব্ধি করি নাই। আমাদের কল্পনার ধর্ম, এরূপ অপূর্ণ বলিয়া সর্বদাই তাহার বিবর্তন চলিতেছে। মানুষের মনে যে-সকল ধর্মবিশ্বাসের আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি অপূর্ণ হয়, তাহা হইলে কোন্ ধর্মবিশ্বাস ভালো, আর কোন্‌টি মন্দ, সে প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত ধর্মবিশ্বাস সত্যকে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সবগুলিই অপূর্ণ, ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বত্র। অন্য ধর্মে শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে বলিয়া তাহাদের দোষত্রুটির প্রতি অন্ধ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের নিজেদের ধর্মের ত্রুটি সম্বন্ধেও বিশেষ-ভাবে সজাগ থাকিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা ছাড়িলে চলিবে না। ঐ-সকল ত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সকল ধর্মে সমদৃষ্টি থাকিবে বলিয়া আমরা অন্যান্য ধর্মের প্রত্যেক গ্রহণযোগ্য অঙ্গ আমাদের ধর্মে মিলাইতে যে শুধু ইতস্তত করিব না তাহা নয়, মিলাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিব।

বৃক্ষের কাণ্ড একটি, কিন্তু বহু শাখাপ্রশাখা, বহু পত্রপল্লব; তেমনি সত্য ও পূর্ণধর্ম একটি, কিন্তু মানুষের মাধ্যমে যায় বলিয়া তাহা বহু হয়। সেই এক ধর্ম সকল বাক্যের অতীত। অপূর্ণ মানুষ তাহা নিজের সাধ্যমত নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করে, অন্য লোকে তাহারই মতো অপূর্ণ ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করে। কাহার ব্যাখ্যা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিব? প্রত্যেকেই নিজের নিজের দিক হইতে ঠিক বলে, কিন্তু প্রত্যেকেরই ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং উদারতার প্রয়োজন আছে। সে উদারতার অর্থ এমন নয় যে নিজের ধর্মের প্রতি উদাসীন হইবে, বরং নিজের ধর্মে তাহার অনুরাগ আরো বুদ্ধিযুক্ত, আরো পবিত্র হইবে। উদারতা আমাদিগকে যে-অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে তাহার ও ধর্মোন্মাদনার মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেকার প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলে। ৪৫

আমি বিশ্বাস করি যে আমরা সকলেই ভগবানের দূত হইতে পারি— যদি মানুষকে ভয় না করি, শুধু ভগবানের সত্যকেই খুঁজি। আমি বিশ্বাস করি আমি শুধু ভগবানের সত্যকেই খুঁজি, তাই মানুষের ভয় আর আমার নাই। ৪৬

ভগবদিচ্ছার কোনো বিশেষ প্রকাশ আমার জানা নাই। তিনি প্রত্যহ প্রত্যেকের নিকট প্রকাশিত হন ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু আমরা কান বন্ধ করিয়া রাখি, তাই সেই শান্ত ক্ষীণ স্বর শুনিতে পাই না; চক্ষু আবৃত করিয়া থাকি তাই তাঁহার দিব্যজ্যোতি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় না। ৪৭

আমাকে যাইতেই হইবে।... ঈশ্বর আমার একমাত্র পথিপ্রদর্শক। তিনি নিজের প্রভুত্ব সম্বন্ধে বড় সজাগ। কাহাকেও তাঁহার ক্ষমতার ভাগ দিবেন না। তাঁহার সামনে মানুষকে তাই তাহার সকল দুর্বলতা লইয়া দাঁড়াইতে হয়, খালি হাতে— পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবে। তখন তিনি তাহাকে সারা জগতের সামনে দাঁড়াইবার শক্তি দেন, সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। ৪৮

অন্তরে যদি ভগবানের অস্তিত্ব বোধ না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যহ এত দুঃখ-দুর্দশা ও নৈরাশ্য দেখিতে পাই যে উন্মাদ-পাগল হইয়া ছুটিয়া গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন করিতাম। ৪৯

সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত অর্থে সকল শুভাশুভের মূলে ভগবান স্বয়ং। গুপ্তঘাতকের ছোরা এবং অস্ত্রচিকিৎসকের ছুরি দুই-ই তিনি পরিচালনা করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের দিক দিয়া ভালো এবং মন্দ পরস্পর হইতে পৃথক, উভয়ের মধ্যে কোনো সংগতি নাই। আলো এবং অন্ধকার, ভগবান এবং শয়তান— ভালো এবং মন্দের প্রতীক। ৫০

তুমি আমি যে এই ঘরে বসিয়া আছি, ইহা যতটা জানি তাহার চেয়ে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরো বেশি জানি। আমি এ-কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি যে জল-হাওয়া ছাড়া বাঁচিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে না পাইলে আমার চলে না। আমার চোখ উপড়াইয়া ফেল, তাহাতে আমি মরিব না। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস দূর করিয়া দাও, আমার মৃত্যু হইবে। ইহাকে একটা কুসংস্কার বলিতে পার, কিন্তু আমি স্বীকার করি যে এই কুসংস্কার আমার অতি আদরের— ঠিক যেমন ছেলেবেলায় কোনো বিপদ বা ভয়ের কারণ থাকিলে রাম-নাম আঁকড়াইয়া ধরিতাম, এক বুড়ি-ঝি আমাকে তাহা শিখাইয়াছিল। ৫১

যতক্ষণ না নিজেদের পৃথক সত্তা লুপ্ত করিয়া দিতেছি ততক্ষণ আমাদের মধ্যে যাহা অশুভ তাহা বিনষ্ট করিয়া দিতে পারি না। যাহা একমাত্র প্রকৃত এবং পাওয়ার যোগ্য স্বাধীনতা, তাহার মূল্য হিসাবে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন আর কিছু ভগবান চান না। মানুষ নিজে যখন এইরূপে নিজেকে হারাইয়া ফেলে তখনই সকল প্রাণীর সেবার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজিয়া পায়। উহাই তাহার আনন্দ ও আরাম হইয়া ওঠে। সে তখন নূতন মানুষ, ভগবানের সৃষ্টির সেবায় নিজেকে ব্যয় করিতে তাহার কখনো ক্লান্তি হয় না। ৫২

তোমার জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন তোমার নিকটতম বন্ধুদেরও তুমি তোমার পক্ষে টানিতে পার না, তত্রাচ তোমার কাজ করিতেই হয়। তোমার ভিতরে যে 'শান্ত ক্ষীণ স্বর' আছে, কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহাই যে সর্বদা শেষ পর্যন্ত তোমাকে চালনা করে। ৫৩

ধর্ম ভিন্ন এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিতাম না। আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের অনেকে আমার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা বলেন যে আমার রাজনীতিও নাকি ধর্ম হইতে উৎপন্ন। তাঁহারা ঠিকই বলেন। আমার রাজনীতি ও অন্যান্য সকল কর্মপ্রচেষ্টার উৎস হইল আমার ধর্ম।

আমি আরো অগ্রসর হইয়া বলিব, ধার্মিক ব্যক্তির ধর্মই হইবে প্রত্যেক কর্মের উৎস, কারণ ধার্মিক হওয়ার অর্থ হইল ঈশ্বরের বন্ধনে বদ্ধ হওয়া, যখন তাঁহার প্রতিটি নিঃশ্বাস পরিচালনা করেন স্বয়ং ঈশ্বর। ৫৪

আমার কাছে ধর্ম-বিহীন রাজনীতি নিতান্তই আবর্জনা, সর্বথা পরিত্যাজ্য। রাজনীতির কাজ জাতিসমূহ লইয়া। যাহাতে জাতিসমূহের কল্যাণ হইতে পারে তাহা অবশ্যই ধর্মভাবাপন্ন, অর্থাৎ ঈশ্বর ও সত্যের সন্ধানী লোকের নানা কর্মের মধ্যে অন্যতম। আমার নিকট ঈশ্বর ও সত্য সমার্থক শব্দ। যদি কেহ আমাকে বলিত যে ঈশ্বর হইলেন অসত্যের ঈশ্বর, অথবা পীড়নের ঈশ্বর, তবে আমি সে-ঈশ্বরকে পূজা করিতাম না। সুতরাং রাজনীতি-ক্ষেত্রেও আমাদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ৫৫

সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে নিজেকে একাত্মবোধ না করিলে ধর্মজীবন যাপন করিতে পারিতাম না। রাজনীতিতে যোগদান না করিলে মানবজাতির সঙ্গে একাত্মবোধও হইত না। আজ মানুষের কর্মের সকল ক্ষেত্র মিলিয়া এক অবিভাজ্য সমগ্রতা লাভ করিয়াছে। তুমি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজ-নৈতিক ও বিশুদ্ধ ধর্মের কাজ ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিচ্ছিন্ন কুঠারিতে ভাগ করিতে পার না। মানুষের কাজ হইতে পৃথক কোনো ধর্ম আছে বলিয়া আমি জানি না। ইহা মানুষের সকল কর্মে একটা নৈতিক ভিত্তি জোগাইয়াছে, আর নৈতিক ভিত্তি না থাকিলে জীবন শুধুই অর্থহীন কোলাহল হইয়া থাকিত। ৫৬

ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্য দিয়া বিশ্বাসই আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, বিশ্বাসই পথ হইতে পাহাড়-পর্বত সরাইয়া দেয়, বিশ্বাসই সাগর লঙ্ঘন করায়। অন্তরে ভগবান আছেন, জীবন্ত সদাজাগ্রত অনুভূতিই তো সেই বিশ্বাস, তাহা ভিন্ন কিছু নয়। যে-ব্যক্তির এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহার কিছুরই অভাব নাই। দেহে রোগ থাকিলেও তাহার অধ্যাত্মজীবন সুস্থ— বাহিরে দারিদ্র হইলেও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি তাহার প্রচুর। ৫৭

রূপ বহু, কিন্তু প্রাণদায়ী আত্মা এক। বাহিরের বিভিন্নতার আবরণ ভেদ করিয়া নীচে এই সর্বব্যাপী মূলগত ঐক্য যেখানে, সেখানে উচ্চনীচ-ভেদের স্থান কোথায়? দৈনন্দিন জীবনে প্রতি পদে এই বস্তুরই তো সাক্ষ্য মিলিবে। এই একান্ত ঐক্যের উপলব্ধিই হইল সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য। ৫৮

হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে ভগবানের সহস্রনাম বলে, তরুণ যৌবনে তাহা জপ করিতে শিখিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের ঐ সহস্রনাম চূড়ান্ত নয়। আমরা বিশ্বাস করি, এবং আমি মনে করি সে-কথা সত্য, যে যত প্রাণী, ভগবানের তত নাম। তাই আমরা ইহাও বলি যে ভগবানের নাম নাই। তাঁহার বহু রূপ আছে বলিয়া তাঁহাকে আমরা অরূপও বলি, যেমন বহু ভাষায় কথা বলেন বলিয়া তাঁহাকে অবাক্ বলি, সেইরূপ আর-কি। তাই যখন আমি ইসলামের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দেখিলাম যে ইসলামেও ভগবানের বহু নাম।

যাহারা 'ঈশ্বর প্রেমময়' বলে আমি তাহাদের সঙ্গে একযোগে বলি, ঈশ্বর প্রেমময়। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরে বলি, ভগবান প্রেমময় হইলেও সবার উপরে ভগবান সত্য। মানবের ভাষায় ভগবানের পূর্ণ বর্ণনা যদি দেওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে সে-বর্ণনা হইল 'ভগবান সত্য'— আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি। দুই বৎসর পূর্বে আমি আরো একটু অগ্রসর হইয়া বলিলাম, সত্যই ভগবান। ভগবানই সত্য ও সত্যই ভগবান, এই দুইটি কথার মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা বুঝিতে পারিবেন। পঞ্চাশ বৎসর-কাল যে অবিরাম ও কঠোর সত্যের সাধনা করিয়াছি, তাহার অবসানে ঐ সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দেখিয়াছি যে প্রেমের পথেই সত্যকে সর্বাপেক্ষা নিকটে পাই। কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি যে ইংরাজি ভাষায় প্রেমের বহু অর্থ আছে এবং 'কাম' এই অর্থে মানুষের প্রেম অবনতির পথে লইয়া যাইতে পারে। দেখিয়াছি যে অহিংসার অর্থে প্রেমের পূজারীর সংখ্যা জগতে কম। কিন্তু সত্যের দুই রকম অর্থ কখনো পাই নাই; নাস্তিকেরাও সত্যের শক্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু সত্য আবিষ্কারের উৎসাহে নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করে নাই— তাহাদের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা ঠিকই হইয়াছিল। এই যুক্তি অনুসারেই আমি দেখিলাম যে ভগবানই সত্য না বলিয়া বরং সত্যই ভগবান বলা উচিত। ইহার সঙ্গে ঘোর অসুবিধার কথা যোগ করুন— লক্ষ লক্ষ লোক ভগবানের নাম লইয়াছে এবং তাঁহার নামে বহু দুষ্কর্ম করিয়াছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরাও সত্যের নামে প্রায়ই দুষ্কর্ম করে। তাহার উপর হিন্দু-দর্শনে একটি কথা আছে, একমাত্র ভগবান আছেন, আর কিছু নাই, এবং এই সত্যই ইসলামের কলমায় জোর দিয়া বলা হইয়াছে ও তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানে স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে, ভগবানই একমাত্র আছেন, আর কিছুই নাই। বাস্তবিক, সত্যের সংস্কৃত প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ হইল যাহা আছে, সৎ। এই-সকল ও অন্যান্য কারণে আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, সত্যই ভগবান

এই সংজ্ঞাতে আমি সবচেয়ে সন্তোষ লাভ করি। যখন, সত্যকে ভগবান রূপে দেখিতে চাই, তাহার একমাত্র অবশ্যগ্রাহ্য উপায় হইল প্রেম, অর্থাৎ অহিংসা; এবং যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে এক্ষেত্রে পরিণামে সাধন ও সাধ্য সমার্থক সেইহেতু এ-কথা বলিতে আমার সংকোচ নাই যে, ভগবানই প্রেম। ৫৯

শুদ্ধ সত্যের দিক হইতে দেখিলে, শরীরও তো একটা সম্পত্তি। সত্যই বলা হইয়াছে, ভোগের বাসনা হইতেই আত্মার জন্য দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। বাসনা অন্তর্হিত হইলে দেহের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। জন্ম-মৃত্যুর পাপচক্র হইতে মানুষ তখন মুক্ত। আত্মা সর্বব্যাপী, সে কেন দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবে, অথবা ঐ পিঞ্জরের জন্য পাপ করিবে, এমন-কি প্রাণিহত্যা পর্যন্ত করিবে? এইভাবে আমরা পূর্ণ ত্যাগের প্রসঙ্গে আসিয়া পৌঁছাই, এবং দেহকে যতক্ষণ তাহার সত্তা আছে ততক্ষণ তাহার সেবার কাজে লাগাইতে চেষ্টা করি, যাহাতে সেবাই শেষকালে জীবনের অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়, অন্ন নয়। আমরা খাই দাই, ঘুমাইয়া থাকি ও জাগিয়া উঠি, সকলই শুধু সেবার জন্য। মনের এই ভাবই প্রকৃত সুখ লইয়া আসে, সময় পূর্ণ হইলে ভগবদ্দর্শনের পথ করিয়া দেয়। ৬০

সত্য কাহাকে বলে? কঠিন প্রশ্ন; কিন্তু আমি আমার মতো একটা উত্তর দিয়াছি, বলিয়াছি যে অন্তরের বাণী যাহা বলে তাহাই সত্য। জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন এবং বিপরীত সত্যের কথা ভাবে? মানুষের মন অসংখ্য পথ দিয়া চলে, মনের বিবর্তন সকলের সমান নহে, যাহা একের পক্ষে সত্য তাহা অন্যের পক্ষে অসত্য হইতে পারে, তাই যাঁহারা এ-সব বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঐ-সব পরীক্ষা করিতে গেলে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হইবে।... আমরা বর্তমানে দেখিতে পাই প্রত্যেকেই বিবেকের অধিকার আছে বলিয়া দাবি করে, কিন্তু কোনো নিয়মের ভিতর দিয়া যায় না, তাই এই উদ্‌ভ্রান্ত জগতে এত অসত্যের অবতারণা। প্রকৃত বিনয়ের সহিত আমি এই কথাই বলিতে চাই, যে-ব্যক্তির প্রচুর বিনয়-বোধ নাই সে সত্যকে খুঁজিয়া পায় না। সত্যের সাগর-বক্ষে যদি সন্তরণ করিতে চাও তবে তোমার নিজেকে শূন্যে পরিণত করিতে হইবে। ৬১

প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে সত্যের বাস, সেখানেই সত্যকে খুঁজিতে হইবে, এবং সত্য যেমন প্রতিভাত হয়, তাহার সাহায্যে তেমনভাবে চলিতে হইবে।

কিন্তু নিজের সত্য-দর্শন অনুসারে অন্যকে জোর করিয়া চালনা করিবার অধিকার কাহারও নাই। ৬২

জীবন ঊর্ধ্বগামী। ইহার লক্ষ্য হইল পূর্ণতার পথে, আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া। আমাদের দুর্বলতা বা অপূর্ণতার জন্য আদর্শকে খাটো করা চলিবে না। বেদনার সহিত অনুভব করিতেছি, ঐ দুইটিই আমার মধ্যে আছে। প্রতিদিন নীরবে সত্যের নিকট প্রার্থনা করি যে আমার এই-সকল দুর্বলতা, এই-সকল অপূর্ণতা দূর করিতে সাহায্য করো। ৬৩

আমার লেখার মধ্যে অসত্যের কোনো স্থান নাই, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সত্য ভিন্ন ধর্ম নাই, এবং সত্যের বিনিময়ে অন্য কোনো বস্তু বর্জন করিবার ক্ষমতা আমার আছে। আমার লেখা কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ-বর্জিত না হইয়াই পারে না, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রেমই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। যেখানে প্রেম সেখানেই শুধু জীবন। প্রেমহীন জীবন মৃত্যুর সমান। একটি মুদ্রার এক পিঠে যেন প্রেম, অন্য পিঠে সত্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস... সত্য এবং প্রেমের দ্বারা আমরা জগৎ জয় করিতে পারি। ৬৪

আমি সত্য ভিন্ন আর কাহারও কাছে আত্মনিবেদন করি নাই, সত্য ভিন্ন আর কাহারও নিয়মে চলিতে বাধ্য নহি। ৬৫

প্রথমে সাধনা করিতে হইবে সত্যের, সুন্দর ও শিব তাহার পর আসিয়া জুটিবে। শৈলশিখরে উপদেশ দিবার সময় খ্রীষ্ট বস্তুত এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। আমার নিকট যিশু ছিলেন এক প্রধান শিল্পী, কারণ তিনি সত্যকে দেখিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন; মহম্মদও তাই। সমগ্র আরবি সাহিত্যে কোরান পূর্ণতম রচনা— অন্তত পণ্ডিতেরা তাই বলেন। উভয়েরই প্রথম চেষ্টা ছিল সত্যের প্রতিষ্ঠা, তাই তাহাতে প্রকাশের সৌন্দর্য স্বাভাবিক পথেই আসিয়াছিল, অথচ যিশু বা মহম্মদ শিল্পকলার সম্বন্ধে লেখেন নাই। এই সত্য ও সুন্দরের জন্যই আমার আকাঙ্ক্ষা, ইহার জন্যই আমার জীবন, ইহার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ৬৬

ভগবানের কথা যদি বল, তাঁহার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কিন্তু সত্যের সংজ্ঞা তো প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। সত্য হইল সেই জিনিস যাহা তুমি এই মুহূর্তে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহাই তোমার ঈশ্বর। মানুষ

যদি এই আপেক্ষিক সত্যকে বিশ্বাস করে, তাহা হইলে যথাসময়ে সে অবশ্যই চরম সত্য অর্থাৎ ভগবানকে পাইবে। ৬৭

পথ আমার জানা। পথ সোজা চলিয়াছে, সংকীর্ণ পথ। শাণিত তরবারির ন্যায় তাহার ধার। তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া আমি আনন্দ পাই। পদস্খলন হইলে কাঁদি। ভগবান বলিয়াছেন : যে চেষ্টা করে সে বিফল হয় না। ভগবানের সেই প্রতিশ্রুতিতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস। তাই যদিও বা দুর্বলতার জন্য সহস্রবার পতন হয়, তথাপি বিশ্বাস হারাইব না। আশা রাখিব যে ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশে আসিলে— একদিন তো আসিবেই— আলো দেখিতে পাইব। ৬৮

আমি তো সত্যের সন্ধানী মাত্র। একটা পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি বলিয়া দাবি করি, সত্যকে পাইবার জন্য অবিরাম ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করি বলিয়া দাবি করি। স্বীকার করি, এখনো তাহাকে পাই নাই। সত্যকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার অর্থ হইল নিজেকে উপলব্ধি করা, নিজের ভাগ্যকে উপলব্ধি করা, অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ করা। আমার ত্রুটি সম্বন্ধে আমি খুবই সজাগ, আর তাহাতেই আমার সকল শক্তি, কারণ মানুষের নিজের শক্তি যে সীমিত সে-জ্ঞান খুব সুলভ নয়। ৬৯

'চারদিকে সমাচ্ছন্ন অন্ধকারের' মধ্যে আমি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলোর পথে চলিয়াছি। প্রায়ই ভ্রান্তি হয়, গণনায় ভুল হয়।... আমার নির্ভর শুধু ভগবানে। ভগবানে নির্ভর বলিয়া মানুষেও আমি বিশ্বাস করি। নির্ভর করিবার জন্য ভগবানকে যদি না পাইতাম তাহা হইলে টাইমনের মতো আমিও মানব-বিদ্বেষী হইয়া উঠিতাম। ৭০

আমি 'সাধুর ছদ্মবেশে রাজনৈতিক' নহি। কিন্তু সত্য সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া সময় সময় আমার কাজকর্ম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক জ্ঞানের সহিত সংগত বলিয়া মনে হয়। সত্য ও অহিংসার নীতি ভিন্ন অন্য কোনো নীতি আমার নাই বলিয়া আশা করি। এমন-কি, দেশ অথবা ধর্মের উদ্ধারের জন্যও সত্য এবং অহিংসা বর্জন করিব না। ইহার অর্থ এই যে দুইটির কোনোটিই এভাবে উদ্ধার করা যায় না। ৭১

আমার মনে হয়, অহিংসা অপেক্ষা সত্যের আদর্শই আমি ভালো করিয়া বুঝি। আমার অভিজ্ঞতা বলে যে যদি আমি সত্যকে ছাড়িয়া দিই, তবে

অহিংসার সমস্যা কখনো সমাধান করিতে পারিব না।... অর্থাৎ, হয়তো, সরল পথে চলিবার আমার সাহস নাই। মূলে দুটির একই অর্থ, কারণ সন্দেহ সর্বদাই বিশ্বাসের অভাব বা দুর্বলতার ফল। 'প্রভু, আমাকে বিশ্বাস দাও'— তাই দিনরাত্রি ইহাই আমার প্রার্থনা। ৭২

অপমান ও তথাকথিত পরাজয়ের মধ্যে, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যে আমি আমার শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি, কারণ সত্যের রূপধারী ভগবানে আমার অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস আছে। অসংখ্য-রূপে ভগবানকে আমরা বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু আমি আমার জন্য এই মন্ত্রই গ্রহণ করিয়াছি— সত্যই ভগবান। ৭৩

কোনো অভ্রান্ত পরিচালনা বা প্রেরণার দাবি আমি করি না। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, মানুষের ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে না এরূপ দাবি টিকিবে না। কারণ ভগবৎ-প্রেরণা শুধু তাহারই আসিতে পারে যে দ্বন্দ্বাতীত, এবং কোনো বিশেষ ব্যাপারে দ্বন্দ্বাতীত হওয়ার দাবি সংগত কি না তাহা স্থির করা কঠিন। এইরূপে, ভুলভ্রান্তি হইবে না এরূপ দাবি সর্বদাই বড় কঠিন দাবি। কিন্তু তাই বলিয়া চালনা করিবার বা পথপ্রদর্শনের কেহ নাই এ-কথাও বলা চলে না। জগতের মনীষীদের অভিজ্ঞতার সমষ্টি আমরা পাইতেছি, এবং ভবিষ্যতে সর্বদাই পাইতে থাকিব। তা ছাড়া মৌলিক সত্যের সংখ্যা বেশি নয়; কিন্তু সকলের মূলে একটি সত্য আছে, তাহাকে মূল সত্য বলা চলে, তাহার অন্য নাম অহিংসা। সত্য ও প্রেম, যাহা স্বতই অসীম, সীমাবদ্ধ মানুষ তাহার পূর্ণরূপ কখনো জানিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের পথ চলিবার পক্ষে আমরা যাহা জানি তাহা যথেষ্ট। আমরা কর্মক্ষেত্রে ভুল করিব, কখনো বেশি রকম ভুল করিব। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, এবং এই আত্মকর্তৃত্বের মধ্যে অবশ্যই ভুল করিবার ক্ষমতাও যেমন আছে, যতবার ভুল হইবে ততবার তাহা সংশোধনের ক্ষমতাও তেমনি আছে। ৭৪

আমি অবহেলার বা অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারি। কিন্তু সত্য যখন আমার মধ্য দিয়া কথা বলে তখন আমাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না। ৭৫

আমি যাহা বলিতে চাহি নাই তাহা বলার অপরাধ আমি জীবনে কখনো করি নাই— আমার প্রকৃতিই হইল সোজা হৃদয়ে স্পর্শ করা। যদি প্রায়ই আমি তাহা করিতে না পারি, তবু আমি জানি যে পরিণামে লোকে সত্যের

বাণী শুনিবে ও অনুভব করিবে— যেমন আমার অভিজ্ঞতায় অনেক বার ঘটিয়াছে। ৭৬

সত্যের আমি দীন কিন্তু অকপট সন্ধানী। সন্ধান করিতে গিয়া আমি, আমার মতো সন্ধানীদের সকলকেই সব কথা খুলিয়া বলি, যাহাতে ভুল-ভ্রান্তি জানিতে পারি ও তাহা সংশোধন করিতে পারি। স্বীকার করি যে আমি আমার মূল্যায়নে ও বিচারে ভুল করিয়াছি।... এবং যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমি পিছু হটিয়া আবার ঠিক পথে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেজন্য স্থায়ী ক্ষতি কিছু হয় নাই। বরং অহিংসার মধ্যে যে মূল সত্য আছে তাহা পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং কোনোমতেই দেশের স্থায়ী ক্ষতি কিছু হয় নাই। ৭৭

আমি সত্যের মধ্যে ও সত্যের মাধ্যমে সুন্দরকে খুঁজিয়া পাই। সমস্ত সত্যই, শুধু সত্য ধারণা নয়— সত্যপরায়ণ মুখ, সত্যপরায়ণ ছবি, ও গান— খুবই সুন্দর। সাধারণতঃ লোকে সত্যে সুন্দর কিছু দেখিতে পায় না। সাধারণ লোকে সত্য হইতে ছুটিয়া পালায়, তাহার মধ্যে যে-সৌন্দর্য আছে সে বিষয়ে তাহারা অন্ধ। মানুষ যখন সত্যের মাঝে সুন্দরকে দেখিতে আরম্ভ করিবে তখন প্রকৃত শিল্পের সৃষ্টি হইবে। ৭৮

প্রকৃত শিল্পীর নিকট সেই মুখই সুন্দর, যাহা বাহিরে যেমন হউক, অন্তরে সত্যের আলোক উজ্জ্বল। সত্য ছাড়া... সুন্দর নাই। অন্য পক্ষে, সত্য এমন সব রূপে দেখা দিতে পারে বাহির হইতে যাহা আদৌ সুন্দর নহে। আমরা শুনি, সক্রেটিসের সময়ে তিনি ছিলেন সব চেয়ে সত্যপরায়ণ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার চেহারা নাকি গ্রীসে সর্বাপেক্ষা কুৎসিত ছিল। আমার মনে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে, কারণ সারা জীবন তিনি সত্যের সাধনা করিয়াছেন; এবং আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে শিল্পী হিসাবে ফিডিয়াস বাহিরের রূপ ও সৌন্দর্য দেখিতে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সক্রেটিসের বাহিরের রূপের অন্তরালে সত্যের যে-সৌন্দর্যমূর্তি বিরাজমান তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। ৭৯

কিন্তু যতক্ষণ এই ভঙ্গুর দেহে বন্দী হইয়া আছি ততক্ষণ পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা শুধু কল্পনার দৃষ্টিতেই তাহা দেখিতে পারি। এই ক্ষণস্থায়ী দেহের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সত্যের

সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি না। তাই শেষ পর্যন্ত মানুষকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেই হয়। ৮০

আমার মধ্যে একান্তভাবে দিব্য কিছু আছে বলিয়া আমি দাবি করি না, ভগবানের প্রেরিত বলিয়া আমি দাবি করি না। আমি শুধু একজন দীন সত্যান্বেষী, সত্যকে পাইবার জন্য আগ্রহশীল। ভগবানকে সাক্ষাৎ-দর্শনের জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকারকেই আমি বেশি মনে করি না। আমার সমস্ত কর্ম— সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবপ্রেমিক, বা নৈতিক, যে নামই দেওয়া হউক— সেই লক্ষ্যের অভিমুখী। এবং যেহেতু আমি জানি যে, পদস্থ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ততটা নয়, দীনতম প্রাণীদের মধ্যেই ভগবানের বেশি প্রকাশ— আমি তাহাদের সমপর্যায়ে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছি। তাহাদের সেবা না করিয়া তাহা সম্ভব নয়। অবদমিত শ্রেণীর সেবায় তাই আমার অনুরাগ। রাজনীতিতে প্রবেশ না করিয়া এই সেবা সম্ভব নয় বলিয়া আমি রাজনীতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখা যাইতেছে, আমি প্রভু নই। ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া সমগ্র মানব-সমাজের একজন সক্রিয়, ভ্রমশীল, দীন সেবকমাত্র। ৮১

সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতা অপেক্ষা উচ্চ কোনো ধর্ম নাই। ৮২

প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত নীতি পরস্পর অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। মাটিতে যে বীজ বপন করা হইয়াছে তাহার সহিত জলের যে সম্পর্ক, ধর্মের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক ঠিক যেন সেইরূপ। ৮৩

যে-ধর্মমত যুক্তিসহ নয় এবং নীতিবিরোধী, সে-ধর্মমত আমি বর্জন করি। ধর্মমতের অযৌক্তিক ভাবপ্রবণতা ততক্ষণ সহ্য করি যতক্ষণ তাহা দুর্নীতি-প্রবণ নহে। ৮৪

যে মুহূর্তে নৈতিক ভিত্তি হারাই, সেই মুহূর্তে ধর্ম হইতে বিচ্যুত হই। নীতিকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম বলিয়া কিছু নাই। মানুষ মিথ্যাপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অসংযত হইয়া থাকিবে অথচ ভগবান তাহার পক্ষে বলিয়া দাবি করিবে, এমনটা হইতে পারিবে না। ৮৫

আমাদের কামনা-বাসনা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে— স্বার্থানুগ ও নিঃস্বার্থ। স্বার্থানুগ কামনামাত্রই দুর্নীতিগ্রস্ত, অন্যের হিতকল্পে

নিজের উন্নতির বাসনা প্রকৃতই নিঃস্বার্থ। সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক বিধান হইল এই যে, আমরা যেন অক্লান্তভাবে মানবের হিতের জন্য কাজ করিয়া যাই। ৮৬

আধ্যাত্মিকতার দাবি রাখে আমার এমন কোনো কাজ যদি কর্মক্ষেত্রে অচল হয়, তবে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমি বিশ্বাস করি, যে-কাজ প্রকৃত অর্থে সবচেয়ে কাজের তাহাই যথার্থ আধ্যাত্মিক। ৮৭

শাস্ত্র যুক্তি ও সত্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহার উদ্দেশ্য হইল, যুক্তিকে শুদ্ধ করা, সত্যকে আলোকিত করা। ৮৮

জগতের সকল শাস্ত্রের সমর্থন পাইলেও ভ্রমের ক্ষমা নাই। ৮৯

বহুমুখে প্রচারিত হইলেও ভ্রম কখনো সত্য হয় না, আর কেহ দেখিল না বলিয়াই সত্য কখনো ভুল হয় না। ৯০

যাহা-কিছু প্রাচীন তাহা প্রাচীন বলিয়াই যে ভালো, আমি এরূপ মনে করি না। প্রাচীন ঐতিহ্যের সম্মুখে ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিসর্জন দেওয়ার আমি পক্ষপাতী নই। নৈতিক আদর্শের সহিত অসংগতি থাকিলে যে-কোনো ঐতিহ্য, তাহা যতই প্রাচীন হউক, দেশ হইতে নির্বাসিত হওয়া উচিত। অস্পৃশ্যতাকে প্রাচীন ঐতিহ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, বালবৈধব্য ও বাল্যবিবাহ প্রাচীন ঐতিহ্য মনে হইতে পারে, সেইমত বহু প্রাচীন ভয়াবহ বিশ্বাস ও কুসংস্কার-জনিত প্রথা ধরা যাইতে পারে। আমার শক্তি থাকিলে এ-সব আমি ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতাম। ৯১

মূর্তিপূজায় আমি অবিশ্বাস করি না। তবে মূর্তি আমার মনে কোনো ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জাগায় না। কিন্তু আমি মনে করি যে মূর্তিপূজা মানব-প্রকৃতির একটা অংশ। আমরা প্রতীকের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। ৯২

প্রার্থনায় মূর্তির ব্যবহার আমি নিষেধ করি না। আমি অরূপের পূজাই শুধু পছন্দ করি। এই পছন্দ করাটা হয়তো অনুচিত। একটা জিনিস একজনের পছন্দ, আর-একটা জিনিস আর-একজনের পছন্দ। দুইজনের পছন্দের কোনো তুলনা হইতে পারে না। ৯৩

আমি ক্রমে বোধ করিতেছি যে মানুষের মতো শব্দের অর্থেরও স্তরে স্তরে বিবর্তন হইয়াছে। যেমন, সবচেয়ে সমৃদ্ধ শব্দ— ভগবান— তাহার অর্থও আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এক নয়। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা অনুসারে তাহাদের পরিবর্তন হইবে। ৯৪

আমার জীবনে আমি পরস্পর-বিরোধিতা বা বুদ্ধিভ্রংশতার চিহ্ন দেখি না। সত্য বটে, মানুষ যেমন তাহার পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পায় না, তেমনি তাহার ভুলভ্রান্তি বা বুদ্ধিভ্রংশতার চিহ্নও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ঋষিরা ধর্ম-প্রাণ লোককে অনেক সময় উন্মাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং আমি এই বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকি যে আমি হয়তো পাগল নই, হয়তো প্রকৃতই ধর্মপ্রাণ। আমি যে সত্য সত্য দুইয়ের মধ্যে কোনটি, তাহার মীমাংসা আমার মৃত্যুর পরেই শুধু হইতে পারে। ৯৫

যখনই আমি কোনো মানুষকে ভুল করিতে দেখি তখন মনে মনে বলি, আমিও তো ভুল করিয়াছি; যখন কোনো কামাসক্ত ব্যক্তিকে দেখি তখন ভাবি, আমিও একসময় তাহার মতো ছিলাম; এবং এইভাবে জগতে প্রত্যেকের সঙ্গে আমি আত্মীয়তা বোধ করি এবং অনুভব করি যে আমাদের মধ্যে দীনতম ব্যক্তি সুখী না হওয়া পর্যন্ত আমি সুখী হইতে পারি না। ৯৬

কাহাকেও তাহার প্রাপ্যের চেয়ে কম দিলে আমার ভগবানের নিকট, আমার স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে, কিন্তু আমি এ-কথাও নিশ্চয় করিয়া জানি যে তিনি যদি জানিতে পারেন কাহাকেও তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি দিয়াছি তাহা হইলে আমাকে আশীর্বাদ করিবেন। ৯৭

অবিরাম কর্মের মধ্যে আমার জীবন আনন্দময়। কাল আমার কি হইবে এই চিন্তা করিতে চাহি না বলিয়া নিজেকে পাখির মতো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ বলিয়া মনে হয়।... ইন্দ্রিয়ের চাহিদার বিরুদ্ধে আমি যে অবিশ্রান্ত ও অকপট সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছি এই চিন্তা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ৯৮

আমি প্রাণীজগতে যে-শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার ত্রুটি সম্বন্ধে খুবই সজাগ বলিয়া তাহার কোনো সভ্যের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ বা বিরক্তি নাই।

আমার প্রতিকার হইল অন্যায় দেখিলেই তাহার প্রতিবিধান করা, অন্যায়-কারীর ক্ষতি করা নয়— ঠিক যেমন আমি সর্বদা যে-সব অন্যায় করি তাহার জন্য কেহ আমার ক্ষতি করুক ইহা চাহি না। ৯৯

আমি আশাবাদীই থাকিয়া গিয়াছি, ন্যায়ের জয় হইবেই ইহার কোনো প্রমাণ দিতে পারি বলিয়া নয়, কিন্তু পরিণামে ন্যায়ের জয় হইবেই এ-বিষয়ে আমার অকুণ্ঠ বিশ্বাস আছে বলিয়া।... অবশেষে ন্যায়ের জয় হইবেই এই বিশ্বাস থাকিলে তবেই তো আমরা কর্মে প্রেরণা পাইব। ১০০

ব্যক্তির ক্ষমতার একটা সীমা আছে। যে-মুহূর্তে সে সব কাজ করিতে পারে বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, তখনই ভগবান তাহার দর্প খর্ব করেন। আমার তো মাতৃস্তন্য-নির্ভর শিশুদের নিকট পর্যন্ত সহায়তা চাহিবার মতো যথেষ্ট দৈন্য আছে। ১০১

সমুদ্রের মধ্যে যে বিন্দু, তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে সে পিতৃগৌরবের অধিকারী। কিন্তু সমুদ্র হইতে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতে গেলেই সে শুকাইয়া যায়। জীবন জলবুদ্বুদ, এই কথাটা যে আমরা বলি তাহাতে কোনো অত্যুক্তি নাই। ১০২

আমি অদম্য আশাবাদী, কারণ আমার আত্মবিশ্বাস আছে। কথাটায় কি খুব ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়? কিন্তু আমি গভীর বিনয়ের সঙ্গেই এ-কথা বলি। ভগবানের পরমশক্তিতে আমি বিশ্বাসী। আমি সত্যে বিশ্বাস করি, সুতরাং এই দেশের গৌরবময় ভবিষ্যতে অথবা মানবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। ১০৩

কারাগৃহের ধর্ম আমার ধর্ম নয়। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যাহা সামান্যতম, আমার ধর্মে তাহারও স্থান আছে। কিন্তু ইহা ঔদ্ধত্য অথবা জাতি ধর্ম ও বর্ণ লইয়া গৌরবের প্রতিরোধক। ১০৪

পৃথিবীতে এক ধর্ম হইবে বা হইতে পারে এমন বিশ্বাস আমার নাই। তাই আমার চেষ্টা, সমন্বয় সাধন করিয়া পরস্পরের মধ্যে উদারতা বা সহিষ্ণুতার সঞ্চার করা। ১০৫

আমার মত হইল, আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় পৌঁছিবার জন্য চিন্তায়, বাক্যে,

কর্মে পূর্ণ সংযম আনা চাই। যে-জাতির মধ্যে এরূপ লোক নাই, সে-জাতি এই অভাবে পরম দরিদ্র। ১০৬

ভগবানের দৃষ্টিতে পাপী ও সাধু সমান। উভয়েই সমান বিচার পাইবে, উভয়েই সম্মুখে বা পিছনে যাইবার সমান সুযোগ পাইবে। উভয়েই তাঁহার সন্তান, তাঁহার সৃষ্টি। যে-সাধু নিজেকে পাপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তাহার সাধুত্ব চলিয়া যায়, পাপী অপেক্ষাও সে অধম। পাপী দর্পিত সাধুর মতো নয়, কেননা নিজে যে কি করিতেছে তাহা সে জানে না। ১০৭

আমরা প্রায়ই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পরস্পর মিশাইয়া গণ্ডগোল করিয়া ফেলি। আধ্যাত্মিকতা শাস্ত্রজ্ঞানের উপর, দার্শনিক তত্ত্বালোচনার উপর নির্ভর করে না। উহা হৃদয়-সংস্কৃতির ব্যাপার, উহার শক্তির পরিমাপ করা যায় না। অভয় হইল আধ্যাত্মিকতার প্রথম আবশ্যক গুণ। যাহারা ভীরু তাহাদের কখনো নৈতিক উন্নতি নাই। ১০৮

ভগবানের সৃষ্টিতে সকলের কল্যাণ হউক, মানুষের প্রাণে-মনে এইরূপ ইচ্ছা হওয়া উচিত, তাহার প্রার্থনা হওয়া উচিত যেন এরূপ কল্যাণকর্ম করিবার শক্তি তাহার থাকে। সকলের মঙ্গল কামনায়ই তাহার মঙ্গল। যে শুধু তাহার নিজের অথবা তাহার সম্প্রদায়ের কল্যাণ চায় সে তো স্বার্থপর, তাহার কখনো ভালো হইতে পারে না।... মানুষ যাহা ভালো বলিয়া মনে করে এবং যাহা তাহার পক্ষে প্রকৃত ভালো, এই উভয়ের মধ্যে বিচার করা মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ১০৯

আমি ভগবানের শুদ্ধ অদ্বৈত রূপে এবং সেই কারণে মানুষের অদ্বৈত রূপে বিশ্বাসী। আমাদের শরীর বহু, তাহাতে কি আসে যায়? আমাদের আত্মা তো একটি মাত্র। প্রতিসরণের ফলে সূর্যের আলো বহুধা-বিচ্ছুরিত হয়, কিন্তু তাহাদের মূল তো একই। সেই কারণে আমি দুষ্টতম লোক হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না, ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেও পারিব না। ১১০

যদি আমি সর্বময় কর্তা হইতাম, তবে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক হইয়া থাকিত। ধর্মের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, তাহার জন্য প্রাণ দিব, কিন্তু তাহা হইল আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক

নাই। পার্থিব কল্যাণ, স্বাস্থ্য, পথঘাট, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা, প্রভৃতি হইল রাষ্ট্রের ব্যাপার; আপনার আমার ধর্ম রাষ্ট্রের ব্যাপার নয়, তাহা হইল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ১১১

আমার চার দিকে অত্যুক্তি, অসত্য। সত্যের সন্ধানে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, তথাপি সত্য কোথায় জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ভগবানের ও সত্যের আর একটু নিকটে আসিয়াছি। পুরাতন বন্ধুত্বগুলি গিয়াছে বটে, কিন্তু সেজন্য আমি দুঃখিত নই। আমি যে একটুও চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা বোধ না করিয়া প্রত্যেকের সঙ্গে প্রবলতম বিরোধিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্পষ্ট ভাষায় ও নির্ভয়ে গোপন বিষয়ে লেখায় ও কথায় আলোচনা করিতে পারি, এবং যে-একাদশ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহা সর্বতোভাবে পালন করিতে পারি, এই লক্ষণ দেখিয়াই আমি বলিতে পারি যে আমি ভগবানের একটু নিকটে আসিয়াছি। আমি সর্বদা সত্য ও পবিত্রতার যে-আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছি, যাট বৎসরের চেষ্টায় অবশেষে আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ১১২

আমরা এইটুকু জানি যে মানুষ তাহার কর্তব্য করিয়া যাইবে, ফলাফল ভগবানের হাতে। লোকে বলে মানুষ বুঝি তাহার ভাগ্যকে গড়িতে পারে, কিন্তু এ-কথা আংশিক সত্য। সে তাহার ভাগ্য ততটুকু গড়িতে পারে যতটুকু সেই মহাশক্তি তাহাকে গড়িতে দেন যে-মহাশক্তি আমাদের সকল সংকল্পের উপরে, আমাদের সকল পরিকল্পনা তছনছ করিয়া যিনি নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া যান। সেই শক্তিকে আমি আল্লাহ্, খোদা বা ঈশ্বর নামে ডাকি না, কারণ সেই শক্তির নাম সত্য। এক-মাত্র সেই মহাশক্তির অন্তরাশ্রিত সত্যের মধ্যে সত্যের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত। ১১৩

ভগবানের নামে নির্দোষের উপর অত্যাচারের অপেক্ষা মহাপাপ আর কিছু আমার জানা নাই। ১১৪

একপক্ষে আমার ত্রুটিবিচ্যুতির কথা এবং অন্যপক্ষে আমার সম্বন্ধে যে-সব আশা পোষণ করা হয় তাহাদের কথা যখন ভাবি, আমি ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া যাই। কিন্তু যখন আমি বুঝিতে পারি যে সে-সকল আশা আমার প্রশস্তি নহে— আমি তো জেকিল ও হাইডের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ— সত্য ও অহিংসা এই দুই অমূল্য গুণ আমার মধ্যে যে-রূপ

লাভ করিয়াছে, তা সে-রূপ যতই অসম্পূর্ণ হউক, উহা তাহারই প্রশস্তি, তখন আমি প্রকৃতিস্থ হই। ১১৫

দেশের জন্য ত্যাগ করিতে পারিব না, পৃথিবীতে এমন কিছু নাই, অবশ্য দুইটি জিনিস বাদে, শুধু দুইটি জিনিস— সত্য ও অহিংসা। সমগ্র জগতের বিনিময়েও ঐ দুইটি ত্যাগ করিতে পারিব না। কারণ আমার নিকটে সত্যই ধর্ম, এবং অহিংসার পথ ভিন্ন সত্যকে পাওয়া যায় না। সত্য বা ভগবানকে বিসর্জন দিয়া ভারতবর্ষের সেবা করিতে চাই না। কারণ আমি জানি যে সত্যকে যে ত্যাগ করে সে তাহার দেশকে— তাহার নিকটতম আত্মীয়পরিজনকেও— ত্যাগ করিতে পারে। ১১৬

সাধ্য ও সাধন

আমার জীবনদর্শনে সাধ্য ও সাধন এই দুইটি শব্দ পরস্পরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে— যাহা সাধ্য তাহাই সাধন, যাহা সাধন তাহাই সাধ্য। ১

লোকে বলে 'সাধন তো উপায়মাত্র।' আমি বলিতে চাই, 'সাধনই তো সব।' যেমন সাধন তেমনি সিদ্ধি। সাধন ও সিদ্ধির মধ্যে এমন কোনো প্রাচীর নাই যাহা পরস্পরকে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। জগৎস্রষ্টা আমাদের সাধনের উপর অধিকার (তাহাও খুবই সীমিত) দিয়াছেন, সাধ্য বা সিদ্ধির উপর দেন নাই। সাধন যতটা বাস্তব হইবে ঠিক সেই পরিমাণে সিদ্ধিও বাস্তব হইবে। ইহা এমন একটি কথা যাহার কোনো ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ২

অহিংসা ও সত্য এমনভাবে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের জট খুলিয়া পৃথক করা কার্যত অসম্ভব। তাহারা যেন একটি মুদ্রার দুইটা দিক, অথবা মসৃণ মুদ্রণবিহীন গোলাকার ধাতব পদার্থের দুইটা দিক। কে বলিতে পারে, এই দিক্‌টা সোজা, ঐ দিকটা উলটা? তাহা হইলেও, অহিংসাই তো সাধন, সত্য হইল সাধ্য। সাধন যদি সাধনের মতো হয়, তবে তাহা সর্বদাই আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসিবে, সুতরাং অহিংসা হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। যদি আমরা সাধন সম্বন্ধে অবহিত হই, তবে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, লক্ষ্যস্থানে অর্থাৎ সাধ্যে পৌঁছিবই। এই কথাটা একবার বুঝিতে পারিলেই পরিণামে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। যেরূপ কঠিন অবস্থায় পড়ি না কেন, আপাতত যে-সব পরাজয়ের মধ্য দিয়া যাই না কেন, সত্যের সন্ধান আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, সত্যই যে স্বয়ং ভগবৎসত্তা। ৩

হিংসার পথে দ্রুত সিদ্ধিলাভ হয় এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।... সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি আমার যতই সহানুভূতি থাকুক এবং আমি যতই তাহার গুণগ্রাহী হই, শ্রেষ্ঠ কর্মের সিদ্ধির জন্যও হিংসার প্রণালীর আমি দৃঢ় বিরোধী, সেখানে কোনো আপস করিতে পারি না। সুতরাং হিংসাবাদী ও আমার মধ্যে পরস্পরের মিলনক্ষেত্র বাস্তবিক কোথাও নাই। কিন্তু আমার অহিংসাবাদ আমাকে অব্যাহতি দেয় না, বরং যাহারা নৈরাজ্যবাদী

ও হিংসার পথে বিশ্বাসী তাহাদের সঙ্গে মিশিতে আমাকে বাধ্য করে। কিন্তু এই মেশামিশির একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে এই যে, যাহা আমার নিকট তাহাদের ভ্রম বলিয়া মনে হয় সেই ভ্রম হইতে তাহাদের সরানো। কারণ অভিজ্ঞতার ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অসত্য ও হিংসার ফলে স্থায়ী মঙ্গল কখনো সাধিত হইতে পারে না। আমার এই বিশ্বাস যদি মনগড়া ধারণাও হয়, এই ধারণার যে মোহিনী শক্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে। ৪

সাধ্য ও সাধনার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই বলিয়া তোমাদের যে বিশ্বাস, সে একটা মস্ত ভুল। সেই ভুলের বশে ধার্মিক বলিয়া গণ্য ব্যক্তিরাও গুরুতর পাপ করিয়াছে। বিষলতা রোপণ করিয়া গোলাপ ফুল পাওয়া যায়, এমন ধারা তোমাদের যুক্তি। যদি সমুদ্র পার হইতে যাই, তবে শুধু তরণীর সাহায্যেই তাহা সম্ভব, সেজন্য গোযানের সাহায্য লইলে গোযান ও আমি উভয়েই তলাইয়া যাইব। 'যেমন দেবতা তেমনি পূজারী'— কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মতো। ইহার কদর্থ করিয়া লোকে বিপথে গিয়াছে। সাধন হইল বীজ, সাধ্য হইল বৃক্ষ; বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে যেমন, সাধ্য ও সাধনের মধ্যে তেমনি একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। শয়তানের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, আমি ভগবানকে পূজা করিবার ফল পাই না। সুতরাং যদি কেহ বলে, 'আমি ভগবানকে পূজা করিতে চাই, শয়তানের সাহায্যে যদি তাহা করি তবে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না,' তাহা হইলে অজ্ঞ ও মূর্খের কথা বলিয়া লোকে তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে। আমরা যেমন বীজ বপন করি তেমনি ফল লাভ করি। ৫

সমাজবাদ কথাটা সুন্দর; আর আমি যতদূর জানি, সমাজবাদে সমাজের সকল সদস্য সমান— কেহ নীচে নয়, কেহ উপরে নয়। মানুষের দেহে সকলের উপরে আছে বলিয়া মাথা যে উঁচু তাহা নয়, মাটি ছুঁইয়া আছে বলিয়াই পায়ের পাতা নীচুও নয়। ব্যক্তি-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সমান, সমাজের সদস্যরাও তেমনি। ইহাই সমাজবাদ।

ইহাতে রাজা ও কৃষক, ধনী ও দরিদ্র, প্রভু ও কর্মী, সকলেই সমান স্তরে অবস্থিত। ধর্মের সংজ্ঞা অনুসারে সমাজবাদে দ্বৈতবাদ নাই। সেখানে সবই অদ্বৈত। সমগ্র জগতের সমাজব্যবস্থা দেখিলে মনে হয় সেখানে দ্বৈত বা বহুত্ব ছাড়া আর কিছু নাই। একত্বের দর্শন মেলে না।... আমি যে একত্বের কথা ভাবি সেখানে বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে পূর্ণ একত্ব বিরাজমান।

এই অবস্থায় পৌঁছিতে গেলে দার্শনিকভাবে বিচার করিলে চলিবে না। এ-কথা বলিলে চলিবে না যে... সকলে মত পরিবর্তন করিয়া সমাজবাদী না হইলে আমাদের অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নাই! আমাদের জীবন-ধারার পরিবর্তন না করিয়া আমরা বক্তৃতা দিতে পারি, দল গঠন করিতে পারি এবং শিকারী পক্ষীর মতো শিকার হাতের কাছে আসিলে তাহা ছোঁ মারিয়া লইতে পারি। ইহা কিন্তু সমাজবাদ নহে। যতই ইহা শিকারের বস্তু বলিয়া মনে করিব ততই ইহা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

প্রথম যাহার হৃদয় পরিবর্তন হইল তাহাকে দিয়াই সমাজবাদের আরম্ভ। এমন কেহ থাকিলে তুমি তাহার সঙ্গে শূন্য জুড়িয়া দিতে পার; প্রথম শূন্য দশক হইবে, যতই যোগ করিবে ততই পূর্ববর্তী সংখ্যার দশগুণ হইবে। কিন্তু গোড়াতেই যদি শূন্য বসাইতে হয় অর্থাৎ সমাজবাদ আদপে আরম্ভই যদি না হয়, কেবল কতকগুলি শূন্য বসাইলে হরেদরে মূল্য শূন্য থাকিয়া যাইবে। শূন্য লিখিতে যে সময় ও কাগজ লাগিল তাহা নিতান্তই অপচয়।

এই সমাজবাদ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ও পবিত্র। তাই ইহাকে পাইতে হইলে স্ফটিকবৎ সাধন চাই। অপবিত্র সাধনের পরিণতি হয় অপবিত্র সিদ্ধি। তাই রাজার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া রাজা ও কৃষককে সমান করা যায় না, আর কাটিয়া ফেলার দ্বারা মালিক ও কর্মীকে সমান করা যায় না। অসত্যের দ্বারা সত্যে পৌঁছানো যায় না। সত্যাচরণের দ্বারাই সত্যে পৌঁছানো যায়। অহিংসা ও সত্য কি যমজ নহে? ইহার উত্তর দ্ব্যর্থহীন 'না'। অহিংসার আশ্রয় সত্যে, সত্যের আশ্রয় অহিংসাতে। সেইজন্যই বলা হয় ইহারা একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক করা যায় না। যে-দিক দিয়াই পড়ো, মুদ্রার কথাগুলি ভিন্ন হইবে, কিন্তু মূল্য একই থাকিবে। পূর্ণ পবিত্রতা না থাকিলে এই সুখকর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেহে-মনে অশুচিতা পুষিয়া রাখো, তোমার মধ্যে অসত্য ও হিংসা প্রবেশ করিবে।

সুতরাং শুধু সত্যপরায়ণ, অহিংস, পবিত্রহৃদয় সমাজবাদীরাই ভারত-বর্ষে ও জগতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে। ৬

আত্মশুদ্ধি এমন এক আধ্যাত্মিক অস্ত্র, যাহা ধরা-ছোঁওয়া যায় না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাহিরের শৃঙ্খল আল্‌গা করিয়া পারিপার্শ্বিকের আমূল পরিবর্তন সাধনের ইহাই প্রবলতম উপায়। ইহার কাজ লোকের অগোচরে ও সূক্ষ্ম-ভাবে; ইহার ক্রিয়া তীব্র। যদিও অনেক সময় মনে হয় এ ক্রিয়া ক্লান্তিকর,

দীর্ঘকাল ধরিয়া চালাইতে হয়, কিন্তু মুক্তির ইহাই সরলতম নিশ্চিততম ও দ্রুততম পথ। এজন্য কোনো চেষ্টাই অত্যধিক বা বাড়াবাড়ি নয়। ইহার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল বিশ্বাস— অনমনীয় পর্বতপ্রমাণ বিশ্বাস, যাহা কোনো কিছুতেই টলে না। ৭

মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহাতে পশুভাব প্রবল না হয় সেজন্যই আমার বেশি চিন্তা, আমার দেশবাসীর দুঃখকষ্ট প্রতিরোধের চেয়েও তাহা বেশি। আমি জানি, যাহারা স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করে তাহারা নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতিকেও উন্নত করে; কিন্তু আমি ইহাও জানি, যাহারা বিরোধী পক্ষকে পরাভূত করিবার অথবা দুর্বলতর মানুষ বা দুর্বলতর জাতিকে শোষণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজেদের পশুর স্তরে নামাইয়া আনে, তাহারা নিজেদেরই শুধু নামায় না, মানবজাতিকেও নামায়। মানবপ্রকৃতিকে পঙ্কে নিমগ্ন করা হইয়াছে, ইহা দেখিতে আমার বা অন্য কাহারো ভালো লাগিতে পারে না। যদি আমরা সকলেই সেই একই ভগবানের সন্তান হই, একই ভাগবত প্রকৃতির অধিকারী হই, তাহা হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাপের ভাগীও হইব, তা সেই ব্যক্তি আমাদের জাতির হউক কি অন্য জাতির হউক। অতএব কোনো মানুষের মধ্যে, বিশেষ করিয়া যে-ইংরেজদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন, তাহাদের মধ্যে, পশুভাবকে জাগানো আমার যে কত বিশ্রী লাগিবে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ৮

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ সব চেয়ে পরিষ্কার, সব চেয়ে নিরাপদ, কারণ উদ্দেশ্য যথার্থ না হইলে যাহারা প্রতিরোধ করে, তাহারাই শুধু দুঃখবরণ করে। ৯

অহিংসা

মানুষের আয়ত্তে যত শক্তি আছে তাহাদের মধ্যে প্রবলতম হইল অহিংসার শক্তি। মানুষের বুদ্ধিকৌশল যত কিছু মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা এই অস্ত্রের শক্তি অধিক। বিনাশ মানবের ধর্ম নয়। মানুষ বরং সাগ্রহে ভাইয়ের হাতে মৃত্যুবরণ করিবে তবু তাহাকে বধ করিয়া বাঁচিতে চাহিবে না। প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড বা অন্যের উপর আঘাত, তাহা যে কারণেই হউক, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। ১

জীবনের প্রতি কাজে প্রতি অবস্থায় ন্যায়বিচার করাই অহিংসার প্রথম সোপান। মনুষ্যচরিত্রের কাছে হয়তো এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু আমি তাহা অসম্ভব মনে করি না। মানুষের স্বভাবের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্বন্ধে কোনো ছকে-বাঁধা সিদ্ধান্তে আসা কাহারো উচিত নয়। ২

যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সময়ে যেমন মারণাস্ত্র প্রয়োগের বিধি শিখিতে হয়, অহিংস থাকিবার শিক্ষায় তেমনি মরিতে শিখিতে হয়। হিংসার পথ মানুষকে ভয় হইতে মুক্ত করে না, ভয়ের কারণকে হটাইবার কৌশল খোঁজে। অপরপক্ষে অহিংসার পথে ভয় বলিয়া কিছু নাই। অহিংসার পূজারীকে ভয়মুক্ত থাকিবার উদ্দেশ্যে সর্বদা চরম আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। জমিজমা, টাকাকড়ি এবং প্রাণ পর্যন্ত গেলেও তিনি গ্রাহ্য করিবেন না। সম্পূর্ণভাবে ভয়বিবর্জিত না হইলে পুরাপুরি অহিংসা পালন করা যায় না। অহিংসার সাধক কেবল একটি-মাত্র ভয়কে জানেন— তাহা হইল ঈশ্বরের ভয়। ঈশ্বরের শরণ যিনি লইতে চাহেন তাঁহার দেহাতীত 'আত্মা'র বিষয়ে চেতনা ক্ষণেকের জন্যও থাকা দরকার। পলকের জন্যও সেই অবিনশ্বর আত্মার উপলব্ধি হইলে এই নশ্বর দেহের প্রতি আসক্তি চলিয়া যায়। বলপ্রয়োগ অথবা হিংসার শিক্ষা তাই অহিংসার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিংসার প্রয়োজন হয় পার্থিব সম্পত্তি রক্ষার জন্য; অহিংসার প্রয়োজন আত্মার জন্য, নিজের সম্মান রক্ষার জন্য। ৩

যাহারা আমাদের ভালোবাসে শুধু তাহাদের ভালোবাসিলে অহিংসা হয় না। যাহারা আমাদের ভালোবাসে না, ঘৃণা করে, তাহাদিগকে ভালোবাসাই

অহিংসা। আমি জানি, প্রেমের এই উদার নীতি পালন করা কত কঠিন। কিন্তু সব-কিছু মহৎ ও বড় কাজই কি কষ্টসাধ্য নয়? শত্রুকে ভালোবাসা সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু যদি আমাদের প্রকৃত ইচ্ছা থাকে তবে কঠিনতম কাজও ঈশ্বরের দয়ায় সহজ হইয়া যায়। ৪

আমি দেখিয়াছি সংহারের মধ্যেও জীবনধারা অব্যাহত থাকে, তবে নিশ্চয় সংহার অপেক্ষা বড় কোনো বিধি আছে। তাই তো বিধিবদ্ধ সমাজের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাই তো জীবন উপভোগ্য মনে হয়। জীবনের রীতি যদি এই হয়, তবে প্রতিদিনের কর্মে আমাদের এই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। যখনই কোনো কিছু বেসুরা বাজিবে, বিরোধ আসিবে, প্রেম দিয়া বিরুদ্ধবাদীকে জয় করিতে হইবে। মোটামুটি এই নিয়ম আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার সব-কিছুরই যে সমাধান মিলিয়াছে তাহা নয়, তবে হানাহানি অপেক্ষা ভালোবাসার পথে অনেক বেশি ফল পাইয়াছি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমার যে রাগ হয় না এ-কথা সত্য নয়, তবে প্রায় সর্বদাই আমি ক্রোধ দমন করিতে পারি। ফলে, আর যাহাই হউক, আমি নিজের মধ্যে জ্ঞাতসারে অহিংসার সাধনার অবিরাম এক দৃঢ় প্রয়াসের পরিচয় পাই। এইরূপ সংগ্রামে মানুষ আরো শক্তিশালী হয়। এ-পথে যতই অগ্রসর হই হৃদয় আমার আনন্দে পূর্ণ হয়— বিশ্ব-পরিকল্পনার যে-রহস্য আমার কাছে ধরা পড়ে, যে-শান্তি আমি অনুভব করি, তাহা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। ৫

আমি দেখিয়াছি, ব্যক্তির মতো জাতিও গড়িয়া উঠিতে পারে কেবল ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মতো ক্লেশ সহ্য করিয়া। অন্য কোনো উপায়ে তাহা সম্ভব নয়। অপরকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পাওয়া যায় না, স্বেচ্ছায় কষ্টবরণ করিয়া লইলে আনন্দ লাভ করা যায়। ৬

ইতিহাসের দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, মানুষ ধীর পদক্ষেপে অহিংসার পথে আগাইয়া চলিয়াছে। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষ তো মানুষের মাংসও খাইত। তাহার পর এক সময় এই নরমাংস-ভোজন তাহাদের অসহ্য হইল, তাহারা পশু-শিকার আরম্ভ করিল— কালক্রমে এই যাযাবর শিকারীর জীবনেও তাহার লজ্জা আসিল। তখন কৃষিকাজ অবলম্বন করিল এবং আহারের জন্য জননী বসুন্ধরার শরণ লইল। এইভাবে যাযাবর জীবনের পর শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবন শুরু হইল। মানুষ গ্রাম-নগর পত্তন

করিল, ক্রমে পরিবারের একজন না থাকিয়া মানুষ সম্প্রদায়ের একজন, জাতির একজন হইল। এই সবই হিংসার ক্ষয় আর অহিংসার ক্রমোন্নতির পরিচয়। না হইলে নিম্নস্তরের বহু প্রাণীর অস্তিত্ব যেমন মুছিয়া গিয়াছে, মানুষও তেমনি এতদিনে লোপ পাইত।

ঋষিরা ও অবতারেরা, সকলেই কম-বেশি অহিংসার ধর্মই প্রচার করিয়াছেন, হিংসার পথ তাঁহারা কেহই শিক্ষা দেন নাই। না হইবেই বা কেন? হিংসা শিখাইতে হয় না— মানুষের মধ্যে যে-পশু আছে তাহা হিংস্র— তাহার আত্মা অহিংস। অন্তরস্থিত আত্মা সম্বন্ধে যেই সে সজাগ হয়, আর সে হিংসার পথে চলিতে পারে না— হয় অহিংসার পথে চলিবে, নতুবা বিনাশ অনিবার্য। সেজন্যই দ্রষ্টা যাঁহারা, অবতার যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই সত্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃপ্রেম, ন্যায়, প্রভৃতির শিক্ষা দিয়াছেন। সকলই অহিংসার গুণ। ৭

আমি মনে করি, সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে অহিংস নীতিকে মানিয়া না লইলেও দুনিয়াভর মানুষ যে বাঁচিয়া আছে ও নিজের অধিকার সংরক্ষণ করিতে পারিতেছে, তাহার মূলে আছে পরস্পরে নির্ভর ও সহনশীলতা। যদি তাহা না হইত তবে শুধু প্রবলতম মুষ্টিমেয় লোক বাঁচিয়া থাকিত। কিন্তু তাহা তো নয়। পরিবার প্রেমের ডোরে বাঁধা, তথাকথিত সভ্য সমাজ-বদ্ধ জাতিও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। কেবল তাহারা অহিংসা-নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না, ফলে অহিংসার বিপুল সম্ভাবনা তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখে না। বলিতে কি, নিছক বুদ্ধির জড়তার ফলে এতদিন পর্যন্ত আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, অল্পসংখ্যক যে-কয়জন লোক অপরিগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক সংযম পালনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ণ অহিংসা শুধু তাহাদেরই পক্ষে সম্ভব। যে-বিধি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সাধকেরাই সে-বিষয়ে গবেষণা করিতে পারেন ও সেই বিধানের বিপুল সম্ভাবনার কথা জগতে ঘোষণা করিতে পারেন সত্য, কিন্তু যাহা বিধান তাহা পালন করা সকলের পক্ষেই বিধি। ব্যর্থতা যাহা চোখে পড়ে তাহা সেই বিধানের নয়, যে বহুল ব্যর্থতা দেখা যায়, তাহার জন্য দায়ী অনুসরণ-কারীদের অজ্ঞতা। অনেকে জানেও না যে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তাহারা এই নিয়মের অধীন। মা যখন সন্তানের জন্য প্রাণ দেন তখন অজ্ঞাতসারে তিনি এই নিয়মই পালন করেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমি বলিতেছি যে ব্যর্থতা আসুক, তবু জানিয়া বুঝিয়া এই নীতি অনুসরণ করো। পঞ্চাশ বছরের কাজে আমি আশ্চর্য ফল পাইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমি জোর করিয়াই বলি, এমন দিন

আসিবে যখন সকল লোকে আপনা হইতে ন্যায়সংগত অধিকারকে শ্রদ্ধা করিবে; ন্যায়তঃ অর্জিত সম্পত্তি কলুষ-মুক্ত থাকিবে, চারি দিকে আজ যে-বৈষম্য দেখা যায় তাহারই এক রূঢ় নিদর্শন হইবে না। অহিংসার সাধকের চারি পাশে অন্যায় অবিচারের মালিকানা দেখিয়া ভয় পাওয়ার কারণ নাই। তাহার হাতে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের যে-অহিংস অস্ত্র আছে, যখনই তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিবে, জানিবে যে হিংসার ক্রিয়াকে সে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। অহিংসার পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান লোকের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছি এই দাবি আমি কখনোই করি না, কারণ ইহাকে ঠিক এইভাবে ব্যবহার করা যায় না। কোনো বিজ্ঞানই, এমন-কি গণিতের মতো সূক্ষ্ম বিজ্ঞানও, একেবারে বাঁধা-ধরা পথে চলে না। আমি তো শুধু সন্ধান করিয়া চলিয়াছি। ৮

সত্যাগ্রহ-প্রয়োগের আরম্ভেই আমি দেখিয়াছি যে সত্য অনুসরণ করিতে হইলে প্রতিপক্ষের উপর বল বা হিংসা প্রয়োগ চলে না, তাহাকে ভুল পথ হইতে সরাইয়া আনিতে হইলে চাই ধৈর্য ও সহানুভূতি। কারণ একের কাছে যাহা সত্য, অন্যের কাছে তাহাই হয়তো ভুল মনে হয়। আর ধৈর্য অর্থ নিজে দুঃখ বহন করা; তাই এই নীতিতে সত্যের পরীক্ষা হয় বিরোধীর উপর দুঃখ চাপাইয়া নহে, নিজে তাহা সহ্য করিয়া। ৯

বর্তমান অদ্ভুতকর্মের যুগে কোনো জিনিস নূতন বলিয়াই তাহা মন্দ এমন কথা কেহ বলিবে না। আবার দুঃসাধ্য বলিয়াই কোনো কাজকে অসম্ভব বলাও বর্তমান যুগের ধর্ম নয়। অসম্ভব সব ব্যাপার প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, স্বপ্নের অতীত জিনিস অহরহ দেখা যাইতেছে। যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রে নিত্য নূতন আবিষ্কারে আমরা নিয়তই বিস্মিত হইতেছি। কিন্তু আমি জোর করিয়াই বলিব, অহিংসার ক্ষেত্রে যে-সব আবিষ্কার হইবে তাহারা আরো বিস্ময়কর, আরো স্বপ্নের অগোচর। ১০

মানুষ আর তাহার কর্ম দুই স্বতন্ত্র জিনিস। কোনো একটা নীতিকে আক্রমণ করা, তাহার প্রতিরোধ করা দোষের নয়, কিন্তু সেই নীতির উদ্ভাবককে আক্রমণ করা নিজেকে আক্রমণ করা ও প্রতিরোধ করারই শামিল। কারণ, আমরা সকলেই এক সৃষ্টিকর্তার সন্তান, একই তুলিতে আঁকা, সেজন্য আমাদের মধ্যে অসীম ঐশী-শক্তি। একটিও মানুষের অবমাননা সেই সৃষ্টিকর্তারই অবমাননা, এবং এই অবমাননা ব্যক্তিবিশেষের শুধু হানি করে না, সমস্ত জগতেরই অনিষ্ট করে। ১১

অহিংসা সার্বজনীন নীতি, প্রতিকূল পরিবেশে ইহার প্রয়োগ বাধা পায় না; বরং প্রতিকূলতার মধ্যে, প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ইহার কার্যকারিতার যাচাই হয়। কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উপর যদি ইহার সাফল্য নির্ভর করিত তবে তো বলিব, নীতি হিসাবে ইহা অসার ও অকর্মণ্য। ১২

আত্মা দেহের অতীত এবং অবিনশ্বর এই কথা স্বীকার করাই অহিংসা-নীতির সফল প্রয়োগের একমাত্র শর্ত। সেই স্বীকৃতি বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলে চলিবে না, জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত হওয়া চাই। ১৩

কোনো কোনো বন্ধু বলেন, রাজনীতিতে এবং জাগতিক ব্যাপারে সত্য ও অহিংসার স্থান নাই। আমি তাহা মানি না। ব্যক্তির মুক্তি-সাধনার উদ্দেশ্যে ইহাদের প্রয়োগ করিতে আমি চাই না— দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের প্রয়োগই আমার জীবনব্যাপী সাধনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ১৪

যে-ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে অহিংসার সাধনা করেন, তিনি যেখানেই হউক না কেন, সামাজিক অন্যায়-অবিচার দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ১৫

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থায় নিজে দুঃখ-বরণ করিয়া ন্যায্য দাবি মিটাইতে পারা যায়; অস্ত্রের সাহায্য লওয়া ইহার ঠিক বিপরীত। যখন বিবেক-বিরুদ্ধ কোনো কাজ করিতে অস্বীকার করি তখন আমরা আত্মিক-শক্তি প্রয়োগ করি। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক : দেশের শাসনকর্তা একটা আইন করিয়াছেন, আমার একেবারেই সে-আইন পছন্দ নয় তবু আমাকে মানিতেই হইবে। আমি যদি বলপ্রয়োগে সরকারকে ঐ আইন রদ করিতে বাধ্য করি তবে তাহা হইবে শারীরিক বলে, কিন্তু আমি যদি আইনটি অমান্য করিয়া আইন-ভঙ্গের শাস্তি বহন করি, তবে তাহা হইবে আত্মিক-শক্তির প্রয়োগ। ইহার জন্য চাই আত্ম-বিসর্জন।

সকলেই স্বীকার করিবেন, অন্যকে কষ্ট না দিয়া নিজে কষ্ট সহ্য করা শতগুণে ভালো। কারণটা যদি অন্যায় অসংগত হয় তবে এ-ক্ষেত্রে শুধু যে করে সে-ই ফল ভোগে, আর পাঁচজনকে ভোগায় না। মানুষ তো এত কাল পর্যন্ত এমন অনেক কাজই করিয়াছে পরে যাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কেহ এ-কথা বলিতে পারে না যে সে যাহা করিতেছে তাহাই ধ্রুব, বা সে অন্যায় মনে করে বলিয়াই কোনো কাজ ভুল। তাহার পক্ষে কাজটি ততক্ষণই অন্যায় যতক্ষণ সে নিজের বিবেক-বুদ্ধিতে তাহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে। সেজন্য যতক্ষণ অন্যায় মনে হইবে কাজটি করা

চলিবে না, পরিণাম যাহাই হউক না কেন। আত্মিক শক্তি প্রয়োগের ইহাই হইল মূল কথা। ১৬

অহিংসার পূজারী হিতবাদ-নীতি— বৃহত্তম সংখ্যকের মহত্তম হিতসাধন নীতি— মানিতে পারে না। তাহার লক্ষ্য সকলের শ্রেষ্ঠতম হিতসাধন— সেই আদর্শের জন্য সে জীবন বিসর্জন করিবে। অন্যে যেন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সেজন্য সে নিজে মরিতে প্রস্তুত থাকিবে। নিজে মরিয়া সে শুধু নিজের কল্যাণ করে না, অন্যের উপকার করে। সকল মানবের হিতসাধন যাহার লক্ষ্য সে তো বৃহত্তমের হিতসাধনও করিতেছে— কর্ম-ক্ষেত্রে অনেক সময়েই হিতবাদ-পন্থীর সঙ্গে তাহার পথ মিলিত হইবে; কিন্তু এক সময় আসিবে যখন তাহাদের মতে মিলিবে না; এমন-কি, তাহারা বিপরীত পথে চলিবে। যে বৃহত্তমের হিতবাদ-নীতিতে বিশ্বাসী সে কখনো সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের পথে চলে না, কিন্তু পূর্ণ-মঙ্গলের নীতিতে বিশ্বাসী চিরদিনই নিজেকে বিসর্জন দিবে। ১৭

অবশ্য এমন কথা বলা হইতে পারে, বিপ্লব অহিংস হওয়া সম্ভব নয়; ইতিহাসে তাহার নজির নাই। নজির সৃষ্টি করি ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা— আর অহিংসার পথে ভারতের স্বাধীনতা আসিবে ইহা আমার স্বপ্ন। আমি বারংবার জগৎকে এ-কথাই বলিব, অহিংসার বিনিময়ে আমি ভারতের স্বাধীনতা কিনিতে চাই না। অহিংসা-নীতির সঙ্গে এমন ভাবে আমার গ্রন্থিবন্ধন হইয়াছে যে আমি বরং আত্মহত্যা করিব তবু আমার মত বদলাইব না। এই প্রসঙ্গে আমি সত্যের কথা আলাদা করিয়া উল্লেখ করি নাই, কেননা, সত্য না হইলে তো অহিংসার প্রয়োগই চলে না। ১৮

গত ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায়— ত্রিশের প্রথম আট বৎসর কাটিয়াছে দক্ষিণ-আফ্রিকায়— আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে অহিংসা অবলম্বন করিয়াই ভারতের তথা জগতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। নির্যাতিত পদদলিত মানবের প্রতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের অবসান ঘটাইবার পক্ষে এই নীতি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও কম ক্ষতিকারক। আমি তরুণ বয়সেই বুঝিয়াছিলাম যে অহিংসার সাধনা ব্যক্তিগত মুক্তি ও শান্তিলাভের জন্য নিভৃত সাধনার বস্তু নয়; আবহমান কাল হইতে মানুষ শান্তির জন্য, আত্মমর্যাদার জন্য যে-সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ও তাহার সফলতার জন্য অহিংসা একটি সামাজিক আচরণবিধি। ১৯

১৯০৬ সন পর্যন্ত আমি শুধু যুক্তি দ্বারা আবেদনের উপর নির্ভর করিয়াছি। আমি অনলস সংস্কারক; লেখায় আমার বেশ মুন্সিয়ানা ছিল। সত্যের সূক্ষ্ম বিচারের জন্য তথ্যগুলি ভালোরকম জানা প্রয়োজন— তাই তথ্যগুলি আমার নখদর্পণে থাকিত। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকায় দেখিলাম, সংকটের মুহূর্তে শুধু যুক্তির দ্বারা মনের উপর কোনো ছাপ ফেলিতে পারা গেল না। লোকেরা তখন উত্তেজিত— কেঁচোও সময় বিশেষে মাথা তোলে— তাহারা প্রতিশোধের কথা ভাবিতেছে। তখন আমার সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল— হিংসার পথে নিজেকে দলভুক্ত করা, অথবা অন্য কোনো পন্থায় সংকটের সম্মুখীন হইয়া দুর্গতির অবসান ঘটানো। আমি ভাবিলাম, অবমাননাকর আইন আমরা অমান্য করিব, ইচ্ছা হয় তো কর্তৃপক্ষ আমাদের কারারুদ্ধ করুন। এইভাবে যুদ্ধের পরিবর্তে নৈতিক প্রতিরোধের জন্ম হইল। আমি তখন রাজভক্ত; আমার তখনো বিশ্বাস ছিল, ইংরেজ-রাজত্ব ভারতের পক্ষে, শুধু ভারত কেন, সকল মানুষের পক্ষেই শুভকর। যুদ্ধের আরম্ভে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াই আমি মনেপ্রাণে এই যুদ্ধের ব্যাপারে ডুবিয়া গেলাম। প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় যখন বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিতে হইল, আমি নিজের স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া, বন্ধুদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া সৈন্য সংগ্রহের কাজে লাগিয়া গেলাম। ১৯১৯ সনে কালা রাউলাট আইনটি পাশ হওয়ার পর যখন দেখিলাম, সরকার আমাদের সামান্যতম দাবিও পূরণ করিলেন না, তখন আমার ভুল ভাঙিল। তাই ১৯২০ সনে আমি বিদ্রোহী হইলাম। তখন হইতে ক্রমে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি শুধু যুক্তিবলে অর্জন করা যায় না, দুঃখের মূল্যে কিনিতে হয়। দুঃখভোগ মানুষের ধর্ম, যুদ্ধ জঙ্গলের নীতি। শত্রুর হৃদয় জয় করিবার, তাহার বধির কানে মুক্তির বাণী পৌঁছাইয়া দিবার সমধিক ক্ষমতা আছে কারা-ক্লেশ-বরণের মধ্যে, জঙ্গলের নীতি অনুসরণের মধ্যে নয়। আমার মতো এত আবেদন-নিবেদনের খসড়া তৈয়ারি বোধহয় কেহ করে নাই, সর্বহারাদের এত প্রকার দাবিও বোধহয় কেহ সমর্থন করে নাই। আর এই পথে আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করিতে হইলে কেবল যুক্তির অবতারণা করিলে চলে না, হৃদয় জয় করিতে হয়। যুক্তির আবেদন বুদ্ধির কাছে, কিন্তু হৃদয়ের মর্ম স্পর্শ করা যায় সহন-শীলতার দ্বারা। এই পথেই মানুষের অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায়। সহনশীলতায় মানুষের পরিচয়, তরবারিতে নয়। ২০

বালক ও যুবা, পুরুষ ও নারী, অহিংসার শক্তি সকলেই প্রয়োগ করিতে

পারে, যদি সেই প্রেমময় ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস ও তারই ফলে সকল মানুষের প্রতি সমান ভালোবাসা থাকে। অহিংসাকে যদি জীবনের নীতি বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে তাহা শুধু বিশেষ কাজের মধ্যে নয়, সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করিয়া থাকিবে। ২১

আমরা যদি প্রকৃত অহিংস হই তবে জগতের ক্ষুদ্রতম মানুষটিও যে জাগতিক সুখসুবিধা হইতে বঞ্চিত তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব না। ২২

অহিংসার অর্থ হইল সর্বপ্রকার শোষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। ২৩

আমি যুদ্ধ-বিরোধী, তাই বলিয়া যাহারা যুদ্ধ করিতে চায় তাহাদিগকে ব্যাহত করা আমার ধর্ম নয়। আমি তাহাদের সঙ্গে বিচার করি, শ্রেষ্ঠতর পথ দেখাইয়া দিই, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তাহাদের নিজেদের উপর। ২৪

যুদ্ধে লিপ্ত থাকুক বা নাই থাকুক কেবল ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের জনগণ যে-দুঃখকষ্ট ভোট করিতেছে, আমার সংগে সংগে আমার সমালোচকেরাও তাহার ভাগ নিন— আমি তাহাদের এই কথাই বলি। পৃথিবীতে এই যে হানাহানি কাটাকাটি চলিতেছে, তাহা দেখিয়া আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পরস্পরের হত্যা মানুষের মর্যাদার হানিকর। ইহা হইতে বাহির হইবার পথ আছে তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। ২৫

যতদিন আমরা শরীর ধারণ করিয়া আছি ততদিন পূর্ণ অহিংসা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ স্বল্প হইলেও একটু স্থান তো আমাদের চাই— এজন্য দেহধারণকারীর পক্ষে পূর্ণ অহিংসা ইউক্লিডের বিন্দু বা সরল রেখার মতো তথ্যমাত্রই থাকিয়া যায়। কিন্তু জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের ঐ পথে চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। ২৬

প্রাণনাশ অনেক সময় কর্তব্য হইয়া পড়ে। দেহের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন-মতো জীব-ধ্বংস আমরা করিয়া থাকি, আহারের জন্য আমরা উদ্ভিদ প্রভৃতির জীবন বিনাশ করি, স্বাস্থ্যর জন্য মশা প্রভৃতিকে জীবাণু-নাশক দ্রব্যের সাহায্যে মারিয়া ফেলি— তাহাতে কোনো অধর্ম হয় বলিয়া মনে করি না... ক্ষুদ্র প্রাণী রক্ষার্থে হিংস্র মাংসাশী প্রাণীদের বধ করি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ মারাও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মনে করো,

একটি লোক পাগল হইয়া তরবারি হাতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই মারিতেছে, কেহ তাহাকে নিরস্ত করিতে সাহস করিতেছে না; তখন যদি কেহ সাহসে ভর করিয়া এই উন্মাদের প্রাণ নাশ করে, সে তো সমাজের হিতৈষী, মানবের উপকারী বলিয়া গণ্য হইবে। ২৭

যে-কোনো অবস্থায়ই, জীবহত্যার সম্বন্ধে মানুষের একটা সহজ বিভীষিকা আছে দেখিতে পাই। এমন-কি এমন কথা উঠিয়াছে, পাগলা কুকুরকেও না মারিয়া, কোনো জায়গায় বন্দী করিয়া রাখিয়া দিলে, ধীরে ধীরে সহজ মৃত্যু হইতে পারিবে। মমতা সম্বন্ধে আমার যে-মনোভাব তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থার সমর্থন করা অসম্ভব। কুকুর দূরে থাক্, ঐ ধরনের কোনো প্রাণী তিলে তিলে মৃত্যুযাতনা ভুগিতেছে এ-দৃশ্য আমি দেখিতে পারি না। তবে এইরূপ অবস্থায় মানুষকে যে আমি মারিয়া ফেলি না তাহার কারণ, তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবার মতো উৎকৃষ্ট উপায় আছে বলিয়া আমার আশা আছে। ঐ অবস্থায় কুকুরকে আমি মারিয়া ফেলিতে বলিব, কেননা তাহার আরোগ্যের আশা নাই। কোনো শিশুকে পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছে, অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করিতেছে, তাহার উপশমের কোনো সম্ভাবনা নাই, এরূপ দেখিলে আমি বলিব, তাহার মৃত্যু ঘটাইয়া যাতনার অবসান করাই কর্তব্য। অদৃষ্টবাদের একটা সীমা আছে, সকল প্রচেষ্টার অন্ত হইলে তবেই আমরা অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিই। এই ক্ষেত্রে তো একমাত্র এবং চরম উপায়, যন্ত্রণার উপশমের জন্য শিশুর জীবন লওয়া। ২৮

অহিংসার বাস্তব অর্থ— শ্রেষ্ঠতম ভালোবাসা, মহত্তম করুণা। আমি যদি অহিংসা পালন করিতে চাই তবে শত্রুকে ভালোবাসিতেই হইবে। আমাদের পিতা বা পুত্র যদি অন্যায় করেন তাহার বিচার যে-নিয়মে করিব, ঠিক সেই নিয়মেই অন্যায়কারী শত্রু বা অপরিচিত ব্যক্তিরও বিচার করিতে হইবে। এই সক্রিয় অহিংসার মধ্যেই আছে সত্য এবং অভয়। আমরা প্রিয়জনকে প্রবঞ্চনা করিতে পারি না, তাই তাহাকে ভয় করি না, তাহাকে ভয় দেখাইতেও পারি না। ভালোবাসার দানই শ্রেষ্ঠ দান— যে প্রকৃত ভালোবাসা দিতে পারে তাহার শত্রু নিরস্ত্র হইয়া পড়ে; সম্মানজনক মীমাংসার পথ তো তাহার পরিষ্কার হইয়া গেল। যে নিজেই ভয়ের অধীন, সে এই ভালোবাসা দানের অযোগ্য— কাজেই নির্ভয় হইতে হইবে। অহিংসা-পালনকারী কাপুরুষ হইতে পারে না— কারণ অহিংসার অনুশীলনে শ্রেষ্ঠতম সাহসের প্রয়োজন। ২৯

তরবারি যখন দূরে ফেলিয়া দিয়াছি তখন বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে প্রেম-পাত্র ছাড়া আর কি আমি ধরিয়া দিতে পারি? মানুষে মানুষে চিরন্তন শত্রুতা থাকিতে পারে এ-কথা আমি ভাবিতে পারি না। আমি জন্মান্তর মানি, তাই আমি বিশ্বাস করি, এ জন্মে না হউক কোনো জন্মান্তরে আমি সর্বমানবকেই প্রেমে ও প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গনে বাঁধিতে পারিব। ৩০

পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তাহার মধ্যে ভালোবাসার শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রবল, আবার কল্পনা যতদূর যায় তদপেক্ষাও মৃদু। ৩১

রাগদ্বেষ-বিমুক্ত সহনশীলতার সমক্ষে কঠিনতম হৃদয়ও গলে, চরম অজ্ঞতাও দূর হয়। ৩২

দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সংগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া থাকার অর্থ অহিংসা নয়। বরং আমি যাহাকে অহিংসা বলি তাহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আয়ুধ। প্রতিশোধ গ্রহণে দুরাচার বৃদ্ধিই পায়, তাহার অপেক্ষা ইহার শক্তি বহুগুণে অধিক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানসিক ও নৈতিক বিমুখতা— ইহাই আমার ধ্যানের বস্তু। অত্যাচারীর খড়্গ চিরদিনের মতো ভোঁতা করিয়া দিতে চাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নয়— অহিংসার বলে আমি যে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিব তাহা সে কোথায় পাইবে? সে বাধা আশঙ্কা করিবে, বাধা না পাইয়া নিরাশ হইবে। আত্মার শক্তিতে প্রথমে তাহার চমক লাগিবে, কিন্তু শেষে তাহাকে বাধ্য করিয়া স্বীকার করাইবে, অথচ সে-স্বীকৃতি তাহাকে অপমানিত করিবে না, উন্নত করিবে। এ-কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে ইহা এক আদর্শ অবস্থা। বাস্তবিক তাহাই বটে। ৩৩

অহিংসার নীতি ব্যাপক। হিংসার অনলে আমরা মানবেরা অসহায়ভাবে আশ্লিষ্ট। প্রাণের উপর প্রাণের নির্ভর, এই কথাটির একটা গূঢ় অর্থ আছে। মনে যাহাই হউক, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় কোনো-না-কোনো ভাবে, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, আমরা আচরণে হিংসা না করিয়া পারি না। খাওয়া, শোওয়া, বসা, চলাফেরা, সব-কিছুতে আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে জীবহিংসা করি। সেজন্য কার্যের কারণ যদি করুণামূলক হয়, যদি প্রাণপণে জীবহত্যা নিবারণ করিয়া জীবের রক্ষার জন্য অবিরাম প্রয়াস চলিতে থাকে, তবেই হিংসার নাগপাশ হইতে মুক্ত থাকা এবং অহিংসার সাধনা করা হয়। এভাবে সাধনার ফলে আত্মসংযম ও সর্বজীবে প্রেম

দিন-দিন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বাহিরের আচরণে পূর্ণ অহিংস হওয়া কাহারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

আবার দেখি, অন্তর্নিহিত অহিংসাই সমস্ত প্রাণকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; একের ভুলে অপরকে কষ্ট পাইতে হয়— কাজেই মানুষ সর্ব-প্রকার হিংসা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। সামাজিক জীবের পক্ষে বাঁচিতে হইলে হিংসাত্মক কাজে যোগ দিতেই হয়। যুদ্ধ বাধিলে অহিংসার পূজারী যুদ্ধ থামাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু যাহার সে-ক্ষমতা নাই, যুদ্ধ প্রতিরোধ করার যোগ্য গুণের অধিকারী যে নয়, সে যুদ্ধে যোগ দিতেও পারে— কিন্তু যুদ্ধে যোগ দিয়াও সে সর্বান্তঃকরণে নিজেকে তাহার দেশকে, এমন-কি দুনিয়াকে যুদ্ধ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। ৩৪

অহিংসার দিক হইতে বিবেচনা করিলে যুদ্ধ-পন্থী আর যুদ্ধ-বিরোধীর মধ্যে আমি কোনো প্রভেদ করি না। ডাকাতের দলে যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারবাহীর কাজ করে, বা ডাকাতেরা যখন আপন কার্য করিতে ব্যস্ত তাহাদের প্রহরীর কাজ করে, অথবা আহত দস্যুদের শুশ্রূষা করে, সেও দস্যুদের দোষের সমভাগী ও সহযোগী। সেইরূপ, যুদ্ধে আহত সৈনিকের শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় লিপ্ত ব্যক্তিও যুদ্ধজনিত পাপের ভাগ এড়াইতে পারে না। ৩৫

প্রশ্নটি জটিল ও সূক্ষ্ম। এ-বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে, সেজন্য যাঁহারা অহিংসায় বিশ্বাস করিয়া জীবনের সকল কাজে অহিংসার পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের কাছে আমি আমার যুক্তি বিশদ করিয়া বলিয়াছি। গতানুগতিক পন্থায় সত্য-সন্ধানী ব্যক্তি চলিতে পারে না। সে সর্বদাই সংশোধনের জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং কেহ ভুল দেখাইয়া দিলে তাহা স্বীকার করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করিবে। ৩৬

অহিংসার শক্তি কার্যকর করিতে হইলে মন হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, মনের যোগ না থাকিলে শুধু শারীরিক অহিংসা তো দুর্বল বা কাপুরুষের অস্ত্র, সুতরাং তাহাতে শক্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। মনে হিংসা-দ্বেষ পোষণ করিলাম, কিন্তু বাহিরে প্রতিহিংসা না লওয়ার ভান করিলাম— তাহাতে আমার নিজেরই ক্ষতি হইবে, পরিণামে ধ্বংস। শারীরিক হিংসা হইতে বিরতি যদি ক্ষতিকর নাও হয়, আমরা সক্রিয় ভালোবাসার সৃষ্টি করিতে না পারিলেও অন্ততঃ ঘৃণা পোষণ না করা প্রয়োজন। ৩৭

যে ব্যবসায়ে ঠকাইয়া মানুষকে তিলে তিলে মারিল কি না তাহা গ্রাহ্য করে

না, কিংবা যে-ব্যক্তি অস্ত্রবলে কয়েকটি গাভীকে রক্ষা করিতে চায় কিন্তু কসাইকে মারিয়া ফেলে, কিংবা যে-ব্যক্তি দেশের কাল্পনিক কল্যাণ সাধনের জন্য দু-চারজন কর্মচারীর প্রাণ লওয়া গ্রাহ্য করে না, সে-ব্যক্তি অহিংসা-নীতির অনুসরণ করে না। এ-সকলের মূলে আছে ঘৃণা, কাপুরুষতা আর ভয়। ৩৮

হিংসামূলক কাজে আমার আপত্তির কারণ, উহার ফল আপাততঃ ভালো মনে হইলেও সে সাময়িক ভালো— কিন্তু যে-ক্ষতি হয় তাহা চিরস্থায়ী। আমি বিশ্বাস করি না একটি একটি করিয়া সকল ইংরেজকে মারিয়া ফেলিলেও ভারতের বিন্দুমাত্র উপকার হইবে। কালই যদি সব ইংরেজকে কেহ মারিয়া ফেলে তাহা হইলেও ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য ইংরেজের অপেক্ষা আমরা নিজেরাই অধিকতর দায়ী। আমরা নিজের ভালো করিলে ইংরেজের শক্তি কি আমাদের মন্দ করে? সেজন্যই আমি অনবরত বলিতেছি, সংস্কার ভিতর হইতে আসে। ৩৯

সাধু উদ্দেশ্য লইয়াও যখন গায়ের জোরে লোভীকে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পরিণামে বিজেতাকেও সেই বিজিতের রোগে ভুগিয়া বিনষ্ট হইতে হইয়াছে— ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয়। ৪০

বিদেশী শাসকের প্রতি হিংসা, আর যাহাদের আমরা দেশের উন্নতির বাধা বলিয়া মনে করি সেই সব নিজের লোকেদের প্রতি হিংসা, এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটি সহজ পদক্ষেপের ব্যবধান। অন্যান্য দেশে হিংসা-কর্মের ফল যাহাই হউক না কেন, এবং অহিংসার দার্শনিকতা লইয়া আলোচনা না করিয়াও, এই কথা বুঝিতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না যে, যে-সকল দুর্নীতিগ্রস্ত লোক সমাজের উন্নতির বাধা-স্বরূপ তাহাদের হাত হইতে সমাজকে মুক্ত করার জন্য আমরা যদি হিংসার আশ্রয় লই, তাহা হইলে আমাদের অসুবিধা বাড়িবে এবং মুক্তির দিন পিছাইয়া যাইবে। যাহারা সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে নাই বলিয়া সেজন্য প্রস্তুত হয় নাই, তাহারা এই বলপ্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধের জন্য বিদেশীর সাহায্য চাহিবে। বিগত বহু বৎসর ধরিয়া কি ইহা আমাদের চক্ষের সামনেই ঘটিতেছে না? তাহার সুস্পষ্ট স্মৃতি এখনো আমাদের পীড়া দিতেছে। ৪১

রাষ্ট্রের সুগঠিত হিংসার সঙ্গে যদি আমার কোনো সম্বন্ধ না থাকে, তবে

জনগণের উচ্ছৃংখল হিংসার সঙ্গে সম্পর্ক আরো কম। আমি বরং উভয়ের মধ্যে পিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইব। ৪২

বিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম বিচারের নিক্তিতে, একাদিক্রমে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আমি অহিংসা এবং উহার সম্ভাবনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। জীবনের সকল স্তরে— গার্হস্থ্য জীবনে, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংগঠনিক কাজে আমি এই নীতির প্রয়োগ করিয়াছি। কোনো ক্ষেত্রেই ইহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। যদি কোথাও ব্যর্থ হইয়া থাকে তবে আমারই ত্রুটিতে ঘটিয়াছে। আমি কখনো পূর্ণতার দাবি করি না। তবে সত্যানুসন্ধানে, তথা ঈশ্বরের সন্ধানের জন্য, আমার একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দাবি করি। এই সন্ধানের কাজেই আমি অহিংস পথের সন্ধান পাইয়াছি, আর তাহার প্রচারই আমার জীবনের উদ্দেশ্য— এই উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন জীবনে আমার অন্য আগ্রহ নাই। ৪৩

আমার চিরদিনের তৃপ্তি এই যে, যাহাদের নীতির ও আদর্শের আমি বিরোধী তাহারাও আমাকে ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসীরা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশ্বাস করিত এবং আমাকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধিয়াছিল। ইংরেজের নীতির ঘোরতর বিরোধী হইলেও হাজার হাজার ইংরেজ নরনারী আমাকে ভালোবাসিত এবং এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ঘোরতর স্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও আমার ইংরেজ ও আমেরিকান বন্ধুদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা আমার মতে অহিংসারই জয়। ৪৪

যতই দিন যাইতেছে আমার এই বিশ্বাস সমৃদ্ধতর ও দৃঢ়তর হইতেছে— সর্বপ্রযত্নে সাধ্যমত সত্য ও অহিংসার সাধনা না করিলে মানুষের বা জাতির শান্তির আশা নাই। প্রতিহিংসার পথে কখনো সিদ্ধি আসে নাই। ৪৫

পার্থিব, অপার্থিব সকল বস্তু অপেক্ষা অহিংসা আমার প্রিয়। ইহার সঙ্গে তুলনা হয় কেবলমাত্র সত্যের— আমার কাছে সত্য ও অহিংসা একই বস্তুর দুই নাম— অহিংসার মধ্য দিয়াই সত্যে পৌঁছনো যায়। আমার দৃষ্টিতে যেমন ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই, তেমনি জাতিতে জাতিতেও কোনো ভেদ নাই। আমার কাছে মানুষ মানুষই। ৪৬

আমি দুর্বল সাধক মাত্র— বারবার বিফল হই, বারবার চেষ্টা করি। এই ব্যর্থতাই আমার চেষ্টাকে প্রবলতর, আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে।

আমার বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়া আমি ইহাই দেখিতে পাই যে সত্য ও অহিংসা এই যুগ্ম সাধনার বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের মোটেই ধারণা নাই। ৪৭

আমি অপরিসীম আশাবাদী। অহিংসার সাধনার অপরিমেয় সম্ভাবনায় বিশ্বাসই আমার এই আশাবাদের মূল। তুমি যখন নিজের উপরে এই নীতি প্রয়োগ করিয়া ইহার বিকাশ-সাধন করিবে তখন তোমার চারি পাশে ইহা সংক্রমিত হইবে; ক্রমে পারিপার্শ্বিককে ছাড়াইয়া সমগ্র জগৎকে ইহা প্লাবিত করিবে। ৪৮

আমার মতে অহিংসা কোনো রকমেই নিষ্ক্রিয়তা নহে। আমি যেমন বুঝি তাহাতে ইহাই সর্বাপেক্ষা সক্রিয় শক্তি।... অহিংসা চরম বিধি, ইহার উপরে আর কিছু নাই। আমার পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এমন কোনো অবস্থা আসে নাই যখন আমাকে বলিতে হইয়াছে, অহিংসার পথে ইহার মীমাংসা অসম্ভব। ৪৯

অহিংস সংগ্রামে কোনো তিক্ততার কাঁটা থাকিবে না, সংগ্রামের শেষে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হইবে— ইহাই যথার্থ অহিংস সংগ্রাম। দক্ষিণ-আফ্রিকায় জেনারেল স্মাট্‌স-এর সঙ্গে বিরোধে আমার এই অভিজ্ঞতাই হইয়াছিল। তিনি প্রথমে ছিলেন আমার কঠিনতম সমালোচক এবং প্রবলতম প্রতিপক্ষ— কিন্তু আজ তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। ৫০

আত্মরক্ষার জন্য শত্রুকে মারিবার শক্তির প্রয়োজন নাই, মরিবার মতো মনের জোর থাকাই একান্ত প্রয়োজন। মানুষ যদি সত্যই মরিতে প্রস্তুত থাকে তবে হিংসা প্রয়োগ করিতে তাহার ইচ্ছাও হইবে না। আবার স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতো বলা যায়, যে-পরিমাণে মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছা সেই পরিমাণেই শত্রুকে মারিবার ইচ্ছা। সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিয়া, অন্তিম কালেও মুখে ক্ষমা ও অনুকম্পার কথা বলিয়া মানুষ তাহার প্রধানতম শত্রুর হৃদয়কে জয় করিয়াছে— ইতিহাসে তাহার অনেক নজির আছে। ৫১

অহিংসা-শাস্ত্রের আমি একজন সামান্য তত্ত্বান্বেষী। ইহার অতল গভীরতায় যেমন আমার সহকর্মীরা, তেমনি আমিও বিস্ময়ে অভিভূত হই। ৫২

অহিংস উপায়ে সমাজব্যবস্থা গঠিত হইতে পারে না, সমাজ চলিতে পারে

না, এই কথা বলা আজকাল একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার এ-বিষয়ে বলিবার আছে। বাবা যখন অপরাধী সন্তানকে চড় মারেন সে উল্টাইয়া মারে না। ছেলে যে মারের ভয়ে বাবার কথা মান্য করে তাহা নয়, এই মারের পিছনে বাবার যে-ক্ষুব্ধ স্নেহের পরিচয় সে পায় তাহারই জন্য বাবার কথাটা মান্য করে। আমার মতে পরিবারের মধ্যে যেমন, সমাজেও সেই নিয়মেই চলা উচিত। সমাজ তো বৃহত্তর পরিবার—পরিবারের সম্বন্ধে যে-কথা সত্য, সমাজের সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য। ৫৩

একটি সাপের জীবনের বিনিময়েও আমি বাঁচিতে চাই না। আমি মনে করি, সাপের কামড়ে আমি মরিয়া যাইব, তবু তাহাকে মারিব না। কিন্তু ঈশ্বর যদি সত্যই আমাকে এই কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন আর সাপ আমাকে কামড়াইতে আসে, তবে হয়তো আমার মরিবার সাহস হইবে না, আমার ভিতরকার পশু জাগিয়া উঠিবে, সাপটি মারিয়া এই নশ্বর দেহকে বাঁচাইবার আমি চেষ্টা করিব। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে আমার বিশ্বাস এমন-ভাবে আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই যে আমি জোর করিয়া বলিব, সাপের ভয় হইতে আমি মুক্ত, আমি তাহাদের বন্ধুভাবে দেখি। ৫৪

বিজ্ঞানের অগ্রগতির আমি বিরোধী নহি। বরং পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আমি প্রশংসা করি। তবে সেই প্রশংসা অবিমিশ্র নয়, কারণ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা ভগবানের সৃষ্ট ইতর প্রাণীদের তুচ্ছ করেন। জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ আমি সর্বান্তঃকরণে অপছন্দ করি। বিজ্ঞানের নামে, মানবতার নামে নির্দোষ জীবগুলিকে হত্যা করা আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। নিষ্পাপ জীবের রক্তে কলুষিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার আমি কোনো মূল্য দিই না। কাটাকাটি না করার জন্য যদি ধমনীতে রক্ত-সঞ্চালনের তথ্য আবিষ্কৃত নাই হইত, মানবজাতির তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। আমি পরিষ্কার দেখিতেছি, এমন দিন আসিবে যখন পাশ্চাত্যের সাধু-প্রকৃতির বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানান্বেষণের বর্তমান এই রীতি-নীতির উপর রাশ টানিয়া ধরিবেন। ৫৫

আমরা দুর্বল মানুষ; আমাদের পক্ষে অহিংসাকে বোঝা সহজ নয়, এবং তাহা কর্মে আচরণ করা আরো কঠিন। প্রার্থনাশীল ও নম্র হৃদয়ে সর্বক্ষণ ঈশ্বরকে বলিতে হইবে যেন তিনি আমাদের বোধের চোখ খুলিয়া দেন—যেন আমরা প্রতি দিনে তাঁহার নিকট হইতে যে-আলো পাই, সেই আলোতে

পথ চলিতে পারি। শান্তিকামী ও শান্তির অনুরাগী হিসাবে স্বাধীনতা-পুনরুদ্ধারের কাজে অকুণ্ঠ নিষ্ঠাভরে অহিংসার প্রয়োগই আমার কাজ। আর এই পথে যদি ভারত সফল হয় তবে জগতের শান্তি-কল্পে তাহার অবদানই হইবে শ্রেষ্ঠ। ৫৬

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বহুমুখী তরবারির মতো, যে-কোনো ভাবে তাহার প্রয়োগ চলে। যে ইহার প্রয়োগ করে সে আশীর্বাদ লাভ করে, আবার যাহার উপর প্রযুক্ত হয় তাহাকেও ধন্য করে। বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়া ইহা সুদূরপ্রসারী কল্যাণ সাধন করে। এই তরবারিতে মরিচা ধরে না, ইহাকে কেহ চুরি করিতে পারে না। ৫৭

অহিংস আইন-অমান্য আন্তরিকতা-পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল, সংযত হইবে, কখনো উদ্ধত হইবে না। কোনো সুচিন্তিত আদর্শের জন্য এই অসহযোগ করিতে হইবে, খামখেয়ালির বশে নয়। সর্বোপরি, ইহাতে বিদ্বেষ বা অশুভ কামনা থাকিবে না। ৫৮

যিশুখ্রীষ্ট, দানিয়েল এবং সক্রেটিস আত্মিক শক্তি বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই-সব শিক্ষাগুরুরা আত্মার তুলনায় শরীরকে নগণ্য মনে করিয়াছেন। আধুনিকদের মধ্যে টলস্টয় এই নীতির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা— তিনি শুধু নীতি প্রচার করেন নাই, সেইভাবে জীবন-যাপনও করিয়াছেন। ইউরোপে ইহার প্রচারের বহু পূর্বে ভারতে এই নীতি সাধারণে বুঝিত ও পালন করিত। সহজেই বোঝা যায় যে আত্মার শক্তি শারীরিক বলের অপেক্ষা অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য মানুষ যদি আত্মিক শক্তির আশ্রয় লইত, তবে বর্তমান সময়ের অনেক দুঃখকষ্ট এড়ানো যাইত। ৫৯

বুদ্ধ নির্ভয়ে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ফলে উদ্ধত পুরোহিত-সম্প্রদায় তাঁহার কাছে নতিস্বীকার করিয়াছিল। যিশুখ্রীষ্ট জেরুজালেমের মন্দির হইতে অর্থলোভীদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন, ভণ্ড এবং ফ্যারিসীদের উপর ভগবানের অভিশাপ ডাকিয়া আনাইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই গভীরভাবে সক্রিয় প্রতিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি বুদ্ধ ও যিশু শাস্তিবিধান করিবার সময়েও তাঁহাদের প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে নিশ্চিন্ত শান্তভাব ও প্রীতির ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সত্যে বিশ্বাস করিতেন তাহার রক্ষার জন্য বরং সানন্দে জীবন বিসর্জন

করিবেন তবু সেই সত্যনীতি বিসর্জন দিবেন না— শত্রুর বিরুদ্ধে হাত তুলিবেন না। প্রেমের মহিমায় যদি পুরোহিত-সম্প্রদায়কে নিজ মতে না আনিতে পারিতেন তবে বুদ্ধদেব তাঁহাদের প্রতিরোধের চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেন। এক বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত পরাক্রমকে তুচ্ছ করিয়া যিশু কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি যখন অহিংস-অসহযোগের শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে চাই তখন এই-সব মহা-জ্ঞানীদেরই পদানুসরণ করি। ৬০

যখন মানুষের হাতে কোনো অস্ত্র থাকে না, আর যখন মুক্তির অন্য উপায় তাহার মাথায় আসে না, তখন সে শেষ চেষ্টা স্বরূপ মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে— সত্যাগ্রহের এই নিয়ম। ৬১

অহিংসা আত্মিক শক্তি— এই আত্মা অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত। আণবিক বোমা মানবীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা, এবং সেজন্য পৃথিবীর চিরন্তন নিয়মে তাহার ক্ষয়, ধ্বংস ও বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে তাহার শক্তি অপ্রতিরোধ্য— আমাদের শাস্ত্রে ইহার সাক্ষ্য আছে। কিন্তু আত্মার শক্তির পূর্ণবিকাশ তখনই হইবে যখন আমাদের সত্তার অণুপরমাণুতে তাহা ব্যাপ্ত থাকিবে, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা সঞ্চারিত হইবে।

জোর করিয়া কোনো প্রতিষ্ঠানকে অহিংস করা যায় না। সংগঠনের নিয়মের মধ্যে সত্য ও অহিংসা লিখিয়া দিলেই হয় না, নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় তাহা গ্রহণ করিতে হয়। অন্তর্বাসের মতো মনের মধ্যে গাঁথিয়া থাওয়া চাই, নতুবা বিপরীত অর্থ বুঝাইবে। ৬২

জীবন একটি তপস্যা, এমন একটি পূর্ণতার সাধনা যাহা আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া দেয়। আমাদের অপূর্ণতা ও দুর্বলতার জন্য আদর্শকে ছোট করিলে চলিবে না... জীবনের সৌভাগ্যের জন্য যে-ব্যক্তি অহিংসার দিকে, প্রেমের নীতির উপর নির্ভর করে, তাহার ক্ষয়-ক্ষতির পরিধি কমিয়া আসে, প্রাণে প্রেমে সে পূর্ণ হয়; অপর পক্ষে যে হিংসার ও বিদ্বেষের পথে চলিয়াছে তাহার ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িতে থাকে ও ক্রমে বিদ্বেষে-ধ্বংসে তাহার অবসান হয়। ৬৩

মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে হিংসা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, তবে কোথায় সীমারেখা টানা হইবে? সকলের পক্ষে এই সীমারেখা

এক হইতে পারে না। কারণ, মূলনীতি যদিও এক, তবু প্রত্যেক পুরুষ ও নারী তাহার নিজের নিজের মতো করিয়া উহার প্রয়োগ করে। একের খাদ্য অপরের পক্ষে বিষ হইতে পারে। আমার কাছে মাংস খাওয়া পাপ। কিন্তু যে-ব্যক্তি বরাবর মাংস খাইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখে নাই, শুধু আমার অনুকরণের জন্যই না-বুঝিয়া মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া তাহার পক্ষে পাপ হইবে।

আমি যদি কৃষিজীবী হইয়া জঙ্গলে বাস করিতে চাই, তবে আমার ক্ষেত-খামার রক্ষার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু হিংসার আশ্রয় লওয়া আমার পক্ষে অনিবার্য। বানর, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ আমার শস্যহানি করিলে আমাকে তাহাদের মারিতে হইবে। হয়তো আমি নিজে মারিতে চাহি না বলিয়া লোক নিযুক্ত করিলাম— দুইয়ের মধ্যে এমন কিছু প্রভেদ নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে, তবু অহিংসার নামে শস্যধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গ মারিব না— বরং ইহাই পাপ। ভালো-মন্দ আপেক্ষিক শব্দ। এক অবস্থায় যাহা ভালো তাহাই আবার অন্য অবস্থায়, অবস্থার পরিবর্তনে, অশুভ হইতে পারে।

মানুষ শাস্ত্রের কূপে ডুবিয়া থাকিবে না, বিশাল শাস্ত্র-সমুদ্রে ডুব দিয়া মুক্তা আহরণ করিবে। কাহাকে হিংসা বলে, কাহার নাম অহিংসা, তাহা প্রতি পদে তাহাকে আপন বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিতে হইবে। এখানে লজ্জা বা ভয়ের স্থান নাই। কবি বলিয়াছেন, সাহসীরা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবে, কাপুরুষের সেখানে কোনো স্থান নাই। ৬৪

বক্তা বা লেখক যদি সত্য বলিয়া মনে করেন, তবে অপ্রীতিকর কথা লেখায় বা বলায় হিংসার পরিচয় দেওয়া হয় না। প্রতিপক্ষের অনিষ্ট করার ইচ্ছায় যদি কঠিন কথা বলা হয় তবে সেই কথাকে হিংসামূলক বলা যায়।

লোকের মনে ব্যথা দিবার আশঙ্কায় বা মিথ্যা উচিত-অনুচিতের বোধের দ্বারা দ্বিধান্বিত হইয়া মানুষ অনেক সময় যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহা বলিতে পারে না— পরিণামে অনেক সময়ে সে ভণ্ডামির পর্যায়ে গিয়া পড়ে। যদি ব্যক্তি সমাজ ও জাতিকে চিন্তায় ও বাক্যে অহিংস হইতে হয় তবে সত্য যাহা তাহা বলিতেই হইবে— সে কথা যতই রূঢ় ও অপ্রিয় হউক। ৬৫

প্রত্যক্ষ কর্ম বিনা কখনো কোনো কাজ সাধিত হয় নাই। নিষ্ক্রিয় কথাটির অর্থ যথেষ্ট স্পষ্ট নয়; ইহাকে দুর্বলের অস্ত্র বলিয়া মনে করা হয় বলিয়াও আমি এই শব্দটি বর্জন করিয়াছি। ৬৬

যে অহিংস থাকিবে তাহার আঘাত করিবার শক্তি থাকা চাই। প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনাকে জোর করিয়া সজ্ঞানে সংযত রাখিবার প্রয়াসের নাম অহিংসা— কিন্তু নিষ্ক্রিয়, কাপুরুষ অসহায়ের মাথা পাতিয়া মার সহ্য করা অপেক্ষা প্রতিহিংসা অনেক ভালো। ক্ষমা আরো ভালো। অবশ্য প্রতিহিংসাও একরকম দুর্বলতা। অনিষ্ট আশঙ্কায়— তাহা সত্য হউক বা কাল্পনিক হউক— মানুষের মনে প্রতিহিংসার উদয় হয়। পৃথিবীতে কাহাকেও যে ভয় পায় না, সে কেন অনিষ্টকারীর সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবে? ৬৭

অহিংসা ও কাপুরুষতা একত্র থাকিতে পারে না। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত লোকও মনে মনে কাপুরুষ হইতে পারে। অস্ত্র রাখার অর্থই হইল কাপুরুষতা, না হইলে ভয় রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। নির্ভেজাল বিশুদ্ধ ভয়শূন্যতা ব্যতীত পূর্ণ অহিংসা অসম্ভব। ৬৮

আমার অহিংসা-ধর্ম নিতান্তই সক্রিয় শক্তি। ইহার মধ্যে দুর্বলতা, কাপুরুষতার স্থান নাই। শক্তিমান অত্যাচারী ব্যক্তি কালে অহিংস হইতে পারে, কিন্তু কাপুরুষের সে আশা নাই। সেজন্যই এই লেখাগুলিতে আমি একাধিকবার বলিয়াছি যে যদি আমরা অহিংসার পথে, কষ্টভোগের মধ্য দিয়া আমাদের নিজেদের, আমাদের মেয়েদের এবং আমাদের মন্দিরগুলিকে রক্ষা করিতে না পারি তবে যেন যুদ্ধ করিয়াও সেই-সব রক্ষা করার মতো শক্তি থাকে। ৬৯

বেতিয়ার নিকটস্থ এক গ্রামের লোকেরা আমাকে বলিয়াছে যে, পুলিস যখন তাহাদের ঘরবাড়ি লুঠ করিতেছিল, তাহাদের মা-বোনের উপর নির্যাতন চালাইতেছিল, তখন তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। তাহারা যখন বলিল, আমার কথামত অহিংস থাকিবার জন্য তাহারা পলাইয়া গিয়াছিল, তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইল। আমি জোর গলায় বলিলাম, আমার অহিংসার অর্থ ইহা নয়। আমি আশা করি, তাহাদের আশ্রিত নিরপরাধ প্রাণীদের নির্যাতন করিতে উদ্যত শক্তির কবল হইতে তাহারা সর্বপ্রযত্নে তাহাদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, নিজেদের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইবে, দরকার হইলে বরং মৃত্যুবরণ করিবে, তবু পলাইয়া যাইবে না। তরবারির সাহায্যে বলের উপর পাল্টা বলপ্রয়োগ করিয়া ধনসম্পত্তি, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করায় পৌরুষ আছে, শত্রুর অনিষ্ট না করিয়া ঐ-সব রক্ষা করায় অধিকতর পৌরুষ ও মহত্তর শক্তির পরিচয়। কিন্তু

কর্তব্য-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক, মর্যাদা-হানিকর এবং কাপুরুষতার কাজ— নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ধন-সম্পত্তি, ধর্ম, আত্ম-সম্মান শত্রুর হাতে বিসর্জন করিয়া পলায়ন করা ভীরুতা। আমি বেশ বুঝিলাম, যাহারা মরিতে জানে তাহাদেরই আমার অহিংসার মন্ত্র দিতে হইবে, যাহারা মরিতে ভয় পায় তাহাদের নয়। ৭০

গোটা জাতি ক্লীব হইয়া যাওয়ার অপেক্ষা হানাহানি মারামারি আমার মতে সহস্রগুণে ভালো। ৭১

প্রিয়জনকে অরক্ষিত রাখিয়া বিপদ এড়াইবার জন্য পলায়ন আমার অহিংসা-নীতির অর্থ নয়। মারামারি-কাটাকাটি, ও কাপুরুষের মতো পলায়ন— এই দুইয়ের মধ্যে আমি হিংসার পথই শ্রেয়ঃ মনে করি। অন্ধকে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করিতে যেমন প্রলুব্ধ করিতে পারি না, তেমনি ভীরু কাপুরুষের কাছে অহিংসার কথা বলা চলে না। অহিংসা তো সাহসের পরাকাষ্ঠা। হিংসার নীতিতে বিশ্বাসী লোকের কাছে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে আমার কোনো কষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকাল যখন আমার মধ্যে ভয় ও কাপুরুষতা ছিল, আমি হিংসার আশ্রয় লইয়াছি— যখন হইতে আমি ভয় ও কাপুরুষতা বর্জন করিতে লাগিলাম তখনই আমি অহিংসার প্রকৃত মূল্য বুঝিলাম। ৭২

মরিতে যাহার ভয়, প্রতিরোধের ক্ষমতা যাহার নাই, তাহাকে অহিংসার কথা বলা যায় না। বিড়াল ইঁদুরকে খাইয়া ফেলে, তাই বলিয়াই কি ইঁদুর অহিংস? ক্ষমতা থাকিলে সে ঐ বিড়ালকে মারিয়া ফেলিত। কিন্তু সে বিড়াল দেখিলেই পলাইয়া যায় বলিয়াই তাহাকে আমরা কাপুরুষ বলি না, কারণ প্রকৃতি তাহাকে অন্য রকম আচরণ করার শিক্ষা দেয় নাই। কিন্তু মানুষ যদি বিপদের মুখে পড়িয়া ইঁদুরের মতো আচরণ করে, তাহাকে আমরা ন্যায়তঃ কাপুরুষ বলিব। তাহার মনে আছে হিংসা আর দ্বেষ, নিজের ক্ষতি না করিয়া যদি শত্রুর নিধন করা যাইত, সে তাহাই করিত। অহিংসা-ধর্ম তাহার অজানা, তাহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। সাহস তাহার স্বভাবে নাই। তাহাকে অহিংসার কথা বলার আগে তাহাকে বলবান শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে, এমনকি আক্রমণকারীর সম্মুখে মৃত্যু বরণ করিতে শিখাইতে হইবে। অন্যথায়, তাহার ভীরুতারই সমর্থন করা হইবে, এবং তাহাকে অহিংসা হইতে আরো দূরে লইয়া যাওয়া হইবে। আমি কাহাকেও মারের বদলে মার ফিরাইয়া দিতে বলি না। কিন্তু

অহিংসার আবরণে ভীরুতার প্রশ্রয়ও দিতে পারি না। অহিংসার মর্ম না বুঝিয়া অনেকে সত্যই মনে করেন যে, বিপদে পড়িলে, বিশেষত যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা, সেখানে পলায়ন করাই বাধা দেওয়ার চেয়ে ভালো, তাহাতেই অহিংসা পালন করা হয়। অহিংসার শিক্ষক হিসাবে আমি সাধ্যমত এরূপ অপুরুষোচিত ধারণা দূর করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিব। ৭৩

শরীরে দুর্বল হইলেও মনে যদি পলাইয়া বাঁচার লজ্জাবোধ থাকে তবে নিজের বিশ্বাসের জন্য বরং মৃত্যু বরণ করিবে— ইহাকেই বলে সাহস, ইহাকেই বলে অহিংসা। যতই দুর্বল হউক, নিজের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন মানুষ আঘাত করিয়া শত্রুকে প্রতিরোধ করে এবং সেই চেষ্টায় অবশেষে প্রাণ দেয়— সে সাহসের পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহা অহিংসা নয়। যখন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ানো কর্তব্য, তখন পলায়ন করা কাপুরুষতা। প্রথম ক্ষেত্রে থাকে ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা; দ্বিতীয় তৃতীয় ক্ষেত্রে থাকে ভয়, সন্দেহ ও অপ্রেম। ৭৪

ধরো আমি একজন নিগ্রো, আমার বোনকে কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ধর্ষণ করিয়াছে অথবা জঘন্যভাবে হত্যা করিয়াছে, তখন আমার কর্তব্য কি? আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করিয়া জবাবও পাইয়াছি। আমি তাহাদের ক্ষতি করিব না, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করিব না। হয়তো ঐ সম্প্রদায়ের উপরই আমি জীবিকার জন্য নির্ভর করি— আমি তাহাদের সঙ্গে কোনো যোগ রাখিব না। তাহাদের কাছ হইতে পাওয়া খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিব না। আমার যে-সব নিগ্রো ভাই এই অন্যায়কে বরদাস্ত করিবে তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। এইভাবে আত্ম-বিলোপের কথাই আমি বলি। আমি অনেকবার এই পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছি। অবশ্য যন্ত্রের মতো অনশনের কোনো মূল্য নাই। প্রতি মুহূর্তে জীবনীশক্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে তখনো বিশ্বাস দৃঢ় থাকা চাই। আমার অহিংসা-পালন অতি সামান্য দরের, আমার কথায় লোকের প্রত্যয় জন্মিবে কেন? কিন্তু আমি কঠোর চেষ্টা করিয়াছি, এ জীবনে যদি সম্পূর্ণ সিদ্ধি না মেলে তবু বিশ্বাস হারাইব না। ৭৫

শেষ পর্যন্ত পাশব শক্তিরই প্রাধান্য থাকে— এ-কথা অস্বীকার করার মতো লোক এই পশুশক্তির নিয়মে চালিত জগতে বিরল। সেইজন্য বহু বেনামী পত্রে আমাকে বলা হয় যে, হাঙ্গামা বাধিয়া গেলেও আমি যেন অসহযোগ

আন্দোলনের তৎপরতা বন্ধ না করি। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি ভিতরে ভিতরে লড়াইয়েরই ষড়যন্ত্র করিতেছি, তাঁহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণার শুভমুহূর্তটি কখন আসিবে। তাঁহারা দৃঢ়ভাবে আমাকে বুঝাইতে চান যে ইংরেজ প্রকাশ্য বা গোপন বলপ্রয়োগ ছাড়া কিছুতে হার মানিবে না। আবার এমন লোকও আছে যাহারা মনে করে আমার মতো দুর্বৃত্ত ভূভারতে নাই, আমি কখনো আমার অভিপ্রায় খুলিয়া বলি না, আমিও যে অন্তরে অন্তরে অধিকাংশেরই মতো যুদ্ধে বিশ্বাসী এ-বিষয়ে তাহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অধিকাংশ লোকের মনে যখন তরবারির শক্তিতে এমন দৃঢ় আস্থা— অথচ অহিংস অসহযোগের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে আন্দোলন চলার সময়ে পূর্ণ অহিংস থাকার উপরে, এবং এ-বিষয়ে আমার মতামতের উপরে অনেকের আচরণ নির্ভর করিতেছে— তখন আমি যতটা সম্ভব খোলসা করিয়া আমার মত ব্যক্ত করিতে চাই।

আমি সত্যই বিশ্বাস করি, যখন কাপুরুষতা ও বলপ্রয়োগ এই দুইয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইবে, তখন আমি বলপ্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিব। সেজন্য আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন প্রশ্ন করিয়াছিল যে, ১৯০৮ সনে আমি যখন মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হই তখন কি আমাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া পলায়ন করা তাহার কর্তব্য ছিল, না বলপ্রয়োগে আমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা তাহার উচিত ছিল, তখন আমি উত্তর দিয়াছিলাম যে, বল-প্রয়োগেও আমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা তাহার কর্তব্য ছিল। এইভাবেই আমি বুয়র-যুদ্ধে, তথাকথিত জুলু-বিদ্রোহে এবং গত যুদ্ধে যোগ দিই; সেইজন্য যাহারা বলপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করে তাহাদের সমরনীতি-শিক্ষণের জন্য আমি মত দিই। ভারতবাসী কাপুরুষের মতো অসহায় দৃষ্টিতে নিজেদের অসম্মান প্রত্যক্ষ করিবে, তাহার চেয়ে বরং অস্ত্রশস্ত্র-সহযোগে দেশের স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করুক সেও অনেক ভালো।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা অহিংস সংগ্রাম বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। শাস্তি দেওয়া অপেক্ষা ক্ষমা করা অনেক ভালো। ক্ষমা সৈনিকের ভূষণ। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সত্ত্বেও নিবৃত্ত থাকার নামই ক্ষমা, অক্ষমের প্রতিরোধ করিতে নিবৃত্ত থাকার অর্থ ক্ষমা নয়। ইঁদুর যখন বিড়ালের হাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয় তখন সে বিড়ালকে ক্ষমা করে না। সেই-জন্য যাহারা জেনারেল ডায়ার ও তাঁহার মতো লোকের উপযুক্ত শাস্তির জন্য ব্যস্ত, তাহাদের মনোভাব আমি বুঝিতে পারি— হাতে পাইলে তাহারা উহাদের ছিঁড়িয়া খায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ভারতবাসী অসহায়

অক্ষম— কেবল ভারতের ও আমার সেই শক্তিকে আমি মহত্তর কাজে লাগাইতে চাই।

আমাকে যেন কেহ ভুল না বোঝেন। ক্ষমতা কেবল শারীরিক সামর্থ্য হইতে আসে না— আসে দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে। শারীরিক বলে গড়-পড়তা সব জুলুই ইংরেজদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সে একজন ইংরেজ বালককেও ভয় পায় কারণ তাহার হাতে রিভলভার আছে; না হয় তাহার পিছনে যাহারা আছে তাহাদের অস্ত্রকে ভয় করে। সে মরিতে ভয় পায়, তাই বিশাল দেহ সত্ত্বেও সে ভয়কাতর। আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে এক লক্ষ ইংরেজের ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে ভয় দেখাইবার কোনো সংগত কারণ নাই। স্পষ্ট ক্ষমা তাহা হইলে আমাদের সুস্পষ্ট শক্তির পরিচয় দিবে। এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ ক্ষমার ফলে আমাদের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হইবে তাহাতে একজন ডায়ার বা একজন ফ্রাঙ্ক জন্‌সনের সাধ্য কি যে দেশভক্ত ভারতবাসীর অপমান করে? হয়তো আমার বক্তব্য এখনই লোকের মনে ধরিবে না, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বর্তমানে আমরা নিজেদের এত পদদলিত মনে করি যে রাগ করিবার বা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ভাবিতেও পারি না। কিন্তু শাস্তি দিবার অধিকার দাবি না করিয়াই ভারত লাভবান হইবে, এ-কথা বলিতে আমি ছাড়িব না— আমাদের ইহা অপেক্ষা ভালো কাজ আছে, জগতের সমক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নীতি আমরা তুলিয়া ধরিব।

আমি দার্শনিক নই— আমি বাস্তব আদর্শবাদী। অহিংসা-ধর্ম শুধু ঋষিদের ও সাধুদের ধর্ম নয়— এ ধর্ম সাধারণের জন্যও বটে। হিংসা যেমন পশুর ধর্ম, অহিংসা তেমনি আমাদের, মানুষের ধর্ম। পশুর আত্মা সুপ্ত— সে শারীরিক বল ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, কিন্তু মানবের মর্যাদা রক্ষা হয় উন্নততর নিয়ম মান্য করিয়া, আত্মার শক্তির কাছে মাথা নত করিয়া।

আমি ভারতবাসীর কাছে আত্মত্যাগের আদর্শ তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সত্যাগ্রহ ও তাহার আনুষঙ্গিক অহিংস-অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, প্রভৃতি এই আত্মোৎসর্গেরই অন্য নাম। যে-ঋষিরা জগতের হিংসার মধ্যে এই অহিংসা-ধর্ম উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, নিউটনের অপেক্ষা তাঁহাদের প্রতিভা শ্রেষ্ঠ। ওয়েলিংটনের চেয়ে তাঁহারা বড় যোদ্ধা। অস্ত্রের ব্যবহার জানিয়াও তাঁহারা যুদ্ধের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং রণক্লান্ত পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছিলেন যে মুক্তি আছে অহিংসার পথে, হিংসার পথে নয়।

প্রাণবন্ত অহিংসার অর্থ সজ্ঞানে দুঃখবরণ। অনিষ্টকারীর ইচ্ছার কাছে ভয়ে মাথা নত করিব না— নিজের সমগ্র আত্মিক-শক্তি অত্যাচারীর প্রতি

প্রয়োগ করিব। এই নীতি অনুসরণ করিয়া এক ব্যক্তি একাকী নিজের মান-সম্ভ্রম, নিজের ধর্ম, নিজের আত্মাকে রক্ষা করিতে, অন্যায়কারী সমগ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে— সাম্রাজ্যের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া তাহার পতন ঘটাইতে পারে, অথবা তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

তাই ভারতবর্ষ দুর্বল বলিয়া আমি ভারতবাসীকে অহিংসার বাণী শুনাইতেছি না। ভারতবাসী আপনার শক্তি ও সাধ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও অহিংসার পথ অবলম্বন করে, ইহাই আমি চাই। শক্তির উপলব্ধির জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা নিজেদের রক্ত-মাংসের পিণ্ড বলিয়াই ভাবি, ইহার প্রয়োজন আছে। আমি চাই ভারত-বাসী অনুভব করুক, ভারতের আত্মা কখনো বিনষ্ট হইবার নয়, আত্মা সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে জানে; ও সমগ্র জগৎও যদি একত্র হয়, তাহার মিলিত শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে।

তরবারির নীতি গ্রহণ করিলে ভারতের সাময়িক জয় হইতেও পারে। কিন্তু তাহা আমার গর্বের ভারত হইবে না। আমার সব কিছু যে ভারতের কাছে পাইয়াছি, তাই তো আমি ভারতের প্রণয়াবদ্ধ। জগৎকে ভারতের কিছু দিবার আছে— ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভারত অন্ধভাবে ইউরোপের অনুকরণ করিবে না। ভারতবর্ষ যেদিন তরবারির পথকে বাছিয়া লইবে, সেদিনটি আমার চরম পরীক্ষার দিন হইবে। তখন যেন বিশ্বাস না হারাই। আমার এই ধর্ম ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়; আমার বিশ্বাস যদি জীবন্ত হয় তবে তাহা আমার ভারতের প্রীতিকেও ছাড়াইয়া যাইবে। অহিংসা-নীতি, যাহা হিন্দুধর্মের গোড়ার কথা, সেই নীতিতে ভারতের সেবায় আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। ৭৬

প্রতিপক্ষ যতক্ষণ না আমার বক্তব্য মানিয়া লইবে, বা আমি হার স্বীকার করিব, ততক্ষণ আমাকে বলিয়া যাইতেই হইবে। কারণ আমার কাজই হইল প্রতিটি ভারতবাসীকে, এমনকি ইংরেজকে, পরিশেষে সমগ্র জগৎকে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, ধর্ম-সম্বন্ধীয়, সকল ব্যাপারে অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী করিয়া তোলা। যদি বলো, ইহা দুরাশা, আমি মানিয়া লইব। যদি বলো ইহা স্বপ্ন, কাজে পরিণত করা অসম্ভব, তবে আমার উক্তি হইবে, অসম্ভব নয়, এবং তাহা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য আমার পথে আমি চলিতে থাকিব।

অহিংস সংগ্রামে আমি হাড় পাকাইয়াছি, আমার বিশ্বাসের পক্ষে আমার অনেক যুক্তি আছে। কাজেই একজন লোকই আমার সঙ্গে আসুক, কি

বহু লোকই আসুক, বা যদি একজনও সাথী না মেলে তবে একাই, আমার এই পরীক্ষা চালাইয়া যাইতে হইবে। ৭৭

আমেরিকান বন্ধুরা বলেন, 'অ্যাটম্' বোমা যেমন অহিংসা আনিয়া দিবে, অন্য কিছুতে তেমন হইবে না। হইতে পারে অ্যাটম্ বোমার ধ্বংসলীলা মানুষের মনে এমন তিক্ততা আনিয়া দিবে যে, সাময়িক ভাবে মানুষ হিংসার পথ ত্যাগ করিবে। কিন্তু ইহা তো পেটুকের গুরুভোজনের মতো; বমি না হওয়া পর্যন্ত পেট পুরিয়া খাইয়া তবেই সে আহার ত্যাগ করে— বমির ভাব গিয়া পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার ভোজন চলে। ঠিক সেই ভাবে, হানাহানির তিক্ততা মুছিয়া গেলে, কালে জগৎ আবার নূতন উৎসাহে হিংসার পথে ফিরিয়া আসিবে।

অনেক সময় অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের বিধানে, মানুষের নয়। মানুষ জানে, অশুভ হইতে অশুভেরই জন্ম, যেমন শুভ হইতে শুভের।

অ্যাটম্ বোমার চরম অভিশাপ হইতে এই শিক্ষাই পাই যে, হিংসার প্রত্যুত্তর যেমন প্রতিহিংসা নয়, তেমনি অ্যাটম্ বোমার প্রয়োগে অ্যাটম্ বোমার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যায় না। কেবল প্রেম দিয়াই বিদ্বেষকে জয় করা যায়— পাল্টা বিদ্বেষ হিংসার ক্ষেত্র এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করে।

আমি জানি, আমি বহুবার যাহা বলিয়াছি ও আচরণ করিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। প্রথমে যাহা বলিয়াছি তাহাও তো নূতন নয়, হিমালয়ের মতোই সনাতন। কেবল আমি বইয়ের মুখস্থ বুলি বলি না। জীবনের শিরা-উপশিরার মধ্যে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ়বদ্ধ। দীর্ঘ ষাট বৎসরের পথ-চলার অভিজ্ঞতায়, বন্ধুদের সহযোগিতায়, আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর ও উজ্জ্বলতর হইয়াছে। অবশ্য মূল সত্যকে অবলম্বন করিয়াই মানুষকে নিজ ভূমিতে একাকী স্থির ও অবিচল থাকিতে হয়। বহুদিন আগে ম্যাক্সমুলার বলিয়াছিলেন, যতদিন কেহ অবিশ্বাসী থাকিবে, ততদিন বার বার সত্য কথা শুনাইতে হইবে। আমিও সেই কথাই বিশ্বাস করি। ৭৮

ভারতবর্ষ যদি হিংসার পথকেই গ্রহণ করে, আর তখনো আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে ভারতে বাস করিতে আমার রুচি থাকিবে না। সেই ভারতে আমার গর্ব করিবার কিছু থাকিবে না। দেশপ্রেম আমার ধর্মের চেয়ে বড় নয়। শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য মাতাকে আঁকড়াইয়া থাকে, আমিও

তেমনি ভারতমাতাকে আঁকড়াইয়া আছি, কারণ তাঁহার কাছ হইতেই যে আমি প্রয়োজন-মতো আত্মার পুষ্টি লাভ করি। আমার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি আছে ভারতের আকাশে বাতাসে। এ-বিশ্বাস হারাইলে আমার দশা হইবে অনাথ বালকের মতো, কোনো আশ্রয়ের আশাই যাহার নাই। ৭৯

আত্মসংযম

অভাব বৃদ্ধি করা নয়, স্বেচ্ছায় দৃঢ়চিত্তে অভাব নিয়ন্ত্রিত করাই সভ্যতার প্রকৃত অর্থ। একমাত্র ইহাই প্রকৃত সুখ ও সন্তোষ জাগাইতে এবং কর্ম-শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে। ১

কিছুটা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম দরকার, কিন্তু মাত্রা ছাড়াইলেই উহা কাজে সাহায্য না করিয়া বরং ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সেইজন্যই অসংখ্য অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পূরণের আশা মানুষকে মিথ্যা মায়াজালে আবদ্ধ করে। মানুষের শারীরিক প্রয়োজন মিটাইবার কাজ, এমন-কি সংকীর্ণ 'আমি'র মানসিক অভাব পূরণের প্রয়োজনকেও এক জায়গায় আসিয়া থামিতে হইবে— মানবের সেবার কাজেই আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করা দরকার— সে কাজে বিঘ্ন না ঘটায় এমনভাবে আমাদের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক কার্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ২

শরীর ও মনের এমন নিগূঢ় সম্বন্ধ যে একটি বিকল হইলে সমগ্র যন্ত্রটিই বিকল হইয়া পড়ে। সেজন্য সূক্ষ্ম অর্থে পূত-পবিত্র ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাস্থ্যের আকর, এবং কুচিন্তা ও অসৎ প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায় ব্যাধির নামান্তর। ৩

শয়তানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানের বিধি মানিয়া চলিলেই শুধু প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য ভালো না থাকিলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না, আবার রসনার সংযম অভ্যাস না করিলে সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করা সম্ভব নয়। স্বাদের ইন্দ্রিয়কে বশে আনিতে পারিলে অন্য ইন্দ্রিয়-গুলি আপনি বশীভূত হইবে। ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলেই তো জগৎ জয় করা হয় এবং ইন্দ্রিয়-জয়ী পুরুষ ভগবানের অংশ হইয়া যায়। ৪

সাংবাদিকতার জন্যই সাংবাদিকতা আমি গ্রহণ করি নাই; যে-কাজকে আমি জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহার সহায়ক হইবে বলিয়াই আমার এই বৃত্তি গ্রহণ। অহিংসা ও সত্যের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি-রূপ যে অতুলনীয় সত্যাগ্রহ অস্ত্র, আমার বাক্যে ও আচরণে তাহার সংযত প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য। জীবনের যত কল্যাণ ও অসুন্দরকে দূর করার জন্য সত্য ও অহিংসা ভিন্ন উপায় নাই— এই কথা বুঝাইতে

আমি ব্যগ্র, আমি অধীর। কঠিনতম পাষাণ-হৃদয়কেও গলাইবার মতো শক্তি এই অস্ত্রের আছে। আমার বিশ্বাস যদি খাঁটি হয় তবে রাগবিদ্বেষ-ভরে আমার কিছু লেখা চলে না, বাজে কথাও আমি লিখিতে পারি না, কেবল উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য লেখাও আমার কর্তব্য নয়। পাঠক বোধহয় ধারণাও করিতে পারেন না যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া আমাকে বিষয়-নির্বাচনে ও ভাষা-ব্যবহারে কত সংযম পালন করিতে হয়। ইহা আমার পক্ষে শিক্ষা গ্রহণের মতো ব্যাপার হইয়াছে— নিজের মনের অভ্যন্তরে তাকাইয়া নিজের দোষ ও দুর্বলতাগুলি দেখিতে সাহায্য করিতেছে। কত সময় চমৎকার একটি শব্দ প্রয়োগের লোভ আমাকে পাইয়া বসে, কখনো বা রাগ করিয়া কঠোর মন্তব্য করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়— সেই আগাছা বাদ দিয়া নিজেকে দমন করিবার সে এক কঠিন পরীক্ষা! কিন্তু তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারাও মস্ত শিক্ষা। পাঠক হয়তো 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'-র সাজানো-গোছানো পাতাগুলি পড়িয়া রম্যাঁ রলাঁর মতো বলিয়া ওঠেন, 'এই বুদ্ধ কি চমৎকার!' পাঠকের জানিয়া রাখা দরকার, যাহা-কিছু তাঁহার চমৎকার লাগিয়াছে তাহা অতি যত্নে প্রার্থনাশীলতার মধ্যে লেখা হইয়াছে। যাহাদের অভিমতকে আমি শ্রদ্ধা করি এমন কেহ যদি আমার মতকে স্বীকার করেন তবে পাঠককে আমি বলিব যে আমার সেই সুন্দর মত যতদিন আমার চরিত্রের মজ্জাগত না হইতেছে, অর্থাৎ মন্দ কাজ করা যখন আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে, ক্ষণেকের জন্য হইলেও যখন কর্কশ ও অবিনীত ভাব আমার চিন্তা-জগতে থাকিবে না, তখনই কেবল আমার অহিংসা-নীতি সকল মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিবে, তাহার পূর্বে নয়। নিজের বা পাঠকের সম্মুখে আমি অসম্ভব কোনো পরীক্ষা বা আদর্শ উপস্থাপিত করি নাই, প্রত্যেক মানুষের ইহাতে জন্মগত অধিকার আছে। স্বর্গ আমরা হারাইয়াছি শুধু তাহা ফিরাইয়া পাইব বলিয়াই। ৫

রাগ দমন করা উচিত, তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আমার এই মহৎ শিক্ষা হইয়াছে। সঞ্চিত উত্তাপ যেমন শক্তি উৎপাদন করে, সযত্ন-প্রশমিত ক্রোধ তেমনি এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে যাহা পৃথিবীকে আন্দোলিত করিবে। ৬

আমার যে রাগ হয় না তাহা নয়, রাগকে আমি প্রকাশ করি না। অক্রোধের জন্য আমি ধৈর্যের সাধনা করি ও প্রায়ই তাহাতে সফল হই। রাগের কারণ হইলে আমি তাহাকে সংযত করি। কি করিয়া এই সংযম লাভ করিতে

হয় তাহা অপরকে বলিয়া দেওয়া শক্ত, নিজের চেষ্টায় আর অবিরত অভ্যাসের ফলে ইহা শিক্ষা করিতে পারা যায়। ৭

কর্মফল এড়াইয়া চলার চেষ্টা অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ। অতিরিক্ত আহারের ফলে যদি পেটের ব্যথা সহিতে হয় এবং উপবাস করিতে হয় সেও ভালো, কিন্তু লোভে পড়িয়া অপরিমিত আহার করিব আর তাহার দুঃখ এড়াইবার জন্য ঔষধ খাইব, তাহা ভালো নয়। জৈব প্রবৃত্তির বশে অন্যায় করিয়া তাহার শাস্তি এড়াইবার চেষ্টা ইহা অপেক্ষাও অন্যায়। প্রকৃতি নির্মম; তাহার নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিলে প্রকৃতি কঠিন পরিশোধ দাবি করে। নৈতিক সংযমের দ্বারাই নৈতিক ফল লাভ হয়— অন্য কোনো সংযম উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। ৮

অন্যের দোষ ধরা ও তাহার বিচার করা আমাদের কাজ নয়। নিজের বিচার করিয়াই কূল পাওয়া যায় না। যতক্ষণ আমার মধ্যে সামান্যতম দোষও আছে, যাহার জন্য আত্মীয়-বন্ধুরা আমি না চাহিলেও আমাকে ত্যাগ করে, ততক্ষণ অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাইবার অধিকার আমার নাই। তাহা সত্ত্বেও যদি কাহারো দোষ আমার চোখে পড়ে এবং তাহাকে বলিবার অধিকার থাকে তবে শুধু তাহাকেই বলিতে পারি, অপরকে তাহা বলিবার আমার অধিকার নাই। ৯

রাগদ্বেষাদি লইয়া বেশিক্ষণ মাথা ঘামাইয়ো না। যখন একবার এক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছ, তখন তাহা লইয়া পুনর্বার আলোচনা করিয়ো না। ব্রত গ্রহণ করার অর্থ হইল, ব্রতের বিচার লইয়া মন আর কিছু ভাবিবে না। একজন বণিক কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করিলে তাহাদের সম্বন্ধে আর কিছু ভাবে না, অন্য জিনিসের কথাই শুধু ভাবে। ব্রতের বিষয়েও ঐ কথা। ১০

যে-ব্যক্তি সত্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চায় তাহার লক্ষণ কি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে পারে। তাহাকে কাম ক্রোধ লোভ মোহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। সে নিজেকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিবে এবং জিহ্বা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখিবে। জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়, স্বাদের ইন্দ্রিয়ও বটে। জিহ্বা দিয়াই আমরা অতিশয়োক্তি করি, মিথ্যা বলি, এবং যে-কথা মনে ব্যথা দেয় তাহাও বলি। স্বাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে জিহ্বার দাস করে, তাহাতে

আমরা জন্তুর মতো খাইবার জন্যই বাঁচিয়া থাকি। কিন্তু উপযুক্ত সংযমের সাহায্যে আমরা নিজেদের উন্নত করিয়া দেবদূতের কাছাকাছি উঠিতে পারি। যে-ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে সে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে সর্বগুণাধার। তাহার ভিতর দিয়া ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। আত্মসংযমের এমনই বিপুল শক্তি। ১১

ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া খ্যাত সার্বজনীন নীতিগুলি বোঝা ও পালন করা সহজ— যদি ইচ্ছা থাকে। মানুষের স্বাভাবিক নিষ্প্রাণতা ও উদাসীনতার জন্যই সেগুলি কঠিন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতির জগতে কিছুই থামিয়া থাকে না। কেবল ঈশ্বরই নিশ্চল, কারণ তিনি গতকাল যাহা ছিলেন, আজও তাহা আছেন এবং আগামীকালও তাহা থাকিবেন, অথচ তিনি চিরগতিশীল।... সেইজন্যই আমার মতে মানুষ যদি বাঁচিতে চায় তবে তাহাকে ক্রমেই সত্য ও অহিংসার শরণ লইতে হইবে। ১২

বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যেমন প্রথমে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা-প্রণালীর জ্ঞান অত্যাবশ্যক, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইবার আগে চাই কঠোর প্রাথমিক আত্ম-সংযম। ১৩

সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য বর্জন করা এবং নানাবিধ খাদ্য, বিশেষতঃ মাংস-ভোজনে বিরত থাকা, আত্মিক উন্নতি সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারাই লক্ষ্য নয়, ইহারা উপায়মাত্র। সযত্নে সর্বপ্রকার আমিষ ও মাদক দ্রব্য পরিহার করিয়া চলে অথচ প্রতি কাজে ঈশ্বরকে অবমাননা করে, এমন লোকের অপেক্ষা মাংস আহার করে এমন ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক কি ঈশ্বরের নিকটতর নয়? ১৪

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে যাহারা ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করিতে চায় তাহাদের পক্ষে আমিষ ভোজন উপযোগী নয়। কিন্তু চরিত্র গঠনের কাজে বা ইন্দ্রিয় জয়ের ব্যাপারে আহারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা অনুচিত। আহারবিধির মূল্য আছে, তাহা উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু আমাদের দেশে পান-ভোজনের মধ্যে যেভাবে ধর্মকে ধরিয়া রাখা হয় তাহাও অন্যায়, যেমন অন্যায় রসনার তৃপ্তির জন্য লাগাম ছাড়িয়া দিয়া যথেচ্ছ আহার করা। ১৫

অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখিয়াছি যে মৌন অভ্যাস করা সত্যের পূজারীর

আত্মসংযমের অঙ্গ। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, সত্যকে অতিরঞ্জিত করা, সত্য গোপন করা বা তাহার উপর প্রলেপ দেওয়া মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, আর এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করিতে হইলে মৌন বিশেষ প্রয়োজন। যিনি কম কথা বলেন তিনি প্রত্যেকটি কথা মাপিয়া উচ্চারণ করেন, ভালো করিয়া না চিন্তা করিয়া কোনো কথা বলেন না। ১৬

মৌন থাকা আমার শরীর ও মন দুইয়ের পক্ষেই অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে ইহা আরম্ভ করি কাজের চাপ কমাইবার জন্য; তারপরে লেখার জন্য অবকাশ লাভের উদ্দেশ্যে মৌন থাকা দরকার হইল। কিছুকাল অভ্যাসের পর আমি ইহার আধ্যাত্মিক মূল্য দেখিতে পাইলাম। বিদ্যুৎ-চমকের মতো আমি দেখিলাম, এই সময়টিতেই আমি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারি। এখন তো আমার মনে হয়, মৌন আমার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। ১৭

সেলাই-করা ঠোঁটে চুপ করিয়া থাকায় যে মৌন, তাহা মৌন নয়— জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তাহা তো মৌন নয়। কথা বলিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যিনি একটি বাজে কথা বলেন না তিনিই প্রকৃত মৌনী। ১৮

যে-প্রাণশক্তি সকল জীবসৃষ্টির মূলে, তাহার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ-সাধন হইতেই সকল শক্তি সঞ্জাত হয়। এই প্রাণশক্তি অবিরত এবং অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজের দ্বারা বা অবাঞ্ছিত, অসংযত, লক্ষ্যহীন চিন্তার দ্বারা বিপর্যস্ত হইতেছে। সকল কর্ম ও বাক্যের মূলেই আছে চিন্তা, তাই চিন্তার উৎকর্ষের উপর কর্ম ও বাক্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। পরিপূর্ণ সুসংযত চিন্তার শক্তি অপরিসীম।... মানুষ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, এ-কথা যদি সত্য হয় তবে তাহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগমাত্রই স্বয়ংক্রিয় শক্তি হইতে পারে। কিন্তু যেমন-তেমন ভাবে শক্তির অপচয় করিলে তাহা কখনোই সম্ভব নহে। ১৯

চিন্তায় সম্ভোগ অপেক্ষা দৈহিক সম্ভোগ ভালো। সম্ভোগের বাসনা মনে উদয় হওয়া মাত্র মন্দ জ্ঞানে তাহাদের চাপা দেওয়া ভালো, কিন্তু দেহে সম্ভোগ করা যাইতেছে না বলিয়া মনে মনে সেই চিন্তায় ডুবিয়া থাকার অপেক্ষা দেহের কামনার তৃপ্তিসাধন করা শ্রেয়ঃ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ২০

যৌন পিপাসা সুন্দর ও মহান জিনিস, ইহাতে লজ্জার কিছু নাই। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সৃজন করা, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার ঈশ্বর ও মানবতা উভয়েরই বিরোধী। ২১

পৃথিবী আজ যেন শুধু নশ্বর জিনিসের অভিমুখে ছুটিয়াছে, অন্য দিকে চাহিবার তাহার অবসর নাই। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে শাশ্বত জিনিসেরই মূল্য বেশি। এরূপ একটি নিত্য বস্তু হইল ব্রহ্মচর্য।

ব্রহ্মচর্য কি? যে-জীবনধারা আমাদের ব্রহ্মের দিকে বা ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায় তাহাই ব্রহ্মচর্য। সন্তান-প্রজনন-ক্রিয়ায় পূর্ণ সংযম ইহার অঙ্গ। চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে এই সংযম থাকা চাই। চিন্তার মধ্যে সংযম না থাকিলে অন্য দুই সংযমের কোনো মূল্য নাই।... চিন্তা যাহার বশে, অন্য সব তো তাহার কাছে ছেলেখেলা। ২২

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার কোনো রক্ষাকবচের দরকার হয় না ইহা সত্য— কিন্তু ব্রহ্মচর্য-পথের যিনি পথিক, তাঁহার ইহাতে প্রয়োজন আছে। কচি আমগাছকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিতে হয়; মায়ের কোল হইতে শিশু দোলনা আশ্রয় করে— দোলনার পরে ঠেলাগাড়িতে, ক্রমে বড় হইয়া সাহায্য বিনাই চলিতে শেখে। দরকার ফুরাইলেও আশ্রয় অবলম্বন করা অনিষ্টকর।

আমার মনে হয় প্রকৃত ব্রহ্মচারীর এ-সব বিধিনিষেধের প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে চাপানো বিধিনিষেধ দিয়া ব্রহ্মচর্য শিক্ষা করা যায় না। নারী-সংস্পর্শ হইতে যে দূরে পলাইয়া গেল, ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত অর্থ সে বুঝিবে না। যতই কেন সুন্দরী রমণী আসুক, যৌন আকর্ষণ না থাকিলে মনে তো কোনো ছাপ পড়িবে না।

প্রকৃত ব্রহ্মচারী মিথ্যা সংযম পরিহার করিয়া চলিবে। নিজের শক্তি বুঝিয়া প্রয়োজনীয় বাঁধের ব্যবস্থা করিবে, যখন সময় আসিবে তখন সেই বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিবে। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য কি তাহা বুঝিয়া, তাহার মূল্য হৃদয়ংগম করিয়া, অবশেষে এই অমূল্য বস্তুটির সাধন করিতে হয়। আমার বিশ্বাস দেশের কাজের জন্য এই ব্রহ্মচর্য পালন করা দরকার। ২৩

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি, যতদিন স্ত্রীকে আমার কামনার বস্তু বলিয়া জানিতাম ততদিন পরস্পরের মধ্যে সত্যকারের পরিচয় হয় নাই। আমাদের ভালোবাসা তখন উচ্চগ্রামে উঠে নাই। প্রীতির বন্ধন অবশ্যই

ছিল। কিন্তু যখন আমরা সংযম অভ্যাস করিলাম তখনই পরস্পরের নিকটতর হইলাম। আমার স্ত্রীর কোনো সময়েই সংযমের অভাব ছিল না। অনেক সময় তিনি রাশ টানিতে চাহিতেন, কিন্তু অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও আমাকে বাধা দিতেন না। যতক্ষণ আমার লালসা ছিল ততক্ষণ আমি তাহার কোনো উপকার করিতে পারি নাই। যে-মুহূর্তে আমি স্থূল সম্ভোগের জীবনধারা পরিত্যাগ করিলাম, আমাদের সম্বন্ধ আত্মিক সম্বন্ধে পরিণত হইল। কামনার মৃত্যু হইল, প্রেম আসিয়া সিংহাসন পাতিল। ২৪

ব্রহ্মচর্যে বাহিরের সাহায্য হিসাবে আহারে সংযম যেমন দরকার, উপবাসও তেমনি। ইন্দ্রিয়ের শক্তি এত দুর্বার যে উপর হইতে, নিম্ন হইতে, সব-রকমে আঁট-ঘাট বাঁধিয়া চলিলে তবেই তাহাদের সংযত রাখা যায়। অনাহারে তাহাদের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, তাই ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য উপবাস করায় সুফল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপবাসে ইন্দ্রিয় জয় করা সম্ভব হইবে বলিয়া যাহারা যন্ত্রের মতো অনশন পালন করিয়া শরীরকে অনাহারে রাখে, অথচ অনশনের শেষে কি কি সুখাদ্য ও সুপেয় খাইবে সেই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের পক্ষে অনশনের কোনো মূল্য নাই। এরূপ অনশনে জিহ্বা বা লালসা কোনোটারই সংযম হয় না। দেহের অনশনের সঙ্গে মন যখন একযোগে কাজ করে, শরীরকে যে-বস্তু হইতে বঞ্চিত করা হয়, মনও যদি তাহাতে বীতরাগ হয়, তখনই উপবাসের শক্তি কার্যকরী হয়। মন সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখের মূলে। সেজন্য বলি, উপবাসের শক্তি সীমাবদ্ধ, কেননা উপবাসী থাকিয়াও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হওয়া সম্ভব। ২৫

সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রলোভন সত্ত্বেও সর্ব অবস্থায় যদি তাহা পালন করা হয় তবেই তাহাকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া যায়। সুন্দরী রমণী দেখিয়া মর্মরপ্রস্তর-নির্মিত পুরুষমূর্তির কোনো বিকার হইতে পারে না। প্রকৃত ব্রহ্মচারীও রমণীকে দেখিয়া তেমনি নির্বিকার থাকেন। প্রস্তরমূর্তি যেমন হাত পা কাজে লাগাইতে পারে না— ব্রহ্মচারীও পাপকার্য হইতে সর্বদা বিরত থাকিবেন।

তোমাদের যুক্তি এই যে, নারীসঙ্গ, নারীসন্দর্শন আত্মসংযমের পক্ষে ব্যাঘাত-স্বরূপ, অতএব নারীসঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যুক্তিটা ভুল। কারণ নারীসান্নিধ্য যখন কাজের জন্য প্রয়োজন, তখনো তাহা হইতে দূরে গিয়া যে ব্রহ্মচর্য-পালন তাহা ব্রহ্মচর্য নামের যোগ্য নয়। ইহা কেবল

শরীর-বৈরাগ্য। ইহার পশ্চাতে অত্যাবশ্যক মানসিক আসক্তি-হীনতা নাই, সেজন্য কার্যকালে ইহা আমাদের ত্যাগ করে। ২৬

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কুড়ি বৎসর আমি পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ছিলাম। হ্যাভলক্ এলিস, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো মনীষীদের যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা বই পড়িয়া তাঁহাদের মতামত জানিয়াছি। তাঁহারা সকলেই চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ, উঁচুদরের মনীষী ব্যক্তি; নিজেদের মতামতের জন্য ও তাহা প্রচারের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছেন। বিবাহ অনুষ্ঠান এবং ঐরকমের প্রচলিত নৈতিক বিধি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াও— এ বিষয়ে অবশ্য তাঁহাদের মত আমার মতের সঙ্গে মেলে না— পবিত্রভাবে জীবন যাপন করার সম্ভাব্যতা ও বাঞ্ছনীয়তার সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। পশ্চিমে এমন অনেক নারী ও পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে, যাঁহারা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি মানেন না, কিন্তু যথার্থ শুদ্ধ-পবিত্র জীবন যাপন করেন। আমার অনুসন্ধান অনেকটা ঐ পথে। যদি তুমি সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব কর ও তাহা সম্ভব বলিয়া মনে কর, আর বর্তমান কালের উপযোগী নূতন সামাজিক ও নৈতিক প্রথা গড়িয়া তুলিতে চাও, তবে অন্যকে তোমার মতে আনিবার বা অন্যের বিশ্বাস উৎপাদনের প্রশ্ন ওঠে না। কতদিনে লোকমত গঠিত হইবে, সংস্কারকের সেজন্য বসিয়া থাকা চলে না— তাহাকে পথ দেখাইতে হইবে, বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে একলা চলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্যের প্রচলিত অর্থকে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ও ঢালিয়া সাজাইতে চাই— নিজে তাহা পালন করিয়া, সে বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়া, ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া। তাই কোনো পরিস্থিতিতেই আমি পলাইয়া বাঁচিতে বা এড়াইয়া যাইতে চাই না। বরং সাহসে ভর করিয়া, অবস্থা আমাকে কতদূর লইয়া যায়, আমারই বা মনোভাব কি হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আমার ধর্ম মনে করি। ভয়ে নারীর সংস্পর্শ বর্জন করা ব্রহ্মচর্য-সাধকের শোভা পায় না। আমি কখনো কামনার পরিতৃপ্তির জন্য যৌন-সংসর্গ বরণ করি নাই। মন হইতে যৌন প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ মুছিয়া গিয়াছে এরূপ দাবি আমি করিতে পারি না। কিন্তু প্রবৃত্তি আমার বশে. এই দাবি করিতে পারি। ২৭

জন্মনিয়ন্ত্রণের পিছনে যে যুক্তি তাহা সম্পূর্ণ ভুল এবং বিপজ্জনক। জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থনকারীরা বলেন যে. জৈব প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন কেবল যে বৈধ তাহা নয়, তাহার নিরোধে মানুষের শক্তির বিকাশ ও উন্নতির ব্যাঘাত হয়, কর্তব্য-সাধনে বিঘ্ন জন্মায়। আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত।

যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তাহার কাছে আত্মসংযম আশা করা বৃথা। বলিতে কি, যাহারা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচার করিতে চান তাঁহারা ধরিয়াই লইয়াছেন যে যৌন-প্রবৃত্তি সংযম করা অসম্ভব। এই সংযম অসম্ভব, অনাবশ্যক, বরং ক্ষতিকর, এরূপ মনে করিলে তো সমস্ত ধর্মকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ আত্মসংযমের ভিত্তির উপরই ধর্মের সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। ২৮

কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ আবার তুলিতে চাই। ন্যায্য ঋণ পরিশোধ যেমন অবশ্যকর্তব্য, যৌন প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনও মানুষের তেমনি কর্তব্য; তাহা অমান্য করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া যায়— এই-সব কথা আমাদের কানে ভরিয়া মনে গাঁথিয়া দেওয়া হয়। এই যৌন সম্ভোগের সঙ্গে সন্তান-প্রজননের যোগ নাই— কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের যাঁহারা সমর্থক তাঁহাদের মতে স্বামী-স্ত্রী যখন সন্তানের জন্ম দিতে চাহেন তখন ভিন্ন অন্য সময়ে গর্ভধারণের দুর্ঘটনা কৃত্রিম উপায়ে নিরোধ করা দরকার। আমি বলিব, সকল দেশের পক্ষেই এই নীতির প্রচলন বিপজ্জনক; বিশেষত ভারতের মতো দেশে, যেখানে প্রজননবৃত্তির অপপ্রয়োগের ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষেরা মূঢ় ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। যৌন সম্ভোগ বা বাসনার চরিতার্থতা যদি অবশ্যকর্তব্য হয় তবে অবৈধ সম্ভোগ ও অন্য নানাপ্রকার উপায়কেও সমর্থন করিতে হয়। পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও অবৈধ সম্ভোগকে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু একবার যদি এই উপায় ভদ্র সমাজের সমর্থন পায়, তবে ছেলেমেয়েদের মধ্যেও নিজের নিজের এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বাসনা দুর্বার হইয়া উঠিবে। অল্প লোকেই জানে চোখে ধুলা দিয়া মানুষ যৌন তৃপ্তির জন্য এতদিন যে-সব উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পরিণাম কি। আমার মতে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধও তাহাদেরই শামিল। এই-সব গোপন পাপপ্রণালী ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের কত ক্ষতি করিয়াছে, আমার অজানা নয়। বিজ্ঞানের নামে গর্ভনিরোধের উপকরণের প্রবর্তন ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা তাহার অনুমোদনে, জটিলতা আরো বাড়াইয়াছে, এবং যে-সকল সংস্কারক সমাজের শুচিতার জন্য কাজ করেন তাহাদের কর্তব্য এখনকার মতো প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। এ-কথা গোপন নয় যে, অনেক কুমারী আছে, যাহাদের বয়স কাঁচা, স্কুল-কলেজের ছাত্রী, তাহারাও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা আগ্রহের সহিত পড়ে এবং গর্ভনিরোধের উপকরণ সঙ্গে রাখে। বিবাহিতা রমণীদের মধ্যে ইহার প্রয়োগ আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। বিবাহের উদ্দেশ্য ও

শ্রেষ্ঠ উপযোগ অর্থে যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই ধরা হয়, এরূপ তৃপ্তির স্বাভাবিক পরিণামের কথা ভাবা হয় না, তখন বিবাহের পবিত্রতা চলিয়া যায়। ২৯

আমাকে যোগী বলা ভুল। আমার জীবনের নিয়ামক আদর্শগুলি মনুষ্য-সাধারণের স্বীকৃত। ক্রমবিবর্তনের পথে আমি সেই-সব লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছি। প্রতিটি ধাপে আমি ভাবিয়া, বিশেষ বিবেচনা করিয়া, দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে পথ অতিক্রম করিয়াছি। আমার অহিংসা ও আত্মসংযম জনসেবার কাজের আহ্বানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ। দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকা-কালে কি গৃহস্থ হিসাবে, কি আইন ব্যবসায়ী রূপে, কি সমাজ সংস্কারের কাজে, কি রাজনৈতিকের জীবনে, আমাকে যে একক জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল তাহাতে আমাকে কি স্বদেশবাসী, কি বিদেশী, সকলের সম্পর্কে ব্যবহারে, সূক্ষ্মতম সত্য ও অহিংসার পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, ভোগ-সম্ভোগের জীবনকে কঠিন শাসনে বাঁধিতে হইয়াছিল। আমি অতি সাধারণ মানুষ, সাধারণের চেয়ে বেশি শক্তি আমি দাবি করি না। অনেক কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে যে অহিংসা ও সংযমের শক্তি আমি লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য কোনো বাহাদুরি আমার নাই। ৩০

আমি মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছি— ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার একক পথে কোনো পার্থিব সঙ্গীর প্রয়োজন নাই। মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে মনে যাহারা আমাকে ভণ্ড প্রতারক মনে করে, তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করুক। যে লক্ষ লক্ষ লোক আমাকে মহাত্মা বলিবেই, তাহাদের ভুল ভাঙিয়া যাইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, এইভাবে মিথ্যা খ্যাতির মুখোশ খুলিয়া দিবার সম্ভাবনায় আমার আনন্দই হয়। ৩১

আন্তর্জাতিক শান্তি

একজন ব্যক্তি, ব্যক্তিহিসাবে অধ্যাত্ম-সম্পদে ধনী হইবেন, অথচ তাঁহার চারিদিকে সকলে কষ্ট পাইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমি অদ্বৈতে বিশ্বাসী। আমি মানুষের, আর শুধু তাহাই বা কেন, সকল প্রাণীর, মূলগত ঐক্যে বিশ্বাসী। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি, যদি একজনেরও অধ্যাত্ম-জগতে লাভ হয়, সমস্ত জগৎই তাঁহার সহিত লাভবান হইবে, আর একজন ব্যর্থ হইলে সমস্ত জগৎ তাঁহার সহিত ব্যর্থতা ভোগ করিবে। ১

শুধু ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ উদ্দেশ্য লইয়া কোনো একটি গুণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, ব্যক্তির কল্যাণ কোনো একটি গুণের উদ্দেশ্য নয়। বিপরীত পক্ষে, এমন কোনো অপরাধ নাই যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অপরাধী ছাড়াও আরো অনেকের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি ভালো কি মন্দ, তাহা তাহার নিজের ব্যাপার শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সম্প্রদায়ের, তথা সমগ্র জগতের ব্যাপার। ২

প্রকৃতিতে বিকর্ষণ যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আকর্ষণ প্রকৃতির প্রাণ। পারস্পরিক প্রেম প্রকৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মানুষ ধ্বংসের দ্বারা বাঁচে না। আত্মপ্রীতি অন্যের প্রতি ভালোবাসার প্রেরণা যোগায়। জাতিতে জাতিতে সংযোগ হয়, কারণ সেই-সব জাতি যে-সকল ব্যক্তি দ্বারা গঠিত, সেই-সকল ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে।

জাতীয় নীতি একদিন আমাদিগকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করিতে হইবে, যেমন আমরা পারিবারিক বিধান প্রসারিত করিয়া জাতি গঠন করিয়াছি। জাতি অর্থে বৃহত্তর পরিবার। ৩

সমগ্র মানবজাতি এক। কারণ সকলেই সমানভাবে নৈতিক বিধানের অধীন। ভগবানের চোখে সকলেই সমান। অবশ্য জাতিগত, অবস্থাগত, ইত্যাদি বিরোধ থাকিবে। কিন্তু মানুষের অবস্থা যতই উন্নত হইবে ততই তাহার দায়িত্বও বাড়িবে। ৪

কেবল ভারতবর্ষের মনুষ্য-সমাজের সৌভ্রাতৃত্ব সাধন আমার উদ্দেশ্য নয়। আজ যদিও নিঃসন্দেহে উহা আমার সমগ্র জীবন ও সময় অধিকার করিয়া

লইয়াছে, তাহা হইলেও শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই আমার লক্ষ্য নয়, আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চিন্তা কার্যে পরিণত করিয়া, সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের সাধনা প্রচার করিতে ও প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। আমার দেশভক্তি নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চায় না, সকলকে জড়াইয়া থাকে; এবং যে-দেশভক্তি অন্যান্য জাতির দুর্দশা ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-দেশভক্তি আমি বর্জন করি। আমার দেশভক্তির সাধনা ইহা ভিন্ন আর কিছু নয়— সর্বদা, সকল ক্ষেত্রে, কোনো ব্যতিক্রম না রাখিয়া, বিশাল মানবসমাজের সর্বপ্রসারিত কল্যাণের সুসমঞ্জস সাধনা। শুধু তাহা নয়, আমার ধর্ম ও আমার ধর্ম হইতে যে-দেশভক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সকল জীবন ব্যাপিয়া আছে। আমি ভ্রাতৃত্ব বা সমত্ব অনুভব করিতে চাই শুধু যাহারা মানুষ বলিয়া পরিচিত তাহাদের সঙ্গে নয়, সকল প্রাণীর সহিত এমন-কি যাহারা ভূমির উপর বুক দিয়া হাঁটে, তাহাদের সঙ্গেও। যদি কাহারো মনে আঘাত না দিই তবে বলিব, যে-সকল জীব বুকে হাঁটিয়া বেড়ায় তাহাদের সঙ্গেও সমত্ব উপলব্ধি করিতে চাই: কারণ, আমরা সকলেই সেই একই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, এবং যে-রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, সকল জীবন মূলত এক না হইয়া পারে না। ৫

জাতীয়তাবাদী না হইয়া কেহ আন্তর্জাতীয়তাবাদী হইতে পারে না। আন্তর্জাতিকতা তখনই সম্ভব যখন জাতীয়তা সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন বিভিন্ন দেশের লোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একজন লোকের মতো কাজ করিতে শিখিয়াছে। জাতীয়তাবাদ দৃষ্য নহে। দৃষ্য হইল সেই সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, যাহা আধুনিক জাতিগুলির অভিশাপ। একে অন্যকে শোষণ করিয়া লাভবান হইতে চায়, অন্যকে দলিত করিয়া দাঁড়াইতে চায়। ৬

আমি এই ভারতের একজন দীন সেবক এবং ভারতের সেবা করিতে গিয়া মানবসমাজেরই সেবা করি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সাধারণের হিতকল্পে জীবন যাপন করিয়া আজ এ-কথা বলিতে পারি যে, জাতিসেবা ও বিশ্বসেবার মধ্যে যে কোনো অসংগতি নাই, এই মতে আমার বিশ্বাস বাড়িয়াছে। এই মতবাদ হিতকর ও সত্য মতবাদ, শুধু ইহা স্বীকার করিয়া লইলেই জগতের অবস্থা শান্ত হইবে; আমাদের এই ভূমণ্ডলে যে-সব জাতি বাস করিতেছে তাহাদের পরস্পরে হিংসাদ্বেষ থামিয়া যাইবে। ৭

স্বয়ংসম্পূর্ণতার মতো পরস্পর-নির্ভরতাও মানুষের আদর্শ ও আদর্শ

হওয়াই উচিত। মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্বন্ধ না থাকিলে সে বিশ্বের সঙ্গে তাহার ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার আমিত্বও দাবাইয়া রাখিতে পারে না। সামাজিক জীবনে পরস্পর-নির্ভরতার দ্বারাই বাস্তবের কষ্টিপাথরে সে তাহার বিশ্বাসের ও নিজের পরীক্ষা করিতে পারে। মানুষ যদি পরনির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারিত অথবা নিজেকে তাহার ঊর্ধ্বে রাখিতে পারিত, তাহা হইলে সে এতই অহংকারী ও উদ্ধত হইয়া উঠিত যে, সত্যসত্যই সে পৃথিবীর ভারস্বরূপ ও আবর্জনা বলিয়া গণ্য হইত। সমাজের উপর নির্ভরতার ফলে সে মনুষ্যত্বের শিক্ষা লাভ করে। এ-কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না যে, মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় যাহা-কিছু তাহা নিজেই সংগ্রহ করিতে পারা উচিত, কিন্তু যখন স্বয়ংসম্পূর্ণতার উৎকট পরিণামে সে সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, তাহা যে প্রায় পাপেরই তুল্য, এ-কথাও আমার কাছে সমান স্পষ্ট। তুলার উৎপাদন হইতে সুতাকাটা পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াতেই মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে না। কোনো-না-কোনো স্তরে তাহাকে নিজের পরিজনের সাহায্য লইতে হয়। আর যদি কেহ নিজের পরিবারের সাহায্য লইতে পারে, তবে প্রতিবেশীর সাহায্যই বা লইতে পারিবে না কেন? অন্যথা এই মহাবাণীরই বা কি অর্থ থাকে যে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'? ৮

নিজের প্রতি কর্তব্য, পরিবারের প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি কর্তব্য এবং বিশ্বের প্রতি কর্তব্য— ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নাই বা একে অপর হইতে পৃথক নয়। নিজের অথবা পরিবারের ক্ষতি করিয়া কেহ যেমন দেশের সেবা করিতে পারে না, তেমনি দেশের ক্ষতি করিয়া কেহ বিশ্বের সেবা করিতে পারে না। চরম বিশ্লেষণের ফলে দেখি যে, পরিবারের জন্য নিজের জীবন দেওয়া প্রয়োজন, দেশকে বাঁচাইবার জন্য পরিবারকে বিসর্জন দিতে হয়, এবং বিশ্বের জন্য দেশকেও ছাড়িতে হয়। কিন্তু শুধু পবিত্র বস্তুই পূজায় উপহার দেওয়া যাইতে পারে, তাই প্রথম ধাপেই চাই আত্মশুদ্ধি। আত্মা শুদ্ধ থাকিলে আমাদের কর্তব্য কি তাহা সর্বদাই বুঝিতে পারিব। ৯

জগতের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপন এবং সমগ্র মানব-পরিবারকে এক মনে করা, ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। যে-ব্যক্তি স্বধর্মাবলম্বী ও অন্যধর্মাবলম্বীর মধ্যে পার্থক্য করে সে স্বধর্মীদের কুশিক্ষা দেয় এবং বিরোধ ও অধর্মের পথ খুলিয়া দেয়। ১০

আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঁচিয়া আছি ও তাহার জন্যই প্রাণ দিব, কেননা তাহাই আমার জীবনসত্য। একমাত্র স্বাধীন ভারতেই সত্যকার ঈশ্বরের পূজা হইতে পারে। আমি ভারতের স্বাধীনতার সাধনায় ব্রতী, কারণ আমার স্বদেশব্রত এই শিক্ষা দেয় যে, এইখানেই আমার জন্ম এবং এখানকার সংস্কৃতি আমি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি বলিয়া এদেশের সেবায় আমার সর্বাধিক যোগ্যতা ও সেই সেবা গ্রহণে ভারতের প্রথম অধিকার। কিন্তু আমার দেশভক্তি অন্য সকলকে বাদ দিয়া নয়। ইহার উদ্দেশ্য অন্য জাতির ক্ষতি সাধন হইতে বিরত থাকাই নয়, সকলের উপকারে আত্মনিয়োগ। ভারতের স্বাধীনতা আমি যেভাবে দেখি তাহাতে জগতের কোনো আশংকা থাকিতে পারে না। ১১

আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা চাই, কিন্তু অন্য দেশ শোষণ করিয়া বা তাহাকে খাটো করিয়া নয়। আমি ভারতের স্বাধীনতা চাই না, যদি তাহাতে ইংলণ্ড ধ্বংস হয় অথবা ইংরাজ জাতি নির্মূল হয়। আমি স্বাধীনতা চাই এইজন্য যে, অন্যান্য দেশ যেন আমার স্বাধীন দেশ হইতে কিছু শিখিতে পারে, যেন আমার দেশের সম্পদ মানবজাতির উপকারে প্রযুক্ত হইতে পারে। বর্তমান যুগে দেশভক্তি যেমন শিক্ষা দেয় যে পরিবারের জন্য ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য পরিবারকে, জেলার জন্য গ্রামকে, প্রদেশের জন্য জেলাকে, দেশের জন্য প্রদেশকে আত্মবলি দিতে হইবে, তেমনি বিশ্বের জন্য দেশকে বলি দেওয়া চাই আর তাহার পূর্বে দেশের স্বাধীন হওয়া দরকার। আমার জাতীয়তাবাদের সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ যে মানবজাতির রক্ষার জন্য যাহাতে সমগ্র দেশ আত্মবিসর্জন করিতে পারে, সেইজন্য আমি ভারতের স্বাধীনতা চাই— জাতিবিদ্বেষের সেখানে কোনো স্থান নাই। ইহাই হউক আমাদের জাতীয়তাবাদ। ১২

রাজ্যের সীমান্ত ছাড়াইয়া আমাদের সেবা আমাদের প্রতিবেশীদের কাজে লাগুক, সেবার কাজে কোনো গণ্ডি নাই। রাজ্যের সীমারেখা ভগবান সৃষ্টি করেন নাই। ১৩

আমার লক্ষ্য হইল সমগ্র জগতের সহিত সখ্য। অত্যাচারের কঠোরতম বিরোধিতার সঙ্গে আমি যেন পরম প্রেমকে যুক্ত করিতে পারি। ১৪

আমার কাছে দেশভক্তিও যা, মানবিকতাও তাই। আমি স্বয়ং মানুষ এবং মানব-দরদী বলিয়াই দেশভক্ত। ইহা বিচ্ছিন্ন নহে। ভারতের সেবার জন্য

আমি ইংলণ্ড বা জার্মানীর ক্ষতি করিব না। আমার জীবনদর্শনে সাম্রাজ্য-বাদের কোনো স্থান নাই। কুলপতির ধর্মে ও দেশভক্তের ধর্মে কোনো পার্থক্য নাই। মানবতার প্রতি দেশভক্ত যত মন্দোৎসাহ হইবেন ততই তাঁহার দেশভক্তি কম বলিতে হইবে। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। ১৫

আমাদের অসহযোগ ইংরাজের সহিত নয়, পাশ্চাত্যের সহিতও নয়। ইংরেজ যে-নীতি প্রবর্তন করিয়াছে, বস্তুবাদী সভ্যতা ও আনুষঙ্গিক লোভ ও শোষণ যে-নীতির সঙ্গে মিশিয়া আছে, সেই নীতির সহিত আমাদের অসহযোগ। আমাদের অসহযোগ হইল নিজেদের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া আনা, ইংরেজ সরকার যে-নীতিতে শাসন পরিচালনা করিতেছেন তাহার সহিত অসহযোগিতা করা। তাঁহাদিগকে আমরা বলি, এসো, আমরা যেমন বলি সেই শর্তে আমাদের সহিত সহযোগিতা করো, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ভালো, সমাজের ও জগতের পক্ষেও ভালো। আমাদের হাওয়ায় উড়াইয়া লইবে ইহা আমরা চাহি না। যে নিজে ডুবিতেছে সে অন্যকে রক্ষা করিতে পারে না। অন্যকে বাঁচাইবার ক্ষমতা লাভের আগে আমরা নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের নীতি বর্জনের নয়, আক্রমণের নয়, ধ্বংসের নয়। ইহা স্বাস্থ্যদায়ী, ধর্মসম্মত, সুতরাং মানবিকতার ভাবে পরিপূর্ণ। মানবিকতার জন্যই আত্মবলি দিবার আশা পোষণ করিবার পূর্বে তাহাকে বাঁচিবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ১৬

ইংলণ্ড হারিয়া যাক বা অবনতি স্বীকার করুক, তাহা আমার কাম্য নয়। সেণ্ট পলের ক্যাথিড্রাল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগে— কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির অথবা জুম্মা মসজিদ ভগ্ন হইয়াছে জানিলে যতখানি আঘাত বোধ করিতাম, ততখানি আঘাত বোধ করি। আমি জীবন দিয়া কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির, জুম্মা মসজিদ, এমন-কি সেণ্ট পলের গীর্জা রক্ষা করিতে চাই, কিন্তু তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য একটি জীবনও হানি করিব না। ইংরেজদের সঙ্গে এখানেই আমার মূল প্রভেদ। তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। ইংরেজ, কংগ্রেস-ওয়ালা, বা অন্য যাঁহাদের নিকট আমার স্বর পেঁছাইতেছে, তাঁহারা যেন কোথায় আমার সহানুভূতি, সে বিষয়ে ভুল না করেন। আমি ইংরেজ জাতিকে ভালোবাসি ও জার্মানিকে ঘৃণা করি, ইহা কারণ নয়। আমি মনে করি না যে, জাতিহিসাবে জার্মানরা বা ইটালিয়ানেরা ইংরেজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

আমাদের সকলের গায়ের একই পালিশ, আমরা এক মানবপরিবার-ভুক্ত। কোনো পার্থক্য-রেখা আমি টানিতে চাই না। ভারতীয়েরা উচ্চস্তরের লোক, এ দাবি আমি করি না। আমরা সকলেই দোষে-গুণে মানুষ। মানবসমাজ এমন-সব কুঠুরিতে বিভক্ত নয় যে একটি হইতে আর একটিতে যাওয়া যায় না। তাহারা এক হাজার কুঠুরিতে থাকিতে পারে, কিন্তু সকল ঘরের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক আছে। আমি এ-কথা বলিব না যে, ভারত সর্বেসর্বা হউক, বাদবাকি সংসার ধ্বংস হউক। এ বাণী আমার নয়। ভারত সর্বশক্তিমান হউক, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতির সমৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রাখিয়া। সমগ্র ভারতবর্ষকে ও ইহার স্বাধীনতাকে তবেই রক্ষা করিতে পারিব, যদি সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব-পরিবারের প্রতি আমার শুভ ইচ্ছা থাকে, শুধু ভারতবর্ষ নামক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে যাহারা থাকে তাহাদের জন্য নয়। অন্যান্য জাতির তুলনায় ইহা প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু বিশাল জগতে অথবা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ কতটুকু! ১৭

জগতের স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনায় বিশ্বাস না রাখিলে মানব-প্রকৃতির দেবত্বে অবিশ্বাস করা হয়। এ পর্যন্ত যে-সব উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে কিছুই হয় নাই, কারণ যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নির্ভেজাল আন্তরিকতার অভাব ছিল। তাঁহারা যে এই অভাব বুঝিয়াছিলেন তাহা নয়। যে-সব শর্তে সার্থকতা পাওয়া যায় সেই-সব শর্ত সম্পূর্ণভাবে পালন না করিলে রাসায়নিক সংযোগ-সাধন যেমন অসম্ভব, আংশিক শর্তপালন করিলে শান্তি প্রতিষ্ঠাও তেমনি অসম্ভব। মানবজাতির সর্বজনস্বীকৃত নেতৃবর্গ, মারণাস্ত্রের উপর যাঁহাদের আধিপত্য আছে, তাঁহারা যদি তাহাদের ক্রিয়া বুঝিয়া সেই-সব অস্ত্র ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হইত। ইহা তো স্পষ্টই অসম্ভব ব্যাপার, যদি না জগতের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ বর্জন করেন। ইহাও অসম্ভব, যদি বড় বড় জাতিগুলি আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্বাস বা আস্থা ত্যাগ না করেন, অভাববোধের বাহুল্য বর্জন না করেন ও সেই কারণে জাগতিক সম্পদ বৃদ্ধির অভিলাষ বর্জন না করেন। ১৮

আমি অবশ্য এ-কথা বলিতে চাই যে অহিংসার নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যেও চলিতে পারে। আমি জানি যে বিগত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে অনেকের মনে আঘাত লাগিতে পারে। কিন্তু অবস্থাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে গেলে আমাকে অবশ্যই তাহা করিতে হইবে।

আমি যতটা বুঝিয়াছি, উভয় পক্ষ হইতেই এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি। এ যুদ্ধ ছিল দুর্বলতর জাতিগুলির শোষণের ফলে লব্ধ লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া— যাহাকে মোলায়েম ভাষায় বলা যায় জগতের বাণিজ্য লইয়া। ইহা অবশ্যই দেখা যাইবে যে, ইউরোপকে যদি আত্মহত্যা না করিতে হয় তাহা হইলে ইউরোপে সাধারণ অস্ত্রবর্জন-নীতি একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে এবং কোনো-না-কোনো জাতিকে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বৃহৎ ঝুঁকি লইতেই হইবে। যদি সেই সুদিন কখনো আসে তবে সে-জাতির অহিংসার স্তর স্বভাবতই এত উঁচুতে উঠিবে যে, সকলে তাহাকে সম্মান করিবে। তাহার বিচার অভ্রান্ত হইবে, সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইবে, বীরোচিত আত্মত্যাগের ক্ষমতা মহান হইবে। তাহার জীবন হইবে নিজের জন্যও যেমন, অন্যান্য জাতির জন্যও তেমনি। ১৯

একটা কথা সুনিশ্চিত। অস্ত্রসংগ্রহের উন্মাদ প্রতিযোগিতা যদি চলিতেই থাকে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে এমন এক হত্যাকাণ্ড যাহা ইতিহাসে কখনো ঘটে নাই। যদি কেহ জয়ী হইয়া টিঁকিয়াও থাকে, তাহার পক্ষে জয়লাভই হইবে বাঁচিয়া মরার সমান। আসন্ন এই ধ্বংস হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই, যদি না সাহস করিয়া বিনা শর্তে অহিংসার পথকে, তাহার গৌরবময় সকল ব্যঞ্জনা সুদ্ধ, বরণ করা হয়। ২০

লোভ না থাকিলে অস্ত্রসজ্জার কোনো ব্যাপারই হইত না। অহিংসার নীতির পক্ষে প্রয়োজন শোষণের যে-কোনো পথ হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকা। ২১

শোষণের এই প্রবৃত্তি চলিয়া গেলেই অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা অসহ্য বলিয়া মনে হইবে। প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ আসিতে পারে না, যতক্ষণ জগতের জাতি-সমূহ পরস্পরের শোষণ হইতে নিবৃত্ত না হয়। ২২

এই জগৎ যদি বিশ্বমানবের জগৎ না হয়, তবে আমি এখানে বাস করিতে চাহি না। ২৩

মানুষ ও যন্ত্র

আমি প্রথমেই স্বীকার করি যে, অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে কোনো বাঁধাধরা বা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে বলিয়া মনে করি না। যে-অর্থনীতি কোনো ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক স্বার্থের হানিকর তাহা দুর্নীতি, এবং সেই কারণেই পাপদুষ্ট। যে-অর্থনীতিশাস্ত্র এক দেশকে অন্য দেশ শোষণ করিতে দেয় তাহা দুর্নীতিপূর্ণ। ১

আমাদের লক্ষ্য হইল পরিপূর্ণ মানসিক ও নৈতিক বিকাশের সহিত মানবের সুখ। নৈতিক এই বিশেষণটি আধ্যাত্মিকের সমার্থক বলিয়া প্রয়োগ করিতেছি। বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে। সমাজের অহিংস গঠনের সঙ্গে কেন্দ্রীকরণ-প্রথার কোনো সংগতি নাই। ২

আমি সুস্পষ্টভাবে আমার দৃঢ় ধারণা প্রকাশ করিতে চাই যে বিশ্বময় যে-সংকট দেখা দিয়াছে তাহার জন্য দায়ী— যন্ত্রের সাহায্যে ভূরি উৎপাদনের উন্মাদনা। এখনকার মতো ধরিয়া লইলাম যে মানুষের সকল প্রয়োজন যন্ত্র হইতে মিটিতে পারে। তথাপি ইহাতে উৎপাদন বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত থাকিবে বলিয়া বণ্টন নিয়মিত করিবার জন্য ঘোরা পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু যদি যে-অঞ্চলে প্রয়োজন সেই অঞ্চলেই উৎপাদন চলে তাহা হইলে বণ্টন আপনা-আপনি নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বঞ্চনার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে, ফাটকাবাজির কোনো আশঙ্কাও থাকিবে না। ৩

ক্রেতার প্রকৃত অভাব কি, সে কি চায়, ব্যাপক উৎপাদনে তাহার কোনো হদিস থাকে না। যদি ব্যাপক উৎপাদন নিজেই একটা গুণ হইত, সৃষ্টি-ধর্মী হইত, তাহা হইলে আপনা হইতেই ইহার অনন্তগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু স্পষ্টই দেখানো যায় যে ব্যাপক উৎপাদনের সীমা তাহার মধ্যেই নিহিত আছে। যদি সকল দেশই ব্যাপক উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিত, তবে উৎপন্ন দ্রব্যের নিমিত্ত যথেষ্ট বাজার থাকিত না এবং ব্যাপক উৎপাদনও নিশ্চয়ই তখন বন্ধ হইয়া যাইত। ৪

আমি বিশ্বাস করি না যে কোনো দেশে কোনো ক্ষেত্রে শিল্পীকরণের অবশ্য প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষে তো আরো নয়। সত্য বলিতে কি, আমি বিশ্বাস

কার যে, স্বাধীন ভারত নিপীড়িত জগতের প্রতি তাহার কর্তব্য একটিমাত্র উপায়ে পালন করিতে পারে— তাহার সহস্র সহস্র কুটিরের উন্নতি করিয়া তাহাতে সরল এবং উন্নত জীবন যাপনের মধ্য দিয়া জগতের প্রতি শান্তিপূর্ণ আচরণ করিয়া। কুবেরের পূজার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবল গতি-বেগের উপর ভিত্তি করিয়া যে জটিল বস্তুবাদী জীবন গড়িয়া উঠে, তাহার সহিত উন্নত চিন্তা খাপ খায় না। জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ তখনই সম্ভব যখন আমরা উন্নত জীবন যাপনের কলাকৌশল শিক্ষা করি।

বিপজ্জনকভাবে বাঁচিয়া থাকার একটা উত্তেজনা থাকিতে পারে। কিন্তু বিপদের মধ্যে বাঁচা ও বিপজ্জনকভাবে বাঁচায় প্রভেদ আছে। যে-ব্যক্তি শ্বাপদসংকুল ও ততোধিক হিংস্র ব্যক্তির দ্বারা অধ্যুষিত বনে নিরস্ত্র অবস্থায় একমাত্র ভগবান ভরসা করিয়া বাস করিবার সাহস রাখে, সে বিপদের মুখোমুখি বাস করে। আর যে-ব্যক্তি সর্বদা মধ্য-আকাশে বাস করে ও বিস্ময়বিমূঢ় জগতের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে সহসা ভূতলে অবতরণ করে সে বিপজ্জনকভাবে জীবন যাপন করে। একজনের জীবনের উদ্দেশ্য আছে, অন্যজনের নাই। ৫

বর্তমানকালে এই যে বিশৃঙ্খলা ইহার কারণ কি? কারণ হইল শোষণ। আমি বলিতে চাহি না যে, এ-শোষণ প্রবল জাতির দ্বারা দুর্বল জাতির শোষণ, ইহা এক ভগিনী-জাতির দ্বারা অপর ভগিনী-জাতির শোষণ। যন্ত্রের কল্যাণেই এইরূপ শোষণ সম্ভব হইয়াছে, যন্ত্রের বিরুদ্ধে ইহাই আমার মূল আপত্তি। ৬

ক্ষমতা থাকিলে আমি আজই এই প্রথার ধ্বংস করিতাম। যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে তাহাতেই প্রথাটি বিনষ্ট হইবে, তবে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করিতাম। তাহা হইতে বিরত থাকি শুধু এইজন্য যে, এরূপ অস্ত্রে বর্তমান কর্মকর্তাদের ধ্বংস হইলেও এই প্রথা থাকিয়াই যাইবে। যাহারা রীতি ধ্বংস না করিয়া মানুষকে ধ্বংস করিতে চায় তাহারা রীতিরই অনুসরণ করে, এবং যাহাদের ধ্বংস করে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। লোকের সঙ্গে প্রথারও উচ্ছেদ হইবে এই ভ্রান্ত বুদ্ধিতে তাহারা কাজ করে। এই পাপের মূল যে কোথায় সে-কথা তাহারা জানে না। ৭

যন্ত্রের একটা স্থান আছে এবং যন্ত্র শেষ পর্যন্ত থাকিবে। কিন্তু মানুষের যে-শ্রম আবশ্যক ইহাতে তাহা দূর করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। উন্নত

লাঙ্গল নিশ্চয় ভালো জিনিস, কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে একজন লোক তাহার আবিষ্কৃত কোনো যন্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষের সকল জমি চষিয়া ফেলিতে পারিত এবং উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের উপর তাহার একচেটিয়া অধিকার থাকিত, আর লক্ষ লক্ষ লোকের যদি অন্য কোনো কাজ না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের অনশনে থাকিতে হইত এবং নিষ্কর্মা হইয়া থাকিবার ফলে গণ্ডমূর্খ হইত— যেমন অনেকেই হইয়াছে। এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় আরো অনেক লোকের সব সময়েই পড়িবার আশঙ্কা আছে।

কুটীরশিল্পের উপযোগী যন্ত্রের প্রত্যেক উন্নতি আমি সাদরে গ্রহণ করিব; কিন্তু আমি জানি, হাতের পরিশ্রমের জায়গায় যন্ত্র-চালিত টাকুর প্রচলন দণ্ডনীয় অপরাধ, যদি না সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ চাষিকে তাহাদের ঘরে বসিয়া করিবার জন্য অন্য কোনো কাজ দেওয়া হয়। ৮

আমার আপত্তি যন্ত্রের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা যন্ত্র লইয়া খেপামির বিরুদ্ধে। পরিশ্রম বাঁচানোর জন্য যে যন্ত্র তাহারই জন্য লোকে পাগল। লোকে শ্রম বাঁচাইয়া চলিতে থাকে, শেষে হাজার হাজার লোক বেকার হইয়া পড়ে, রাস্তায় আসিয়া দাঁড়ায়, অনশনে প্রাণ হারায়। মানবজাতির একাংশের জন্য নয়, সকলের জন্যই আমি সময় ও শ্রম বাঁচাইতে চাই। টাকাকড়ি অল্প কয়েকজনের হাতে না জমিয়া সকলের হাতেই আসুক, ইহাই আমি চাই। আজ কলের একমাত্র কাজ হইল বহুলোকের স্কন্ধে সামান্য কয়েক-জনকে চাপাইয়া দেওয়া। এ-সমস্তের পিছনে যে-প্রেরণা তাহা শ্রম বাঁচাই-বার হিতৈষণা নয়, তাহা হইল লোভ। এই কাঠামোর বিরুদ্ধেই আমি আমার সকল শক্তি লইয়া সংগ্রাম করিতেছি।

সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষের কথাই সবার উপরে ভাবিতে হইবে। যন্ত্র যেন মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শুকাইয়া না ফেলে। দু-একটি ব্যতিক্রমের কথা বলি। সিঙ্গার সেলাই-কলের ব্যাপারটা ধরুন। এ-পর্যন্ত যে সামান্য কয়েকটি কাজের জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা তাহার অন্যতম এবং যন্ত্রটির আবিষ্কার সম্বন্ধে একটু রোমান্সও আছে। হাতে সেলাই করা এবং ফোঁড় দেওয়ার বিরক্তিকর কাজের পরিশ্রম হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য সিঙ্গার সেলাইকল তৈয়ারি করিলেন। শুধু নিজের স্ত্রীর নয়, যাহাদের কিনিবার সামর্থ্য আছে তাহাদের সকলেরই সেলাইয়ের পরিশ্রম বাঁচাইবার ব্যবস্থা তিনি এইভাবে করিয়া দিলেন।

আমি যাহা চাই তাহা হইল পরিশ্রমের ব্যবস্থার পরিবর্তন। এই-যে টাকাকড়ির জন্য পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি, ইহা থামাইতেই হইবে, এবং শ্রমিককে এমন কাজের ভরসা দিতে হইবে যাহাতে তাহার খরচ কুলায়

এবং সে-কাজ যেন নিতান্তই নীরস না হয়। এই-সব শর্ত মানিয়া চলিলে যে-লোক কল চালাইবে তাহার পক্ষে যন্ত্র যতখানি উপযোগী হইবে, ততখানি হইবে রাষ্ট্র এবং মালিকের পক্ষে।

এখনকার পাগলের মতো ছুটাছুটি থামাইতে হইবে এবং আমি যেমন বলিয়াছি সেইরূপ আকর্ষণীয় ও আদর্শ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রম করিবে। আমার মনে যে-সব ব্যতিক্রমের কথা আছে ইহা হইল তাহার একটি। সেলাইয়ের কলের পিছনে ছিল ভালোবাসা। একমাত্র সেরা কথা হইল মানুষ। মানুষের পরিশ্রম কিসে বাঁচে তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত লোভ নয়, মানবপ্রীতির সাধু প্রেরণা। এখন যেখানে লোভ আছে তাহার জায়গায় মানবপ্রীতিকে বসাইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। ৯

বর্তমানের কোনো শ্রমশিল্পকে হটাইবার উদ্দেশ্যে হাতে-কাটা চরকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইহা তাহার উদ্দেশ্যও নয়। যে-ব্যক্তি অন্যত্র তাহার শ্রম হইতে অর্থকরী বৃত্তি পাইতে পারে, এমন একজন লোককেও সুতা কাটার জন্য তাহার বৃত্তি হইতে সরাইয়া আনিতে বলে না। ইহার একমাত্র দাবি এই যে, ইহা ভারতবর্ষে সব সমস্যার বড় যে-সমস্যা তাহার একটি স্থায়ী সমাধান দিতে পারে— সে-সমস্যাটি হইল এই যে কৃষির পরিপূরক উপযুক্ত বৃত্তির অভাবে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ বৎসরের প্রায় ছয় মাস বাধ্য হইয়া বেকার থাকে এবং ফলে জনগণের মধ্যে অনশন লাগিয়াই থাকে। ১০

হাতে সুতা কাটার জন্য স্বাস্থ্যকর প্রাণপদ কোনো একটি শ্রমকর্ম ছাড়িবার কথা কল্পনাও করি নাই, পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা। চরকার সমগ্র ভিত্তিই এই তথ্যের উপর যে, ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক অর্ধ-বেকার। ইহা অনস্বীকার্য যে এরকম লোক না থাকিলে চরকা প্রবর্তনের কোনো অবকাশই থাকিত না। ১১

যে অনশন করিতেছে সে অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করিবার পূর্বে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির কথা ভাবে। সে তাহার স্বাধীনতা, এমন-কি সর্বস্ব বিক্রয় করিবে যদি তাহাতে আহার জোটে। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের এই অবস্থা। তাহাদের নিকট স্বাধীনতা, ভগবান, ইত্যাদি শব্দ শুধু কথার কথা, এতটুকু অর্থ নাই। এ-সব তাহাদের কানে বাজে। এই-সব লোকেদের যদি স্বাধীনতার বোধ দিতে চাই তবে তাহাদের এমন কাজ দিতে হইবে যাহা তাহারা অনায়াসে, তাহাদের নিঃসঙ্গ নিরানন্দ গৃহে বসিয়া

করিতে পারে, যাহা তাহাদের অন্ততঃ মোটা ভাত-কাপড় দেয়। শুধু চরকার দ্বারাই এই কাজ হওয়া সম্ভব। যখন তাহারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে ও নিজেদের খরচ চালাইতে পারিবে, তখন স্বাধীনতা, কংগ্রেস, প্রভৃতি বিষয়ে আমরা তাহাদের বলিতে পারিব। সুতরাং যাহারা তাহাদের কাজ আনিয়া দিবে, এক টুকরা রুটি জোগাইবার ব্যবস্থা করিবে, তাহারাই তাহাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারিবে। ১২

আধপেটা খাইয়া ভারতের জনগণ ধীরে ধীরে কিভাবে নির্জীব হইয়া পড়িতেছে শহরের লোকেরা সে সম্বন্ধে অল্পই খোঁজ রাখে। শহরবাসীদের সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য যে বিদেশী শোষণকারীদের জন্য কাজ করিয়া তাহার পরিবর্তে দালালির দ্বারা লব্ধ এবং এই লাভ ও দালালি যে জনগণকে শোষণ করিয়া পাওয়া, সে কথা তাহারা জানে কি না সন্দেহ। ব্রিটিশ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্র যে ভারতের জনগণকে এইভাবে শোষণ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত, সে কথা তাহারা অল্পই বোঝে। গ্রামে গ্রামে কঙ্কালসার মানুষ আমাদের নগ্ন দৃষ্টির সম্মুখে যে প্রমাণ রাখে, যুক্তির মারপ্যাঁচ, অঙ্কের বা সংখ্যার হাত-সাফাই দিয়া তাহার কাটান দেওয়া যায় না। উপরে ভগবান থাকিলে মানবতার বিরুদ্ধে এই যে অপরাধ, ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই, ইংলণ্ডকে ও ভারতের শহরবাসীকে একদিন না একদিন ইহার জন্য কৈফিয়ত দিতে হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ১৩

ভারতবর্ষের নিঃস্বতা ও তাহার দরুন আলস্য যদি এড়াইয়া যাওয়া যাইত তবে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রেরও উপযোগিতা আমি অনুমোদন করিতাম। দারিদ্র্য এবং কাজের ও সম্পদের দুর্ভিক্ষ এড়াইবার সহজ উপায় হিসাবেই আমি চরকায় সুতা কাটার কথা বলিয়াছি। চরকাটাই মূল্যবান যন্ত্র বিশেষ। আমার সাধ্যমতো ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া ইহার যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছি। ১৪

গ্রাম যদি ধ্বংস হয় ভারতবর্ষও ধ্বংস হইবে। ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকিবে না, জগতে তাহার নিজের বিশেষ কাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। শোষণ বন্ধ হইলে তবে গ্রামের পুনরায় বাঁচিয়া উঠা সম্ভব। ব্যাপক শিল্পীকরণের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিক্রয়ের সমস্যা দেখা দিবে বলিয়া স্বভাবতই স্পষ্ট বা গৌণভাবে গ্রামের শোষণ ঘটিবে। সুতরাং আমাদের সকল চেষ্টার লক্ষ্য হইবে যাহাতে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া প্রধানতঃ তাহার কাজে লাগাইবার

জন্যই হাতের পরিশ্রমে উৎপাদন করে। গ্রামশিল্পের এই চরিত্র যদি বজায় থাকে তবে গ্রামের লোকেরা যে-সব আধুনিক কলকব্জা নিজেরা করিতে পারে বা প্রয়োগ করিতে পারে সেই-সব কাজে লাগাইলে কোনো আপত্তি থাকিবে না। কেবলমাত্র অন্যকে শোষণ করিবার উপকরণ হিসাবে তাহাদের প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায় না। ১৫

প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য

যে অর্থনীতি-শাস্ত্র নৈতিক মানকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করে তাহা মিথ্যা। আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নৈতিক মান প্রবর্তন করাই হইল অর্থ-নৈতিক শাস্ত্রে অহিংস বিধানের সম্প্রসারণ। ১

আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষে, আর শুধু ভারতবর্ষেই বা কেন, সমস্ত জগতে অর্থনৈতিক কাঠামো এমন হওয়া উচিত যেন কোথাও খাওয়া-পরার অভাব না থাকে; অর্থাৎ ন্যূনতম ব্যয় নির্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জন করার জন্য প্রত্যেকের যথেষ্ট কাজ পাওয়া উচিত। সর্বত্রই এই আদর্শ কার্যকর করা যায়, শুধু যদি জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার মতো উৎপাদনের ব্যবস্থা জনগণের হাতে থাকে। ভগবানের বাতাস ও জল যেমন স্বচ্ছন্দ-ভাবে সকলে ভোগ করে এগুলির সম্বন্ধেও সেরূপ হওয়া উচিত, অন্যকে পীড়ন বা শোষণের জন্য এগুলিকে ব্যবসায়ের বাহন করিলে চলিবে না। কোনো দেশ, কোনো জাতি বা কোনো গোষ্ঠীর হাতে ইহাদের একচেটিয়া অধিকার গেলে অন্যায় হইবে। আমরা আজ শুধু আমাদের এই হতভাগ্য দেশেই নয়, জগতের অন্যান্য অংশেও দৈন্য ও দারিদ্র্য দেখিতেছি। এই সহজ নীতির অবজ্ঞাই তাহার কারণ। ২

আমার আদর্শ হইল, সমান বণ্টন। কিন্তু যতদূর দেখিতেছি তাহা কার্যে পরিণত হইবার নয়। সুতরাং আমার কাজ ন্যায্য বণ্টন যাহাতে হয় তাহাই করা। ৩

ভালোবাসা এবং একচেটিয়া অধিকার একত্র চলিতে পারে না। তত্ত্বের দিক হইতে পূর্ণ ভালোবাসা থাকিলে পূর্ণ অপরিগ্রহ থাকা উচিত। শরীর আমাদের সর্বশেষ সম্পত্তি। সুতরাং মানুষ যদি মানুষের সেবায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে তবেই সে পূর্ণ ভালোবাসার পরিচয় দেয় এবং তাহার অপরিগ্রহ সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু ইহা শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য। বাস্তব জীবনে আমাদের পক্ষে পূর্ণ ভালোবাসা দেখানো বড় একটা সম্ভব নয়, কারণ দেহরূপ সম্পত্তি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকিবে। মানুষ সর্বদাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং সর্বদাই তাহার কাজ হইবে পূর্ণতার সাধনা। ফলে যতদিন

বাঁচিয়া থাকিব প্রেমের সম্পূর্ণতা বা অপরিগ্রহের সম্পূর্ণতা আদর্শই থাকিয়া যাইবে, আমরা সেখানে পৌঁছাইতে পারিব না, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য অবিরত আমাদের সাধনা করা উচিত। ৪

আমি বলিতে চাই, আমরা এক প্রকারের পরস্ব-অপহারক। যাহাতে আমার এখনই প্রয়োজন নাই তাহা লইয়া যদি রাখিয়া দিই, সে তো অন্য কাহারো নিকট হইতে চুরি করাই হইল। আমি এতদূর পর্যন্ত বলিতে চাই যে, প্রকৃতি আমাদের প্রতিদিনের অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করে— ইহা হইল প্রকৃতির প্রাথমিক নিয়ম; এবং প্রত্যেকে যদি নিজের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই লইত তাহা হইলে জগতে ভিক্ষাবৃত্তি বলিয়া কিছু থাকিত না, এ-জগতে অনশনে কাহারো মৃত্যু ঘটিত না। আমি সমাজবাদী নই, যাহাদের সম্পত্তি আছে তাহাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে চাই না: কিন্তু এ-কথা বলিব যে, যাহারা অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখিতে চায় তাহাদের এই নিয়ম পালন করিতে হইবে। আমি কাহারো সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে চাই না, তাহা হইলে অহিংসা হইতে বিচ্যুত হইব। আমার অপেক্ষা যদি কাহারো বেশি সম্পত্তি থাকে থাক, কিন্তু আমার জীবন নিয়মিত করিতে হইলে প্রয়োজন নাই এমন বস্তু রাখিবার আমার স্পর্ধা নাই। ভারতবর্ষে ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীকে দিনে একবার আহার পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয় এবং সে আহারও একটি মাত্র চাপাটি ও একটু লবণ মাত্র, তাহাতে কোনো স্নেহদ্রব্য নাই। এই ত্রিশ লক্ষ লোক যতক্ষণ না আরো ভালো খাইতে-পরিতে পায় ততক্ষণ আপনার ও আমার, আমরা এই যাহা-কিছু ভোগ করিতেছি, তাহাতে কোনো অধিকার নাই। আপনি ও আমি, যাহারা ভালো করিয়া বুঝিব বলিয়া আশা করা যায়, আমাদের নিজ প্রয়োজন সেইমতো সংকোচ করিতে হইবে, এবং তাহারা যাহাতে ভালো খাইতে-পরিতে ও রোগে শুশ্রূষা পাইতে পারে, সেজন্য আমাদের এমন-কি স্বেচ্ছায় অনশন পর্যন্ত করিতে হইবে। ৫

অপরিগ্রহের সঙ্গে অচৌর্যের সম্পর্ক আছে— চৌর্যবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত না হইলেও, বিনা প্রয়োজনে সম্পত্তি রাখা চুরিরই নামান্তর। সম্পত্তির অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা। যে সত্যের সন্ধানে ফেরে, প্রেমনীতি যে অনুসরণ করে, সে আগামীকালের জন্য কিছু রাখিতে পারে না। ভগবান ভবিষ্যতের জন্য কখনো সঞ্চয় করেন না। যখন যাহা প্রয়োজন তাহার বেশি তিনি সৃষ্টি করেন না। যদি আমরা তাঁহার বিধানে আস্থা স্থাপন করি তবে আমাদের যাহা প্রয়োজন তিনি তাহা দিবেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত

থাকিতে হইবে। এই বিশ্বাস লইয়া যে-সকল সাধু ও ভক্তজন জীবন-যাপন করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিশ্বাসের হেতু খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ভগবান আছেন— দিনের পর দিন তিনি মানুষকে খাদ্য যোগান— এই বিধানের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বা অবহেলার জন্য বৈষম্য দেখা দিয়াছে, এবং আনুষঙ্গিক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা ধনী তাঁহাদের অতিরিক্ত সম্পদ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের প্রয়োজন নাই এবং সেই কারণে তাঁহারা অপচয় করেন, আর এ দিকে লক্ষ লক্ষ লোক পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অথবা অনশনে মৃত্যু বরণ করে। যদি প্রত্যেকে তাহার ঠিক প্রয়োজনটুকু রাখিত, তবে কাহারো কোনো অভাব থাকিত না, সকলেই সন্তোষে দিন যাপন করিত। দরিদ্রের তুলনায় ধনীর অসন্তোষও কম নয়— দরিদ্র লক্ষপতি হইতে চায়, লক্ষপতি কোটিপতি হইতে চায়। সম্পত্তি-বর্জনে ধনীদের পথ দেখাইতে হইবে, তাহা হইলে সন্তোষের ভাব সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। যদি তাঁহারা তাঁহাদের নিজের সম্পত্তি সীমার মধ্যে রক্ষা করেন, তবে যাহারা অনশনক্লিষ্ট সহজে তাহাদের আহারের সংস্থান হইবে, এবং ধনীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও সন্তোষের শিক্ষা লাভ করিবে। ৬

অর্থনৈতিক সমতা হইল অহিংস স্বাধীনতার পথে প্রবেশের একমাত্র উপায়। অর্থনৈতিক সমতার জন্য কাজ করার অর্থ হইল, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যকার চিরন্তন সংগ্রাম মিটাইয়া ফেলা। যে অল্প কয়েকজন ধনীর হাতে জাতির অধিকাংশ লোকের ধনসম্পত্তি সঞ্চিত হইয়া আছে, ইহা এক দিকে তাঁহাদের নামাইয়া আনিবে, অন্য দিকে অর্ধশনক্লিষ্ট বস্ত্রহীন লক্ষ লক্ষ লোককে উপরে টানিয়া তুলিবে। যতদিন ধনী ও নিরন্ন লোকের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকিবে, ততদিন অহিংস শাসনতন্ত্র অসম্ভব ব্যাপার। যে স্বাধীন ভারতে ধনিশ্রেষ্ঠ ও দরিদ্রতম ব্যক্তি একই শক্তির অধিকারী হইবে, সেখানে নয়াদিল্লীর প্রাসাদ ও দরিদ্রের শোচনীয় বস্তির বৈপরীত্য একদিনও টিঁকিতে পারিবে না। ধনসম্পত্তি ও তাহা হইতে লব্ধ ক্ষমতা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়া, সকলের কল্যাণের জন্য তাহা ভাগ করিয়া না লইলে, একদিন হিংসার রক্তরাঙা বিপ্লব আসিবেই। আমার অহিবাদ লইয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে; তাহা সত্ত্বেও আমি উহাতে বিশ্বাস করি। সেখানে পৌঁছানো কঠিন এ-কথা সত্য। অহিংসার অবস্থায় পৌঁছানোও কঠিন। ৭

সমভাবে বণ্টনের প্রকৃত অর্থ হইল এই, প্রত্যেকের স্বাভাবিক অভাব পূরণের সমস্ত ব্যবস্থা থাকিবে, তাহার বেশি থাকিবে না। যেমন যাহার হজমশক্তি প্রবল নয় তাহার যদি আধ পোয়া আটার প্রয়োজন হয়, আর

একজনের যদি আধ সের প্রয়োজন হয়, তবে উভয়েরই নিজের নিজের অভাব পূরণের ক্ষমতা থাকা উচিত। এই আদর্শকে কার্যে রূপ দিতে হইলে সমাজ-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজানো দরকার। অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত সমাজ অন্য আদর্শ পোষণ করিতে পারে না। এই আদর্শে পৌঁছাইতে আমরা হয়তো পারি না, কিন্তু ইহার কথা মনে রাখিয়া এই আদর্শে পৌঁছাইবার জন্য অবিরাম কার্য করিয়া যাইতে হইবে। যে-পরিমাণে আমরা কার্য করিয়া যাইব সেই পরিমাণে আমাদের সুখ ও সন্তোষ লাভ হইবে এবং সেই পরিমাণেই আমরা অহিংস সমাজ গঠনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব।

এখন দেখা যাক, অহিংস উপায়ে সমভাবে বণ্টন কিভাবে করা যাইতে পারে। যে-ব্যক্তি এই আদর্শকে তাহার জীবনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছে, এই পথে তাহার প্রথম সোপান হইবে, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের আবশ্যকমত পরিবর্তন করা। ভারতের দারিদ্র্যের কথা মনে রাখিয়া তাহার প্রয়োজনকে সর্বনিম্ন মাত্রায় আনিতে হইবে। তাহার আয়ের পথে অসাধুতা থাকিবে না, ফাটকাবাজি বা রাতারাতি বড়লোক হইবার ইচ্ছা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। নূতন জীবনের সহিত সংগতি রাখিয়া তাহাকে বাসস্থানেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আত্মসংযমের অনুশীলন চলিবে। যাহা-কিছু করা সম্ভব নিজের জীবনে সে-সব পালন করিবার পর বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সেই আদর্শ প্রচার করিবার যোগ্যতা তাহার হইবে।

সত্য কথা বলিতে কি, সমবণ্টনের এই নীতির মূলে রাখিতে হইবে অছি বা প্রতিভূবাদ— ধনীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ধনসম্পদের অধিকারী, তাঁহারা তাহার অছি বা প্রতিভূ। কারণ এই মত অনুসারে প্রতিবেশীদের চেয়ে তাঁহাদের একটা টাকাও বেশি থাকার কথা নয়। অহিংসার পথে কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে? ধনীদের ধনসম্পত্তির অধিকার কি কাড়িয়া লইতে হইবে? ইহা করিতে গেলে হিংসার আশ্রয় লইতে হয়। এই হিংসাত্মক কর্মে সমাজের উপকার হইতে পারে না; বরং সমাজ দরিদ্রতর হইবে, কারণ অর্থ আহরণ করিতে পারে এমন একজন লোকের কৃতিত্ব সমাজ হারাইবে। সুতরাং অহিংসার পথ স্পষ্টতই উৎকৃষ্টতর পথ। ধনী ব্যক্তি তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকুন, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য তিনি ব্যয় করুন, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ সমাজের জন্য গচ্ছিত থাক। এই যুক্তিতে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, অছি বা প্রতিভূ যিনি হইবেন তাঁহার সাধুতা থাকিবে।

কিন্তু যদি শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধনীরা দরিদ্রের প্রকৃত অভিভাবক না হন

এবং দরিদ্ররা পিষ্ট হইতে হইতে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে উপায় কি? এই সমস্যার সমাধান খুঁজিতে গিয়া আমি অহিংস অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে প্রকৃত ও অভ্রান্ত সাধন হিসাবে খুঁজিয়া পাইয়াছি। সমাজে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের সহযোগিতা না পাইলে ধনী ব্যক্তি ধন সংগ্রহ করিতে পারে না। দরিদ্রদের মধ্যে এই জ্ঞান যদি উদ্‌বোধিত হইত তাহা হইলে তাহারা শক্তিমান হইত, এবং যে-সকল বৈষম্যের পেষণে তাহারা অনশনজনিত মৃত্যুর দ্বারে গিয়া পৌঁছাইয়াছে তাহা হইতে অহিংসার দ্বারা কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায় তাহা শিখিয়া লইত। ৮

যে-সকল কাজ দরিদ্রের অবশ্য-করণীয় সেই কাজগুলি যদি আমরা প্রত্যেক দিন এক ঘণ্টা করিয়া করি এবং এইভাবে তাহাদের সঙ্গে, ও তাহাদের মধ্য দিয়া সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে, একাত্মতা অনুভব করি তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা উদারতর বা জাতীয়তার দিক দিয়া প্রশস্ততর কোনো কিছু কল্পনা করিতে আমি পারি না। দরিদ্রেরা যে পরিশ্রম করে, ভগবানের নামে আমিও তাহাদের জন্য সেই পরিশ্রমই করিব, ভগবানের পূজার ইহার চেয়ে প্রকৃষ্টতর উপায় কল্পনা করিতে পারি না। ৯

বাইবেল বলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আহার সংগ্রহ করো। ত্যাগ-স্বীকার অনেক প্রকারের হইতে পারে। খাদ্য-সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম তাহার অন্যতম। সকলে যদি নিজ নিজ খাদ্যের জন্য পরিশ্রম করিত আর তাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলে যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান হইত এবং সকলেরই যথেষ্ট অবকাশ থাকিত। তাহা হইলে এরকম জনবাহুল্য ঘটিত না, চারি দিকে রোগ ও দুরবস্থার এমন আর্তরবও শুনিতে হইত না। এরূপ পরিশ্রম ত্যাগের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচায়ক। লোকে তখন নিশ্চয় তাহাদের শরীর ও মন দিয়া অনেক কিছু করিবে, কিন্তু সে-সবের মূলে থাকিবে প্রেম— সকলের মঙ্গল সাধনা। তখন আর ধনী-দরিদ্র, উচ্চনীচ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কিছুই থাকিবে না। ১০

প্রশ্ন হইতে পারে, আমার তো খাটিয়া খাওয়ার প্রয়োজন নাই, আমি কেন সুতা কাটিব? কারণ, আমি যাহা খাইতেছি তাহা আমার নয়। দেশ-বাসীকে শোষণ করিয়া আমার জীবন চলিতেছে। তোমার পকেটে প্রত্যেকটি পয়সা কি করিয়া আসিল তাহার মূল যদি সন্ধান কর তবে যে-কথা বলিতেছি তাহা কত সত্য বুঝিতে পারিবে।

যে-সকল দরিদ্র বস্ত্রহীন লোকের কাজ দরকার তাহাদের কাজ না দিয়া,

যেরূপ বস্ত্রে তাহাদের প্রয়োজন নাই, সেই বস্ত্র দিয়া, তাহাদের অপমান করিতে আমি চাই না, আমি তাহাদের মুরুব্বি সাজিয়া অপরাধ করিব না, এবং তাহাদের দারিদ্র্যের জন্য আমিও দায়ী ইহা জানিয়া আমি তাহাদিগকে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য বা পরিত্যক্ত বস্ত্র কিছুই দিব না। বরং আমার আহার্যের ও বস্ত্রের যাহা-কিছু ভালো তাহাই দিব ও তাহাদের কর্মের সঙ্গী হইব।

ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এই ভাবিয়া যে সে তাহার খাদ্যের জন্য পরিশ্রম করিবে। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা খাদ্যের জন্য পরিশ্রম না করে তাহারা তস্কর। ১১

যতদিন একজনও সমর্থ পুরুষ বা নারী বিনা কাজে বা অনাহারে থাকে ততদিন নিজের বিশ্রাম করিবার কথা বা পেট ভরিয়া খাইবার কথায় আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। ১২

বিশেষ অধিকার এবং একচেটিয়া অধিকার আমি ঘৃণা করি। জনসাধারণের সঙ্গে যাহা ভাগ করিয়া না লইতে পারি তাহা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু। ১৩

আমার সমস্ত সম্পত্তি হইতে আমি নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি, ইহাতে জগৎ হাসিতে পারে, কিন্তু নিজের স্বত্ব ত্যাগ করায় আমার স্পষ্টই লাভ হইয়াছে। আমি চাই, লোকে সন্তোষের ব্যাপারে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। আমার সম্পত্তির মধ্যে উহাই তো শ্রেষ্ঠতম রত্ন। তাই এ-কথা বলাই হয়তো ঠিক যে, যদিও আমি দারিদ্র্যের কথা প্রচার করি, আমি নিজে একজন বিত্তবান ব্যক্তি। ১৪

কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নৈতিক অবনতি ছাড়া আর যে কিছু হইতে পারে এ-কথা কখনো কেহ বলিতে চাহে নাই। প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচিবার অধিকার আছে এবং সেই কারণে আহার সংগ্রহের ও বস্ত্র ও বাসস্থান সংগ্রহের অধিকার আছে। আর এই অতি সামান্য কার্যের জন্য আমাদের অর্থনীতিজ্ঞের বা তাঁহাদের আইন-কানুনের সাহায্যের দরকার হয় না।

'আগামীকালের জন্য ভাবিয়ো না,' ইহা এমন একটি আদেশ যাহা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুব্যবস্থিত সমাজে নিজের জীবিকা অর্জন করা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ হওয়া উচিত এবং তাহাই হইতে দেখা যায়। প্রকৃত কথা, দেশে কতজন ক্রোড়পতি আছে তাহার সংখ্যার দ্বারা নয়, দেশে জনগণের মধ্যে অনশনের একান্ত অভাবের দ্বারাই সুনিয়ন্ত্রিত দেশের পরিচয় সূচিত হয়। ১৫

যে সুস্থ ব্যক্তি কোনো সদুপায়ে আহারের জন্য শ্রম করে নাই তাহাকে বিনা মূল্যে আহার দেওয়া আমার অহিংসা-নীতি প্রশ্রয় দিতে পারে না। আমার ক্ষমতা থাকিলে প্রত্যেক সদাব্রত বন্ধ করিয়া দিতাম; ইহার ফলে জাতি অবনত হইয়াছে। ইহার ফলে আলস্য, কার্যে অনিচ্ছা, ভণ্ডামি, এমন-কি দণ্ডনীয় অপরাধ বাড়িয়াছে। ১৬

কবি তাঁহার কাব্যপ্রকৃতির অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যতের আশায় জীবন-যাপন করেন এবং আমরাও সেরূপ করি ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। প্রত্যূষে পক্ষিকুল স্তবগান গাহিতে গাহিতে ঊর্ধ্ব-আকাশে উড়িতে থাকে, তাহাদের সুন্দর চিত্র তিনি আমাদের সামনে ধরেন। এই-সব পাখি পূর্বদিনে তাহাদের দিনের খাদ্য খাইয়াছে, পূর্বরাত্রে বিশ্রামসুখে তাহাদের শিরায় শিরায় নূতন রক্ত সঞ্চালিত হইয়াছে। তবেই তাহারা উড়িতেছে। কিন্তু আমি বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি এমন-সব পাখি আছে যাহারা শক্তির অভাবে ওড়া তো দূরের কথা, ডানা পর্যন্ত নাড়িতে পারে না। ভারতবর্ষের আকাশে মানুষ-পাখি রাতে আরামের ছল করিয়া যখন প্রভাতে জাগিয়া উঠে তখন আরো দুর্বল হইয়াই জাগিয়া উঠে। এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের অদৃষ্টে হয় অনন্ত প্রহরা নয়তো অনন্ত সমাধি। এমন একটি বেদনাদায়ক অবস্থার বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়াই ইহার পরিচয় হয়। আমি দেখিয়াছি রোগক্লিষ্টকে কবীরের ভজন গাহিয়া সান্ত্বনা দেওয়া বা তাহার যন্ত্রণার উপশম করা যায় না। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত লোক শুধু একটি কবিতাই চায়— তাহা হইল প্রাণদায়ী খাদ্য। ইহা দিতে পারা যায় না, ইহা অর্জন করিতে হয়, এবং শুধু মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াই লোকে ইহা অর্জন করিতে পারে। ১৭

সুতরাং কল্পনা করুন, ত্রিশ কোটি লোককে কর্মহীন করিয়া অথবা অতি সামান্য কর্ম দিয়া রাখা কতদূর শোচনীয় ব্যাপার। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে অধঃপাতে যাইতেছে, ভগবানে বিশ্বাস হারাইতেছে। ওই-যে ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, যাহাদের চক্ষে জ্যোতি নাই, তাহাদের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করা, আর ওই-যে কুকুর বসিয়া আছে তাহার কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করা, একই কথা। তাহাদের সামনে পবিত্র কর্মরূপ বাণী লইয়াই শুধু ভগবানের বাণী প্রচার করিতে পার। দিব্য প্রাতরাশ খাওয়ার পর বসিয়া আছি, আশা করিতেছি মধ্যাহ্নভোজন আরো ভালো হইবে, এই সময় ভগবানের কথা বলা ভালো। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক, যাহাদের দুইবেলা আহার জোটে না, তাহাদের সামনে ভগবানের কথা কি

করিয়া বলিব? তিনি তাহাদের নিকট শুধু অন্নরূপেই দেখা দিতে পারেন। ১৮

যে-জাতি ক্ষুধায় ক্লিষ্ট অথচ অলস, তাহাদের নিকট ভগবান শুধু সেই কর্মরূপেই দেখা দিতে পারেন যে-কর্ম তাহাদের খাদ্যের ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দিবে। ১৯

দরিদ্রের পক্ষে অর্থনীতির ব্যাপারই হইল আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ওই-সকল অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের মনে আর কোনো ভাবে সাড়া জাগানো যায় না। অন্য কোনো ডাক তাহাদের স্পর্শও করিবে না। কিন্তু আহার লইয়া গেলে তোমাকেই তাহারা ভগবান বলিয়া মনে করিবে। অন্য কোনো চিন্তা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। ২০

অহিংস উপায়ে আমরা পুঁজিপতিকে ধ্বংস করিতে চাই না, চাই পুঁজি-বাদকে ধ্বংস করিতে। পুঁজিপতির নিকট আমাদের আবেদন, যাহাদের উপর তিনি তাঁহার পুঁজির সৃষ্টি, রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য নির্ভর করেন, তাহাদের অছি বা প্রতিভূ রূপে যেন তিনি নিজেকে বিবেচনা করেন। পুঁজিপতির হৃদয়-পরিবর্তনের জন্য কোনো কর্মীর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। পুঁজির যেমন শক্তি, কর্মেরও তেমন শক্তি। একটি অন্যটির উপর নির্ভর করে। উভয়ই সৃষ্টি অথবা ধ্বংসের জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কর্মী যে মুহূর্তে নিজের শক্তি অনুভব করে, সে পুঁজিপতির দাস হইয়া না থাকিয়া তাহার অংশীদারের জায়গায় বসিবার যোগ্য হয়। কিন্তু যদি সে-ই একমাত্র মালিক হইতে চায়, তাহা হইলে যে-মুরগিটি সোনার ডিম পাড়িতেছিল সম্ভবত তাহাকেই সে মারিয়া ফেলিবে। ২১

পশুপাখিদের মতো প্রত্যেক মানুষেরই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু-গুলির উপর সমান দাবি আছে। প্রত্যেক অধিকারের সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্ব ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে, আর থাকে সেই অধিকারের উপর আক্রমণ প্রতিরোধের উপযুক্ত উপায়। সুতরাং প্রাথমিক মূলগত সাম্য সপ্রমাণ করিবার জন্য অনুরূপ কর্তব্য এবং প্রতিকারের সদুপায় খুঁজিয়া বাহির করাই হইল আসল কথা। কর্তব্য হইল আমার হাত পা দিয়া খাটা, আর প্রতিকার হইল আমার শ্রমের ফল হইতে যে আমাকে বঞ্চিত করে তাহার সহিত অসহযোগ করা। আমি যদি ধনিক ও শ্রমিকের মূলগত সাম্য স্বীকার করি তবে ধনিকের ধ্বংস আমার লক্ষ্য হইবে না। তাহার হৃদয়ের

যাহাতে পরিবর্তন হয় আমি তাহারই চেষ্টা করিব। তাহার সহিত আমি অসহযোগ করিলে সে যে অন্যায় করিতেছে সে দিকে তাহার চোখ ফুটিতে পারে। ২২

এমন একটা সময় আসিবে বলিয়া আমি ভাবিতে পারি না যখন কেহ কাহারো চেয়ে ধনী থাকিবে না। কিন্তু আমার মনে এমন এক সময়ের ছবি আছে, যখন ধনীরা দরিদ্রদের বঞ্চিত করিয়া ধন সংগ্রহ করিতে ঘৃণাবোধ করিবে আর দরিদ্রেরা ধনীদের হিংসা করিবে না। সমাজ-ব্যবস্থা যতই নিখুঁত হউক, বৈষম্য আমরা এড়াইতে পারিব না, কিন্তু কলহ ও তিক্ততা আমরা নিশ্চয়ই এড়াইয়া চলিতে পারি। ধনী ও দরিদ্র সম্পূর্ণ বন্ধুভাবে বাস করিতেছে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের কেবল এরূপ দৃষ্টান্ত বাড়াইতে হইবে। ২৩

পুঁজিপতি এবং জমিদারেরা সকলেই যে প্রয়োজনের তাগিদে শোষণ করেন এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না যে তাহাদের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থ এই দুইয়ের মধ্যে মূলগত বা অনতিক্রম্য কোনো বিরোধ আছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, শোষিতের সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়াই সকল শোষণ ঘটিয়া থাকে। এ-কথা স্বীকার করিতে যতই ঘৃণা বোধ করি না কেন, কথাটা সত্য যে লোকে যদি শোষকের কথা না মানিত তবে শোষণ সম্ভব হইত না। দুইয়ের মাঝখানে স্বার্থ আসিয়া পড়ে, তাই যে-শৃংখল আমাদের বাঁধিয়াছে আমরা তাহাই আঁকড়াইয়া ধরি। এই অবস্থার শেষ করিতেই হইবে। জমিদার ও পুঁজিপতিদের ধ্বংস করিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, জনগণের এবং তাহাদের মধ্যে বর্তমানে যে-সম্পর্ক আছে তাহার রূপান্তর সাধন করিয়া সুস্থতর ও পবিত্রতর অবস্থা আনয়ন করিতে হইবে। ২৪

শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা আমার মনে কোনো সাড়া জাগায় না। ভারতবর্ষে শ্রেণী-সংগ্রাম শুধু যে অবশ্যম্ভাবী নয় তাহাই নয়, আমরা যদি অহিংসার বাণী বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে ইহা এড়ানো যায়। শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী এই কথা যাহারা বলিয়া বেড়ায় তাহারা অহিংসার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে নাই, অথবা শুধু ভাসা-ভাসা ভাবে বুঝিয়াছে। ২৫

দরিদ্রের শোষণ বন্ধ হইতে পারে সামান্য কয়েকজন ক্রোড়পতিকে নির্ধন করিয়া নয়, দরিদ্রদের অজ্ঞতা দূর করিয়া ও শোষকদের সহিত অসহযোগ

করিতে শিক্ষা দিয়া। ইহাতে শোষণকারীদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে। আমি এমন কথাও বলিতে চাহিয়াছি যে অবশেষে ইহাতে উভয়ে সমান বখরায় অংশীদার হইবে। পুঁজি মাত্রই দুষ্ট নয়, ইহার অপব্যবহারই দোষের। কোনো-না-কোনো রূপে পুঁজির প্রয়োজন সর্বদাই থাকিবে। ২৬

যাহাদের এখন টাকা আছে তাহাদের অনুরোধ করা হইতেছে যে দরিদ্রের অছি হইয়া যেন তাঁহারা ধনের অধিকার ভোগ করে। আপনারা বলিতে পারেন, অছি হওয়াটা একটা আইনের মারপ্যাঁচ। কিন্তু লোকে যদি সর্বদাই মনে মনে এই ভাবটাকে জাগাইয়া রাখে ও তদনুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টা করে তবে পৃথিবীতে আমাদের জীবন বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে প্রেমের দ্বারা চালিত হইবে। পুরাপুরি অছি হওয়া ইউক্লিডের বিন্দুর মতো একটা ভাবগত বস্তু এবং দুইই সমান দুর্লভ। কিন্তু যদি আমরা চেষ্টা করি তবে অন্য কোনো উপায় অপেক্ষা এই উপায়ে পৃথিবীতে সাম্যাবস্থার দিকে বেশি অগ্রসর হইব। ২৭

সমস্ত সম্পত্তি একেবারে ত্যাগ করা সাধারণ অবস্থার লোকদের মধ্যেও খুব কম লোকই পারে। ধনী-সমাজের নিকট ন্যায়সংগতভাবে যাহা আশা করা যায় তাহা হইল এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের অর্থ ও প্রতিভা ন্যায়বস্তুরূপে গচ্ছিত রাখিবেন ও সমাজের হিতার্থে প্রয়োগ করিবেন। ইহার চেয়ে বেশি পাইবার জন্য জোর করিলে যে মুরগি সোনার ডিম প্রসব করে সেই মুরগিকেই মারিয়া ফেলা হইবে। ২৮

গণতন্ত্র ও জনগণ

গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে ইহার মধ্যে দুর্বলতম ও প্রবলতম ব্যক্তির সমান সুবিধা থাকিবে। অহিংসার মধ্য দিয়া না গেলে ইহা কখনোই সম্ভব নয়। ১

আমি সর্বদাই এই মত পোষণ করিয়াছি যে, জোর করিয়া সামাজিক ন্যায়-বিচার নিম্নতম ও দরিদ্রতমের প্রতিও করা যায় না। আমি বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে নিম্নতম ব্যক্তিকে অহিংসার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে সে যে অন্যায় সহ্য করিতেছে তাহার প্রতিকার সম্ভব। সে উপায় হইল অহিংস অসহযোগ। সময় সময় সহযোগের ন্যায় অসহযোগ তুল্যভাবে কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কেহই তাহার নিজের সর্বনাশ সাধনে বা নিজের দাসত্বের জন্য সহযোগিতা করিতে বাধ্য নয়। যতই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হউক, অন্যের চেষ্টায় স্বাধীনতা পাইলে সেই চেষ্টার অবসানে আর স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না, অর্থাৎ এরূপ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। কিন্তু যে-ব্যক্তি নিম্নতম সেও যে-মুহূর্তে অহিংস অসহযোগের দ্বারা ইহা লাভ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিবে, সেই মুহূর্তেই ইহার উজ্জ্বল দীপ্তি অনুভব করিতে পারিবে। ২

অহিংস আইনভঙ্গ করিতে নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকার। মানুষ হইয়া বাঁচিতে হইলে সে এই অধিকার ছাড়িতে পারে না। অহিংস আইন-অমান্যের ফলে অরাজকতা কখনো আসে না, হিংস্র প্রতিরোধের ফলে আসিতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই এরূপ হিংস্র প্রতিরোধ তাহার শক্তিদ্বারা দমন করে, না করিলে তাহার ধ্বংস হয়; কিন্তু বিনীতভাবে যে আইনভঙ্গ করা হয় তাহা দমন করার অর্থ হইল, বিবেককে কারাগারে বন্দী করার চেষ্টা। ৩

প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ কখনোই অসত্য এবং হিংসার মাধ্যমে আসিতে পারে না। তাহার সহজ কারণ এই যে তাহাদের স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক ফল হইবে বিরোধীদের অবদমন অথবা সমূলে বিনাশ সাধনের দ্বারা সমস্ত বিরোধ দূর করা। ইহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুকূল নয়। নির্ভেজাল অহিংসার রাজ্যেই শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্যক স্ফূর্তি সম্ভব। ৪

এখনো যে সংসারে এতগুলি লোক বাঁচিয়া আছে তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টির ভিত্তি অস্ত্রশস্ত্রের শক্তির উপর নয়, সত্য বা প্রেমের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পৃথিবীতে নানা সংগ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইহা কাজ করিয়া চলিয়াছে— ইহাই হইল এই শক্তির সফলতার সবচেয়ে বড় ও অকাট্য প্রমাণ।

হাজার লক্ষ লোকের জীবন এই শক্তির অত্যন্ত সক্রিয় প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের প্রতিদিনের ছোট ছোট ঝগড়া-ঝাঁটি এই শক্তির প্রয়োগে অন্তর্ধান করে, শত শত জাতি শান্তিতে বাস করে। এ-বিষয়ে ইতিহাসের লক্ষ্য নাই, থাকিতেও পারে না। ইতিহাস তো বাস্তবিক ভালোবাসার শক্তির বা আত্মার শক্তির সমভাবে ক্রিয়ার প্রত্যেকটি অন্তরায়ের হিসাব। দুই ভাইয়ের ঝগড়া বাধিল, একজন অনুশোচনা করিলে যে-ভালোবাসা তাহার মধ্যে সুপ্ত ছিল তাহা আবার জাগিয়া উঠিল, দুই ভাই আবার শান্তিতে বাস করিতে লাগিল, কেহ আর এ দিকে তাকাইয়া দেখিল না। কিন্তু যদি এই দুই ভাই উকিল-মোক্তারের হস্তক্ষেপের ফলে বা অন্য কারণে অস্ত্র গ্রহণ করে বা আইনের আশ্রয় লয়—তাহা তো পশুশক্তির প্রদর্শনের আর-একটি রূপ মাত্র— তাহা হইলে তাহাদের কার্যকলাপ তখনই খবরের কাগজে ছাপা হইবে, প্রতিবেশীদের আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে, হয়তো ইতিহাসেরও বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। পরিবার ও সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহা সত্য, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। পরিবারের পক্ষে একপ্রকার বিধান ও জাতির পক্ষে অন্যপ্রকার, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। ইতিহাস, তাহা হইলে, প্রকৃতির প্রক্রিয়া ব্যাহত হইলে তবে তাহার হিসাব রাখে। আত্মিক শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি, তাই ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। ৫

স্বায়ত্তশাসন আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর নির্ভর করে, প্রবলতম বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বস্তুত যে-স্বায়ত্তশাসনে উহার প্রাপ্তি ও রক্ষার জন্য অবিরাম সাধনা না করিতে হয়, তাহার কোনো মূল্যই নাই। আমি তাই কথায় ও কাজে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন— অর্থাৎ বহুসংখ্যক নরনারীর স্বায়ত্তশাসন— ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন হইতে পৃথক কিছু নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন বা স্বনিয়ন্ত্রণের জন্য ঠিক যে যে উপায় প্রয়োজন, শুধু সেই উপায়গুলি অবলম্বন করিলেই রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাইবে। ৬

অধিকারের যথার্থ মূল হইল কর্তব্য পালন। আমরা সকলে যদি নিজ নিজ কর্তব্য পালন করি, অধিকার পাইবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না। কর্তব্য ফেলিয়া রাখিয়া যদি অধিকারের পিছনে ছুটিয়া বেড়াই তাহা হইলে আলেয়ার আলোর মতো আমাদের হাত এড়াইয়া যাইবে। যতই তাহাদের পিছনে ছুটিব ততই তাহারা দূরে সরিয়া যাইবে। ৭

আমার নিকটে রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ লক্ষ্য নয়। যাহাতে লোকেরা জীবনের প্রত্যেক বিভাগে তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে ইহা তাহার অন্যতম সাধন মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হইল, জাতীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা। জাতীয় জীবন যদি এতখানি পূর্ণাঙ্গ হয় যে আপনা হইতেই তাহা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, তখন আর প্রতিনিধির প্রয়োজন থাকে না। তখন এক উন্নত ধরনের নৈরাজ্য আসে। সে-অবস্থায় প্রত্যেক লোক নিজেই নিজের রাজা। সে এমন করিয়া নিজেকে শাসন করে যে তাহার প্রতিবেশীর উদ্‌বেগের কারণ হয় না। এইরূপ আদর্শ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে না, কেননা রাষ্ট্রই থাকে না। কিন্তু জীবনে আদর্শ কখনো সম্যকভাবে রূপায়িত হয় না। সেইজন্যই থোরো এই প্রসিদ্ধ উক্তি করিয়াছিলেন যে, সেই শাসনতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ যাহা সবচেয়ে কম শাসন করে। ৮

আমি বিশ্বাস করি, প্রকৃত গণতন্ত্র শুধু অহিংসার দ্বারাই সম্ভব। শুধু অহিংসার ভিত্তিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কাঠামো দাঁড় করানো যাইতে পারে। বিশ্বের ব্যাপারে হিংসাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হইবে। ৯

সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, আমরা জন্মগতভাবে অবশ্যই সমান, অর্থাৎ আমাদের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু সকলের সমান শক্তি নাই। স্বভাবতই ইহা অসম্ভব, যেমন সকলের উচ্চতা সমান নয়, বর্ণ, বুদ্ধি, পরিমাণ, ইত্যাদি সকলের একই রকম থাকিতে পারে না। সুতরাং স্বভাবক্রমে কাহারো শিখিবার ক্ষমতা বেশি, কাহারো বা কম। যাহাদের প্রতিভা আছে তাহারা আরো গুণের অধিকারী হইবে এবং তাহারা তাহাদের মানসিক শক্তি এই কার্যে বিনিয়োগ করিবে। যদি তাহারা সহৃদয়তার সঙ্গে এই শক্তি প্রয়োগ করে তাহা হইলে তাহারা রাষ্ট্রের সাহায্য করিবে, রাষ্ট্রের কাজই করিবে। প্রতিভূ বা অছি হইয়াই এই প্রকৃতির লোকেরা জীবনযাপন করে, অন্য কোনোভাবে নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আরো বেশি উপার্জন করিতে দিব, তাহার বুদ্ধিকে জড় করিয়া

রাখিব না। কিন্তু তাহার বৃহত্তর উপার্জনের অধিকাংশ রাষ্ট্রের হিতার্থে বিনিযুক্ত হইবে, যেমন পিতার উপার্জনশীল সকল পুত্রের আয় সাধারণ পারিবারিক ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহাদের উপার্জন হইবে শুধু প্রতিভূ বা অছি হিসাবে। হয়তো এ বিষয়ে আমি শোচনীয়ভাবে অকৃত-কার্য হইব, কিন্তু আমি সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই জীবন-তরণীতে ভাসিয়া চলিয়াছি। ১০

আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চাই যে, অল্প কয়েকজন কর্তৃক অর্জন করিলেই যে স্বরাজ আসিবে তাহা নয়। তাহা আসিবে যখন কর্তৃত্বের অপব্যবহার হইলে বাধা দিবার ক্ষমতা সকলে অর্জন করিবে। জনগণের মধ্যে তাহাদের কর্তৃত্বকে নিয়মিত ও সংযত করিবার ক্ষমতাবোধ জাগ্রত করিলেই স্বরাজ আসিবে। ১১

ইংরেজেরা এদেশ হইতে চলিয়া গেলেই স্বাধীনতা লাভ হইবে না। স্বাধীনতার অর্থ, সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে এমন একটা বোধ জাগানো যে, সে বুঝিতে পারে যে সে নিজেই তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা, তাহার নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সে নিজেই তাহার আইনের ব্যবস্থাপক। ১২

আমরা অনেক দিন ধরিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে আইনসভার মধ্য দিয়াই ক্ষমতা আসে। এই বিশ্বাস একটি মহা ভ্রম, এবং ইহার মূলে আছে জড়তা বা ভণ্ডামি। ব্রিটিশ ইতিহাস ভাসা-ভাসা রকমে পড়ার ফলে আমরা ভাবি যে, পার্লামেণ্ট হইতে সকল ক্ষমতা গড়াইয়া চুয়াইয়া সাধারণ লোকের ভাগে পড়ে। আসল কথা হইল যে, শক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে এবং সাময়িকভাবে যাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয় তাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে, জনগণ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র কোনো ক্ষমতা বা সত্তাই পার্লামেণ্টের নাই। এই সহজ সত্য লোকেদের বুঝাইবার জন্য গত একুশ বৎসর চেষ্টা করিয়াছি। সবিনয় আইন-ভঙ্গই শক্তির ভাণ্ডার। কল্পনা করিয়া দেখুন, একটা সমগ্র জাতি বিধানসভার বিধান মানিতে ইচ্ছুক নয়, এবং না মানার যে ফল তাহা ভোগ করার জন্য প্রস্তুত! তাহারা সমগ্র আইনসভা ও সরকারী শাসনতন্ত্রের গতি একেবারে থামাইয়া দিবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যতই ক্ষমতাশালী হউক না কেন, তাহাদের ভীতিপ্রদর্শন করিবার জন্য পুলিস বা সামরিক শক্তির প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু চরম দুঃখ বরণ করিবার জন্য যে-জনগণ দৃঢ়সংকল্প, তাহাদের কোনো শক্তিই দাবাইতে পারে না।

সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা মানিয়া লইতে ইচ্ছুক হইলেই শুধু পার্লামেণ্টের পদ্ধতি চলিতে পারে, অর্থাৎ শুধু সমপর্যায়ের মধ্যেই ইহা মোটামুটি কার্যকর হয়। ১৩

আশা করি, আমরা এমন একটি শাসনতন্ত্র চাই যাহার ভিত্তি হইবে সংখ্যা-লঘিষ্ঠের উপর চাপ সৃষ্টিতে নয়, তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তনে। এই পরিবর্তনে যদি শ্বেতাঙ্গের সামরিক শক্তির স্থানে বাদামি রঙের সামরিক শক্তির প্রবর্তন হয় তবে উল্লসিত হইবার কিছু নাই। অন্তত জনগণের তাহাতে কোনো লাভ নাই। তাহাতে জনগণের শোষণ বৃদ্ধি যদি নাও পায়, পূর্বেরই মতো চলিতে থাকিবে। ১৪

আমি অনুভব করি, যেমন ইউরোপে তেমনি ভারতে একই রোগ ধরিয়াছে, যদিও ইউরোপের লোকেরা রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী।... সুতরাং ইহার চিকিৎসার জন্য একই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বাহিরের মিথ্যা খোলস বাদ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইউরোপের জনগণের শোষণ হিংসা দ্বারাই বজায় রাখা হইয়াছে।

জনগণের হিংসাপূর্ণ আচরণে কখনোই রোগ সারিবে না। অন্ততঃ এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে পশুবলের সার্থকতা ক্ষণস্থায়ী হইয়াছে। ফলে আরো পশুবলের প্রয়োজন হইয়াছে। এ পর্যন্ত যাহা চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা পশুশক্তির রকমফের এবং যাহারা পশুবলে বলীয়ান তাহাদের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল কতকগুলি কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি মাত্র। সংকটের সময় এই-সকল বাধা আপনা হইতেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমার মনে হয়, শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক, মুক্তি পাইতে হইলে ইউরোপীয় জাতিগণকে অহিংসার আশ্রয় লইতেই হইবে। ১৫

শুধু ইংরেজের দাসত্ব হইতে ভারতকে মুক্ত করার জন্য আমি ব্যস্ত নই। যে-কোনো বন্ধন হইতে ভারতের মুক্তি-সাধনই আমার লক্ষ্য। যদুর আশ্রয় ছাড়িয়া মধুর আশ্রয় লইবার আমার ইচ্ছা নাই। সুতরাং আমার পক্ষে স্বরাজ-আন্দোলন হইল আত্মশুদ্ধির আন্দোলন। ১৬

আমরা যদি আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যদের উপর চাপাইতে চাই, তাহা মুষ্টিমেয় ইংরেজ আমলাতন্ত্রীদের তুলনায় অশেষ গুণে খারাপ হইবে। এদেশে তাহার সংখ্যালঘু— দেশের গরিষ্ঠ জনসাধারণ তাহাদের বিরোধী।

এই বিরুদ্ধ জনসমাজের মধ্যে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য তাহারা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় লইয়া থাকে। আমাদের সন্ত্রাসবাদ হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপ, সুতরাং তাহা অনেক গুণে ভয়ানক হইবে ও অধর্মকর হইবে। এই জন্য যে-কোনো প্রকারের বাধ্যবাধকতা আমাদের আন্দোলন হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। যদি আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বেচ্ছায় অ-সহযোগ মতবাদ অবলম্বন করিয়া থাকি, আর সকলকে স্ব-মতে আনিবার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হইতে পারে। কিন্তু এই আত্মবিসর্জনের দ্বারাই আমরা আমাদের মতবাদের স্বপক্ষে দাঁড়াইতে পারিব ও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব। যদি বলপ্রয়োগে লোকেদের আমাদের পতাকাতলে জড়ো করিতে চাই, তাহা হইলে কেবল আমরা আদর্শচ্যুত হইব না পরন্তু ঈশ্বরকেও হারাইব। তখনকার মতো সার্থক হইয়াছি বলিয়া মনে হইলেও, সেই সার্থকতার পরিণাম হইবে অধিকতর ভয়াবহ। ১৭

যে-ব্যক্তি স্বভাবত গণতন্ত্রী সে স্বভাবতই সংযমের পক্ষপাতী। যে-ব্যক্তি মানুষের ও ভগবানের সকল বিধান স্বেচ্ছায় মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত, তাহার নিকট সমাজতন্ত্রের কথা স্বভাবতই আসে। আমি সহজাত প্রবৃত্তি ও শিক্ষা উভয় কারণেই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী বলিয়া দাবি করি। যাহারা গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাহারা সর্বপ্রথমে গণতন্ত্রের এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোগ্যতা অর্জন করুক। তাহা ছাড়া গণতন্ত্রীকে একেবারে স্বার্থশূন্য হইতে হইবে। তাহাকে নিজের বা দলের কথা না ভাবিয়া, বা তাহার স্বপ্ন না দেখিয়া, শুধু গণতন্ত্রের কথাই ভাবিতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই আইন ভঙ্গ করিবার অধিকার সে অর্জন করিবে। কাহাকেও আমি তাহার অন্তরের ধারণা দূর করিতে বলি না। আমি বিশ্বাস করি না যে স্বাস্থ্যসম্মত ও সাধু মতভেদে আমাদের উদ্দেশ্যের ক্ষতি হইবে, কিন্তু সুবিধাবাদ, প্রবঞ্চনা অথবা জোড়াতাড়া দেওয়া চুক্তি নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্যের পথে বাধা জন্মাইবে। যদি মতবিরোধ জানাইতেই হয়, দেখিতে হইবে সে অভিমত যেন অন্তরের দৃঢ় ধারণা হইতে উদ্ভূত হয়, সুবিধাবাদী এবং দলীয় ধ্বনির প্রতিধ্বনি না হয়।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে আমি মূল্য দিই। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব। সে তাহার ব্যক্তিত্বকে সাহিত্য ও সমাজের উন্নতির প্রয়োজনের সহিত সুসমঞ্জস করিয়া বর্তমান অবস্থায় উঠিয়াছে। অবাধ ব্যক্তিত্ব হইল বন্য জন্তুর নীতি। আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক সংযম, এই উভয়ের মধ্যে মধ্যপথ বাহিয়া চলিতে শিখিয়াছি।

সমগ্র সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য স্বেচ্ছায় সামাজিক বিধান মানিয়া লইলে, ব্যক্তিরও সমৃদ্ধি, সে যে সমাজের সভ্য তাহারও উন্নতি। ১৮

সুতরাং শ্রেষ্ঠ আচরণবিধি হইল পরমতসহিষ্ণুতা। কারণ আমরা সকলে একভাবে কখনোই চিন্তা করিব না এবং সত্যকে খণ্ড খণ্ড ভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিব। বিবেক কথাটির অর্থ সকলের নিকট সমান নয়; ব্যক্তিগত আচরণের পক্ষে বিবেকের নির্দেশ মানিয়া চলা ভালো বটে, কিন্তু ঐ নির্দেশ অন্যের উপর চাপাইলে অন্যের স্বাধীনতার উপর অসহনীয় হস্তক্ষেপ করা হইবে। ১৯

মতভেদের জন্য কখনো শত্রুতা করা উচিত নয়। তাহা হইলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভয়ানক শত্রুতা থাকিত। সংসারে এমন দুইজন ব্যক্তি জানি না, যাহাদের মধ্যে মতভেদ হয় নাই, এবং যেহেতু আমি গীতাকে মানিয়া চলি, যাহাদের সহিত আমার মতভেদ তাহাদের আমার ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম বন্ধুর মতো দেখিতে সর্বদাই চেষ্টা করি। ২০

দেশবাসী ভুল করিলে প্রতিবারই ভুল স্বীকার করিতে থাকিব। একমাত্র যাহার স্বৈরাচার সংসারে মানি, তাহা আমার মধ্যকার সেই শান্ত বিবেক-বাণী। যদি এই বাণী বহন করিতে গিয়া আমাকে সম্পূর্ণ একা পড়িতে হয়, আমার সবিনয় বিশ্বাস এই যে, এরূপ একান্ত সংখ্যালঘু হইয়াও একা লড়িবার সাহস আমার আছে। ২১

আমি সত্য করিয়াই বলিতে পারি যে, অন্যান্য লোকের দোষ আমার সহজে চোখে পড়ে না। আমি নিজেই যে অনেক দোষে দোষী, সুতরাং সেগুলির জন্য ক্ষমা আমার প্রয়োজন। কাহাকেও কঠোরভাবে বিচার না করিতে এবং যে-সকল ত্রুটি আমি দেখিতে পাই তাহা সহনীয় করিয়া লইতে আমি শিখিয়াছি। ২২

আমার বিরুদ্ধে অনেকবার অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, আমি সহজে অপরের মত স্বীকার করিয়া লইবার পাত্র নই। বলা হইয়াছে যে, আমি সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের নিকট মাথা নত করি না। আমাকে একাধিকার বা এক-কর্তৃত্বের অভিলাষী বলিয়া দোষ দেওয়া হইয়াছে... একগুঁয়েমি বা এক-কর্তৃত্বের অভিযোগ কখনো মানিয়া লইতে পারি নাই, বরং যে-সব বিষয় গুরুতর নয় তাহা আমার প্রকৃতি সহজেই মানিয়া লইতে পারে বলিয়া

আমি গৌরব বোধ করি। এক-কর্তৃত্ব আমি ঘৃণা করি। আমি নিজের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল্য দিই, অন্যের বেলায়ও মুক্তি ও স্বাধীনতাকে আমি সমান মূল্যই দিই। যদি যুক্তি দিয়া মনে সাড়া না জাগাইতে পারি তবে একটি প্রাণীকেও আমার পক্ষে আনিবার আমার ইচ্ছা নাই। চিরাচরিত ধারা সম্বন্ধে আমি এতদূর নিরাসক্ত যে যুক্তিসহ মনে না করিলে প্রাচীনতম শাস্ত্রকেও ভগবানের বাণী বলিয়া গ্রহণ করি না। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছি যে যদি সমাজে বাস করিয়াও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাই, তবে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়গুলিতেই পূর্ণ স্বাধীনতার সীমারেখা টানিতে হয়। অন্য-সকল বিষয়ে, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস বা নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা না থাকিলে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই মানিয়া লইতে হইবে। ২৩

অধিকতম লোকের প্রভূততম হিতসাধনের নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না; কেননা, ইহার নগ্ন অর্থ এই যে, শতকরা ৫১ জনের কাল্পনিক মঙ্গল সাধনের জন্য শতকরা ৪৯ জনের স্বার্থ বলি দিতে পারা যায় বা বলি দেওয়া উচিত। এই হৃদয়হীন নীতিতে মানবসমাজের ক্ষতি হইয়াছে। সকলের প্রভূততম কল্যাণের নীতিই একমাত্র প্রকৃত, উন্নত, মানবোচিত নীতি, এবং অকুণ্ঠভাবে স্বার্থ বলি দিয়াই ইহা পালন করা সম্ভব। ২৪

যাহারা জনগণের নেতৃত্বের দাবি করে তাহাদের অবশ্যই জননেতৃত্ব অধিকার করিতে হইবে, যদি আমরা অরাজকতা না চাই, দেশের সুশৃংখল অগ্রগতি চাই। আমি বিশ্বাস করি যে শুধু নিজের মতের সম্বন্ধে প্রতিবাদ ও গণ-মতে আত্মসমর্পণ যথেষ্ট নয়, এ-কথা বলিলেই চলিবে না; গুরুতর ব্যাপারে জনমত যদি তাহাদের যুক্তিগ্রাহ্য না হয় তবে নেতাদের সেই জন-মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইবে। ২৫

নেতার চার দিকে সকল প্রকার মতাবলম্বী লোক থাকিবেন, ইহা তো ধরা কথা; তাই বলিয়া তিনি যদি তাঁহার বিবেকের আহ্বানের বিরুদ্ধে কাজ করেন তবে তিনি কোনো কাজেরই নহেন। নিজেকে অবিচলিত-ভাবে ধারণ করিয়া রাখিবার এবং ঠিক পথে চালিত করিবার মতো অন্তরের বাণী যদি না থাকে তাহা হইলে তিনি নোঙর-ছেঁড়া জাহাজের মতো ভাসিয়া বেড়াইবেন। ২৬

মানুষ বাস্তবিক অভ্যাসের বলেই বাঁচিয়া থাকে এ-কথা স্বীকার করিয়াও

আমি বলিব— ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারাই বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে আরো ভালো। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, মানুষ তাহার ইচ্ছাশক্তি এমন বাড়াইতে পারে যে, শোষণ তখন নিম্নতম মাত্রায় আসিয়া পৌঁছাইবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি আমি খুবই ভয়ের সঙ্গে দেখি। কারণ, শোষণকে নিম্নতম পর্যায়ে লইয়া গিয়া আপাতদৃষ্টিতে ইহাতে জনকল্যাণ সাধন করিলেও, সকল উন্নতির মূলে যে-ব্যক্তি, তাহাকে নষ্ট করিয়া ইহা মানব-জাতির সমূহ ক্ষতি করে। মানুষ প্রতিভূ বা অছির কাজ করিয়াছে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা জানি, কিন্তু দরিদ্রের হিতের জন্য আত্মনিবেদন করিয়াছে, এরূপ একটি রাষ্ট্রও দেখি না। ২৭

সংহত ও কেন্দ্রীভূত হিংসা দেখিতে পাই রাষ্ট্রে। ব্যক্তির আত্মা আছে; কিন্তু রাষ্ট্র তো যন্ত্র, তাহার আত্মা নাই। তাহার অস্তিত্ব হিংসার জন্য, সেই হিংসা হইতে তাহাকে কখনো সরাইয়া আনা যায় না। ২৮

আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, রাষ্ট্র যদি হিংসার দ্বারা পুঁজিবাদ দমন করে, তাহা হইলে স্বয়ং হিংসার নাগপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িবে, অহিংসার সাধনা কখনো আর করিতে পারিবে না। ২৯

স্বায়ত্তশাসন অর্থে বুঝিতে হইবে— সরকারের শাসন হইতে স্বাধীন হওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা— তা সে সরকার বিদেশী হউক, অথবা জাতীয় হউক। জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির জন্য লোকে যদি সরকারের উপর নির্ভর করে, তবে সে স্বরাজ সরকার অতি শোচনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। ৩০

যদি স্বাধীন মুক্ত নরনারীর মতো বাঁচিতে না পারি, তবে মরণেই আমাদের সন্তোষ হওয়া উচিত। ৩১

সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে নিয়ম, তাহার প্রয়োগ বড়ই সংকীর্ণ; ছোটখাট বিষয়েও মানুষকে ঐ নিয়মের কাছে মাথা নত করিতে হইবে। কিন্তু ভালোমন্দ যাহাই হউক, অধিকাংশের মত বলিয়াই তাহা মানিয়া লওয়া তো দাসত্বের শামিল। মানুষ ভেড়ার পালের মতো চলিবে, গণতন্ত্রের তাৎপর্য এমন নয়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত মত ও কার্যের স্বাধীনতাকে সযত্নে স্বীকার করিয়া চলার কথা। ৩২

বিবেকের বাণীর কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়ম খাটে না। ৩৩

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, নিজের দুর্বলতার বশেই মানুষ স্বাধীনতা হারায়। ৩৪

আমাদের পরাধীনতার জন্য ইংরেজের বন্দুক যত না দায়ী তাহার চেয়ে বেশি দায়ী আমাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সহযোগিতা। ৩৫

অত্যাচারী শাসক অবশ্য জোর করিয়া প্রজাপুঞ্জের সম্মতি আদায় করিয়া লয়, কিন্তু সেই সম্মতি ব্যতীত চরম অত্যাচারী রাজশক্তিও টিঁকিতে পারে না। শাসিত যেই অত্যাচারীর ভয়মুক্ত হয় তখনই অত্যাচারীর ক্ষমতা চলিয়া যায়। ৩৬

অধিকাংশ লোকেই জটিল শাসনযন্ত্রের বিষয় কিছু জানে না। তাহারা অনুভব করে না যে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই প্রতিটি নাগরিক নীরবে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সরকারের কাজের পোষকতা করিতেছে। সরকারের প্রতিটি কাজের জন্যই তাই নাগরিক মাত্রই দায়ী। আর, যতক্ষণ অসহনীয় না হয় সরকারের কাজে সহযোগিতা করা সংগত। কিন্তু যখন ব্যক্তির বা জাতির পক্ষে কোনো কাজ বেদনাদায়ক হয় তখন সহযোগিতা ও সমর্থন সরাইয়া লওয়াই কর্তব্য। ৩৭

এ-কথা সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ নিয়মে যতক্ষণ অন্যায়ের প্রতিকার পাওয়া অসম্ভব হয় এবং সে অন্যায় মর্মঘাতী না হয় ততক্ষণ অন্যায়কে মানিয়াই লইতে হয়। কিন্তু এমন অন্যায়ও ঘটে, যখন রাষ্ট্রের সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়ানো প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য, এবং সেই অধিকার সকলেরই আছে। ৩৮

কোনো পার্থিব শক্তির কাছে, তা সে-শক্তি যত বড়ই হউক, মাথা নত না করিবার দৃঢ় সংকল্পে যে-সাহসের পরিচয় তেমন আর কিছুতে মেলে না। তবে সেই সংকল্প তিক্ততামুক্ত হওয়া চাই, আর চাই এই পূর্ণ বিশ্বাস যে, আত্মার শক্তিই সত্য এবং স্থায়ী, অন্য কিছুই নয়। ৩৯

অন্তরে কতখানি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহার অনুপাতেই আমরা বাহিরের স্বাধীনতা লাভ করিব। আর ইহাই যদি স্বাধীনতার প্রকৃত

দৃষ্টিভঙ্গি হয় তবে ভিতরের সংস্কারের দিকেই আমাদের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োগ করা উচিত। ৪০

যে-ব্যক্তি পূর্ণ অহিংস থাকিয়া নিজের স্বাধীনতা ও সেইসঙ্গে দেশের ও সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয় সেই তো প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী। ৪১

সুশৃংখল এবং জ্ঞানালোকে-উদ্ভাসিত গণতন্ত্র জগতের সর্বাপেক্ষা সুন্দর জিনিস। অপর পক্ষে অজ্ঞান, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার গণতন্ত্রে যে-বিশৃংখলা ডাকিয়া আনে তাহাতে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। ৪২

গণতন্ত্র আর হিংসা, একত্র থাকিতে পারে না। আজ যে-সব রাজ্যে নামে-মাত্র গণতন্ত্র চলিতেছে, তাহাদের হয় প্রকাশ্যে একনায়কত্ব স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা যদি প্রকৃত গণতন্ত্র প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা থাকে তবে সাহস করিয়া অহিংস নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। অহিংসার সাধনা কেবল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, রাষ্ট্রের পক্ষে নহে— এমন কথা বলা সত্যের অবমাননা। ৪৩

আমার মতে স্বরাজের জন্য আমাদের শুধু সেই শিক্ষাই প্রয়োজন যাহাতে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি এবং ভুলত্রুটি সত্ত্বেও স্বাধীন জীবন যাপন করিতে পারি। শাসনপ্রণালী যতই ভালো হউক, স্বায়ত্তশাসনের স্থান সে লইতে পারে না। ৪৪

আমি ইংরেজদের দোষ দিই না। আমরা যদি তাহাদের মতো সংখ্যালঘু হইতাম তবে আজ তাহারা যে-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে আমরাও হয়তো তাহাই করিতাম। সন্ত্রাসবাদ বা গুপ্ত বিদ্রোহ দুর্বলের অস্ত্র, সবলের নয়। ইংরেজরা লোকবলে ক্ষীণ, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও দুর্বল। ফলে একে অন্যকে টানিয়া নীচে নামাইতেছে। সকলেই জানে, এদেশে কিছুদিন বাস করিলেই ইংরেজের চরিত্রের অধোগতি হয়, আর ইংরেজের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতীয়েরা সাহস ও পৌরুষ হারাইয়া ফেলে। দুইটি জাতির এই শক্তিনাশ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়— না জাতির পক্ষে, না জগতের পক্ষে।

কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা যদি নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হই, তবে জগদ্‌বাসী অপর সকলেও নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইবে। আমরা

নিজেদের ঘর সামলাইতে পারিলে জগতের উন্নতিকল্পে উহাই হইবে আমাদের অবদান। ৪৫

দুঃখবরণের পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগের অর্থ তবে কি? আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে জোর করিয়া চাপানো শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসহযোগ করিতে গিয়া যে ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, স্বেচ্ছায় তাহা মানিয়া লইতে ও সহ্য করিতে হইবে। থোরো বলিয়াছেন, অন্যায়কারী শাসকের রাজ্যে শক্তি ও ধনের অধিকারী হওয়াই পাপ, দারিদ্র্যই সেখানে সদ্‌গুণ বিশেষ। পরিবর্তনের সময়ে হয়তো আমরা অনেক ভুল করিব, এমন অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে যাহা অনিবার্য ছিল না। কিন্তু একটা গোটা জাতির ক্লীবত্বপ্রাপ্তি অপেক্ষা তাহাও ভালো।

অন্যায়কারী কতদিনে তাহার ভুল বুঝিবে সেই অপেক্ষায় অন্যায়ের প্রতিকারে বিরত থাকিতে আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করিব। নিজে কষ্ট পাইব বা অন্যে কষ্ট পাইবে, সেই ভয়ে অন্যায়ের নিষ্ক্রিয় অংশীদারও থাকিব না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভাবে অপরাধীর সহায়তা করিতে অস্বীকার করিয়া, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব।

পিতা যদি অন্যায় বিচার করেন, পুত্রের কর্তব্য পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাওয়া। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যদি দুর্নীতিমূলক নিয়মে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন, ছাত্ররা অবশ্যই সেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইবে। কোনো সংস্থার পরিচালক যদি নীতিভ্রষ্ট হন তবে সেই সংস্থার সদস্যগণ ইহার সর্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিজেদের মুক্ত রাখিবেন। সেই রকম, রাষ্ট্রের শাসনকর্তা যদি ঘোর অন্যায় অবিচার করে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য প্রজা নিশ্চয় পূর্ণ বা আংশিক অসহযোগিতা করিবে। আমি যে-কয়টি ক্ষেত্রের উল্লেখ করিলাম, সবগুলির মধ্যেই শারীরিক অথবা মানসিক ক্লেশ ভোগের অবকাশ আছে। কষ্ট ভোগ না করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। ৪৬

আমি যে মুহূর্তে সত্যাগ্রহী হইলাম সেই মুহূর্ত হইতেই শাসকের বশ্যতা ত্যাগ করিলাম, আমি সাধারণ নাগরিক রহিলাম। নাগরিক স্বেচ্ছায় আইন মান্য করে; আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইবে, সেই ভয়ে নয়। যখন দরকার তখন সে আইন ভঙ্গ করে ও আইন-অমান্যের শাস্তি সানন্দে বরণ করিয়া লয়। এইরূপ স্বেচ্ছায় গ্রহণের ফলে শাস্তির মধ্যে যে যাতনা ও অবমাননা থাকে তাহার তীব্রতা চলিয়া যায়। ৪৭

পূর্ণ আইন-অমান্য আন্দোলন হইল পূর্ণ অহিংস বিদ্রোহ। মনে-প্রাণে যে সত্যাগ্রহী, সে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। যে খাঁটি বিদ্রোহী, রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার নীতিবিগর্হিত রীতি সে অমান্য করিয়া চলে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, সে খাজনা দিতে অস্বীকার করিতে পারে; দৈনিক কাজ-কর্মে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সে না মানিতে পারে; সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য সে অনধিকার-প্রবেশের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সেনানিবাসে ঢুকিতে পারে; নির্দিষ্ট গাণ্ডি না মানিয়া নিষিদ্ধ এলাকায়ও সে পিকেটিং করিতে পারে। এই কাজে সে নিজে কখনো বলপ্রয়োগ করিবে না। কেহ তাহার উপর বলপ্রয়োগ করিলেও সে বাধা দিবে না। প্রকৃতপক্ষে, সে কারাবাস বা অন্য প্রকার নির্যাতন বরণ করিয়া লইবে। আপাততঃ যে বাহ্যিক স্বাধীনতা সে ভোগ করিতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে, এই বোধ যখন জাগে তখনই সে ঐরূপ করে। সে দেখে যে যতক্ষণ রাষ্ট্রের নিয়ম সে মানিয়া চলিতেছে ততক্ষণ রাষ্ট্র তাহাকে স্বাধীন মতে চলিতে দিবে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য এই মূল্য তাহাকে দিতে হইবে— ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিনিময়ে তাহাকে রাষ্ট্রের কাছে নতিস্বীকার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের মন্দ দিকটা সম্বন্ধে সচেতন সে আর গতানুগতিক পন্থায় রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে চায় না; যাহারা তাহাকে বোঝে না তাহারা তাহার উপর বিরক্ত হয়, মনে করে সে সরকারকে বাধ্য করিতেছে তাহাকে অহেতুক ধরিয়া গারদে পুরিতে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে সত্যাগ্রহ মানুষের অন্তর-বেদনার প্রবলতম বহিঃপ্রকাশ এবং অন্যায়কারী সরকারের কাজের তীব্রতম প্রতিবাদ। সকল সংস্কারের মূলেই কি এই ইতিহাস নয়? সঙ্গীদের প্রচুর বিরক্তি উৎপাদন করিয়াও কি তাঁহারা কুপ্রথার সঙ্গে যুক্ত বলিয়াও অনেক নির্দোষ প্রতীকও ত্যাগ করেন নাই?

কোনো এক দল মানুষ যখন একযোগে নিজেদের রাষ্ট্রকে, যেখানে তাহারা এতদিন ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে তাহাকে, অস্বীকার করে, তখন তাহারা প্রায় নিজেদের এক রাষ্ট্র স্থাপন করে। 'প্রায়' বলিতেছি এই-জন্য যে রাষ্ট্র তাহাদের বাধা দিলে প্রতিবাদে তাহারা বল প্রয়োগ করে না। রাষ্ট্র যদি তাহাদের পৃথক সত্তাকে স্বীকার করিয়া না লয়, অর্থাৎ তাহাদের সংকল্পের কাছে নতি স্বীকার না করে, তবে সত্যাগ্রহী হয় কারাবরণ করিবে, না হয় সরকারের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিবে। এইভাবেই ১৯১৪ সনে দক্ষিণ-আফ্রিকার তিন হাজার ভারতীয় ট্রান্সভাল অভিবাসন আইন-অমান্য করিয়া ট্রান্সভাল সীমানা অতিক্রম করে এবং সরকারকে তাহাদের বন্দী করিতে বাধ্য করে। তাহারা হিংসার আশ্রয় লইল না, নতিস্বীকারও করিল না, ফলে সরকারকে তাহাদের দাবি মানিতে হইল। সত্যাগ্রহী দল

সেনাদলেরই মতো, কেবল তাহাদের জীবন আরো কষ্টের, কারণ সে-জীবনে সাধারণ সেনানী-জীবনের উত্তেজনা নাই। এই জীবনে উন্মাদনার স্থান নাই, তাই সত্যাগ্রহী-দলে লোকসংখ্যা খুবই কম হইবে। সত্য বলিতে কি, একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী একা দাঁড়াইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ৪৮

অহিংস সংগ্রামে নিয়মানুবর্তিতার খুবই প্রয়োজন সত্য, কিন্তু আরো অনেক-কিছুর প্রয়োজন আছে। সত্যাগ্রহ-সমরে সকলেই সৈন্য, সকলেই দাস; কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রত্যেকেই নেতা ও সেনাধ্যক্ষ, নিজেই নিজেকে পরিচালনা করিতে হইবে। শুধু নিয়মানুবর্তিতায় নেতৃত্ব করা চলে না। সেজন্য চাই বিশ্বাস, চাই সত্যদৃষ্টি। ৪৯

যেখানে আত্মনির্ভরই নিয়ম, যেখানে কেহ কাহারো মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে না, যেখানে নেতা নাই, অনুগামীও নাই, অথবা যেখানে সবাই নেতা, সবাই অনুচর, সেখানে যত বড়ই হউক একজন যোদ্ধার মৃত্যুতে কাজে শৈথিল্য আসিবে না, বরং সংগ্রাম আরো প্রবল হইয়া উঠিবে। ৫০

প্রত্যেক ভালো আন্দোলনকেই পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়—ঔদাসীন্য, উপহাস, তিরস্কার, নির্যাতন ও শ্রদ্ধা। আমরাও প্রথম কয়েক মাস উদাসীনতা পাইয়াছিলাম। তারপর ভাইসরয় ইহাকে সৌজন্য-সহকারে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। গালাগালি, অপপ্রচার তো দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে দাঁড়াইল। প্রাদেশিক গভর্নররা এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী প্রেস যতদূর পারিল গালাগালি বর্ষণ করিল। তারপর আসিল নির্যাতন; এতদিন পর্যন্ত তাহা খুব সামান্য আকারে চলিতেছিল। মৃদু বা তীব্র যে-কোনো প্রকারের নির্যাতন কাটাইয়া উঠিতে পারিলে আন্দোলন লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, আর তাহা সফলতারই নামান্তর। আমরা যদি খাঁটি থাকি তবে আজিকার এই নির্যাতন আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যই সূচিত করিতেছে। যদি আমরা খাঁটি হই, তবে ভয়ে ভীত হইব না, রাগ করিয়া প্রত্যাঘাত করিব না। হিংসার পথ অবলম্বন করিলে আত্মহত্যা করা হইবে।-৫১

আমার বিশ্বাস অবিচল। যদি একজন মাত্র সত্যাগ্রহীও শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে, তবে জয় সুনিশ্চিত। ৫২

প্রত্যেক পুরুষ ও নারী, শরীরে যতই দুর্বল হউক, নিজের নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান রক্ষার অধিকারী, এ-কথা মানুষকে সম্যক্ বুঝাইতে পারিলেই আমার কাজ ফুরাইবে। সমগ্র জগৎ বিপক্ষে দাঁড়াইলেও, এরূপ যোদ্ধার আত্মপক্ষ-সমর্থন বৃথা যায় না। ৫৩

শিক্ষা

আমাদের যাহা সবচেয়ে ভালো তাহা ভিতর হইতে বাহিরে আনা, তাহা ফুটাইয়া তোলাই প্রকৃত শিক্ষা। মানবশাস্ত্র অপেক্ষা ভালো গ্রন্থ কোথায় পাইব! ১

আমার দৃঢ় ধারণা, বুদ্ধির প্রকৃত শিক্ষা শুধু হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি দেহেন্দ্রিয়গুলির কার্য অনুশীলন ও শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। অন্য ভাবে বলা যায়, শিশুর দেহেন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধি-সহকারে প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি-বিকাশের শ্রেষ্ঠ পথ পাওয়া যাইবে। এই-রূপেই তাহার দ্রুত উন্নতি হইতে পারে। দেহ ও মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মারও জাগরণ না হয়, তবে দেহ-মনের বিকাশ নিতান্তই এক-পেশে হইয়া দাঁড়াইবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলিতে অবশ্য হৃদয়ের কথাই বুঝি। সুতরাং মনের উপযুক্ত সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন করিতে হইলে, তাহা তখনই সম্ভব যখন শিশুর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাশাপাশি চলিতে থাকে। দেহ মন আত্মা সমস্ত মিলাইয়া এক সমগ্র ও অবিভাজ্য বস্তু। এই মত অনুসারে তাহা হইলে ইহাদের বিকাশ খণ্ড খণ্ড ভাবে অথবা পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে সম্ভব মনে করা বড়ই ভুল হইবে। ২

শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি, শিশু ও বয়স্ক মানুষের মধ্যে, তাহার দেহ, মন ও আত্মার যাহা-কিছু সবচেয়ে ভালো, তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন। অক্ষরপরিচয় শিক্ষার উদ্দেশ্যও নয়, আরম্ভও নয়; নরনারীর শিক্ষার উপায়গুলির মধ্যে ইহা একটি মাত্র। শুধু অক্ষরপরিচয় শিক্ষা নয়। আমি তাই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে চাই তাহার উপযোগী হাতের কাজের মধ্য দিয়া, এবং শিক্ষা আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কিছু উৎপাদনের শক্তি দিয়া। প্রত্যেক বিদ্যালয় এইরূপে স্বাবলম্বী হইতে পারে। একমাত্র শর্ত থাকিবে যে, এই-সব বিদ্যালয়ের উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়ভার রাষ্ট্র লইবেন।

আমার বিশ্বাস, মন ও আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ এইরূপ শিক্ষার মধ্য দিয়াই সম্ভব। তবে প্রত্যেক হাতের কাজই শুধু এখনকার মতো যান্ত্রিক-ভাবে শিখাইলে চলিবে না, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিখাইতে হইবে। অর্থাৎ শিশু প্রতি ধাপে ধাপে কেন করিতেছে, কি নিয়মে করিতেছে, তাহা

জানিবে। এ বিষয়ে খানিকটা আত্মবিশ্বাস ছাড়া কথা বলিতেছি না, কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা ইহার সমর্থন করে। যেখানেই কর্মীরা সুতা কাটিতে শিখিতেছে সেখানেই এই প্রথা কমবেশি গৃহীত হইতেছে। স্যাণ্ডেল তৈয়ারি করাইয়া ও সুতা কাটাইয়া আমি ভালো ফল পাইয়াছি। ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা এই প্রণালীতে বাদ পড়ে নাই। কিন্তু এই বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান মুখে মুখে দেওয়া হইতেছে; পড়িয়া ও লিখিয়া যাহা হইত, তাহার দশগুণ বেশি জ্ঞান ইহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। ছাত্র যখন ভালোমন্দ বিচার করিতে শিখিয়াছে, যখন তাহার রুচি খানিকটা বিকশিত হইয়াছে, তখন তাহাকে বর্ণমালা শিখাইলে চলে। ইহা যুগান্তকারী প্রস্তাব, কিন্তু ইহাতে প্রচুর পরিশ্রমের অপচয় বন্ধ হয়। ছাত্রের যাহা শিখিতে অনেকদিন লাগিত তাহা এক বৎসরে সে শিখিতে পারে। ইহাতে সব দিক দিয়া সাশ্রয় হয়। বলা বাহুল্য হাতের কাজ শিখিতে শিখিতে সে অঙ্কও শিখিয়া লয়। ৩

আমার ত্রুটি বা শক্তির সীমা স্বীকার করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বলিতে আমার কিছু নাই। উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষার কৃতিত্ব সাধারণের উপরে কখনো ছিল না। পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। স্কুলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিব, ইহা ছিল আমার আকাঙ্ক্ষার অতীত। তাহা সত্ত্বেও, সাধারণ শিক্ষা, এবং তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষা সম্বন্ধে আমার খুব স্পষ্ট মতামত আছে। সে মতামতের মূল্য যাহাই হউক, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানানো দেশের প্রতি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। যে-ভীরুতা আমাকে প্রায় আত্মবিলোপ করাইয়াছে, তাহা আমাকে বর্জন করিতেই হইবে। ব্যঙ্গবিদ্রূপকে ভয় করিলে চলিবে না। এমন-কি আমার জনপ্রিয়তা বা মর্যাদা হ্রাস পাইবে ভাবিয়া পিছাইয়া থাকিলে চলিবে না। আমি যাহা বিশ্বাস করি তাহা যদি লুকাইয়া রাখি তাহা হইলে আমার বিচারের ভুল-ভ্রান্তি কখনো সংশোধন করিতে পারিব না। আমি সর্বদাই সে-ভুল জানিবার জন্য এবং তাহা সংশোধন করিবার জন্য সমধিক উদ্‌গ্রীব। ৪

যে-সকল সিদ্ধান্ত বহু বৎসর ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র কর্মে প্রয়োগ করিয়াছি, এবার সেগুলির কথা বলি :

১. পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধরনের শিক্ষারও আমি বিরোধী নই।

২. রাষ্ট্র যেখানেই ইহার স্পষ্ট প্রয়োজন বুঝিবেন সেখানেই ইহার ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৩. সকল উচ্চশিক্ষার ব্যয় রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হউক— আমি ইহার বিরোধী।

৪. আমার দৃঢ় ধারণা, আমাদের কলেজগুলিতে কলা-বিভাগে যে পরিমাণ তথাকথিত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা একেবারেই ব্যর্থ। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে। তাহা ছাড়া যে-সব ছেলেমেয়ে দুর্ভাগ্যের বশে কলেজের জাঁতাকলে বাধ্য হইয়া পিষ্ট হইতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্যনাশের জন্যও এই ব্যবস্থা দায়ী।

৫. বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা দানের ফলে জাতির বুদ্ধিবৃত্তির ও নীতির দিকে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। আমরা সমসাময়িক বলিয়া এই মহতী ক্ষতির পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছি না। আর আমরা নিজেরা যাহারা এই শিক্ষা পাইয়াছি, আমাদিগকে এক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, অন্য দিক দিয়া এই প্রণালীর বিচার করিতে হইতেছে— একসঙ্গে এই দুইটি কাজ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

উপরে যে-সকল সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হইল, তাহাদের সমর্থনে আমাকে যুক্তি দিতে হইবে। আমার জীবন-অধ্যায়ের অভিজ্ঞতা হইতে কিছুটা দিলে বোধহয় সেই উদ্দেশ্য সবচেয়ে বেশি সিদ্ধ হইবে।

আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি যে শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহার সমস্তটাই হইয়াছিল আমার মাতৃভাষা গুজরাটীর মাধ্যমে। তখন আমি পাটিগণিত, ইতিহাস ও ভূগোল খানিকটা জানিতাম। তাহার পর উচ্চ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলাম। প্রথম তিন বৎসর মাতৃভাষাই ছিল শিক্ষার মাধ্যম; কিন্তু শিক্ষকের কাজ ছিল ছাত্রের মাথায় ইংরেজি ঢুকাইয়া দেওয়া, তাই আমাদের সময়ের অর্ধেকের বেশি ব্যয় হইত ইংরেজি শিক্ষা করিতে— ইংরেজির খামখেয়ালি বানান ও উচ্চারণ আয়ত্ত করিতে। যে-ভাষায় লেখার মতো উচ্চারণ করা হয় না, যাহার লেখা ও উচ্চারণের মধ্যে সংগতি নাই, সেই ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হওয়া ছিল এক কষ্টকর আবিষ্কার-বিশেষ। মুখস্থ করিয়া বানান শিখিতে হইবে, ইহা তো ছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কথা-প্রসঙ্গেই ইহা বলিতেছি, আমার যুক্তির পক্ষে ইহা অবান্তর। যাহা হউক, আমাদের প্রথম তিন বৎসর যাত্রাপথ ছিল অপেক্ষাকৃত সুগম।

বাঁধিয়া মারা আরম্ভ হইল চতুর্থ শ্রেণী হইতে। প্রত্যেক বিষয় ইংরেজিতে শিখিতে হইবে— জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন-বিদ্যা, জ্যোতি-র্বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল। ইংরেজির অত্যাচার এত বেশি ছিল যে সংস্কৃত অথবা ফার্সি পড়িলেও ইংরেজির মাধ্যমে পড়িতে হইত, মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে নয়। কোনো ছাত্র যদি গুজরাটী ভাষা ভালো জানা থাকায় তাহাতে কথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হইত।

কিন্তু ইংরেজি যদি কোনো ছেলে ভালোভাবে বুঝিতে না পারিত এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ না-জানিয়াও সে যদি কোনোপ্রকারে অশুদ্ধভাবে সে-ভাষায় কথা বলিত, তাহা হইলে শিক্ষক ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। করিবেনই বা কেন? তাঁহার নিজের ইংরেজিও তো একেবারে নির্ভুল নয়। ইহা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভবই ছিল না। ইংরেজি যে তাঁহার ছাত্রদের পক্ষে যেমন তাঁহার পক্ষেও তেমনি বিদেশী ভাষা। ফলে দাঁড়াইত সমূহ বিশৃঙ্খলা। ছাত্র আমরা, আমাদের এমন অনেক জিনিস মুখস্থ করিতে হইত, যাহা সম্পূর্ণ বুঝিতাম না, প্রায়ই কিছুই বুঝিতাম না। শিক্ষক যখন আমাদের জ্যামিতি বুঝাইতেন তখন আমার মাথা ঘুরিত। ইউক্লিডের প্রথম ভাগের ত্রয়োদশ উপপাদ্য পর্যন্ত পৌঁছাইবার আগে জ্যামিতির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতাম না, এবং পাঠকের নিকট স্বীকার করা উচিত যে, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের গুজরাটী প্রতিশব্দ আমার জানা নাই। আমি এখন জানি যে ইংরেজির মাধ্যমে না শিখিয়া গুজরাটীর মাধ্যমে শিখিলে, পাটীগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন-বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চার বৎসরে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা অনায়াসে এক বৎসরে শিখিতে পারিতাম। বিষয়গুলির উপর আমার দখল আরো সহজ ও স্পষ্ট হইত। আমার গুজরাটী শব্দের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হইত। সে জ্ঞান আমি পড়িতে ও কাজে লাগাইতে পারিতাম। এই ইংরেজি মাধ্যম আমার ও পরিবারের অন্য-সকলের মধ্যে— যাহারা ইংরেজি স্কুলে পাঠ গ্রহণ করে নাই— এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া করিয়া দিল। আমি যে কি করিতেছি সে বিষয়ে আমার পিতা কিছুই জানিতেন না। আমি যে কি শিখিতেছি সে বিষয়ে আমি চাহিলেও তাঁহার আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিতাম না। তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি থাকিলেও তিনি একবর্ণও ইংরেজি জানিতেন না। নিজের বাড়িতে আমি দ্রুত বিদেশী হইয়া যাইতেছিলাম। আমি অন্তত একজন 'কেষ্টবিষ্টু' হইয়া গিয়াছিলাম। আমার পোশাকেও সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল। আমার যাহা হইয়াছিল তাহা এমন কিছু অসাধারণ নয়, অধিকাংশ লোকেরই এরূপ অভিজ্ঞতা।

উচ্চবিদ্যালয়ের প্রথম তিন বৎসরে আমার সাধারণ জ্ঞান এমন কিছু বাড়ে নাই। সব বিষয় ইংরেজির মধ্য দিয়া ছেলেদের শিখাইবার ইহা ছিল প্রস্তুতির কাল। উচ্চবিদ্যালয়গুলি ছিল ইংরেজদের সংস্কৃতি বিস্তারের শিক্ষালয়। আমাদের স্কুলে তিন শত ছেলে যে-জ্ঞান লাভ করিত তাহা তাহাদের মধ্যেই সীমিত থাকিত, উহা জনগণের মধ্যে বিতরণের জন্য ছিল না।

সাহিত্যের বিষয়ে কিছু বলিবার আছে। ইংরেজি গদ্য ও পদ্যের কতকগুলি বই পড়িতে হইত। এ ব্যবস্থা অবশ্যই উপভোগ্য ছিল, কিন্তু জনগণের সেবা করিবার বা তাহাদের সংস্পর্শে আসিবার ব্যাপারে, এ জ্ঞান আমার কোনো কাজে লাগে নাই। ইংরেজি গদ্য পদ্য যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা যদি না শিখিতাম তাহা হইলে যে আমি দুর্লভ রত্ন হারাইতাম, সে কথা বলিতে পারি না। তাহার পরিবর্তে যদি ঐ মূল্যবান সাতটি বৎসর গুজরাটী ভালো করিয়া শিখিতাম, এবং গণিত বিজ্ঞান সংস্কৃত গুজরাটীর মাধ্যমেই শিখিতাম, তাহা হইলে আমি সহজে সেই জ্ঞান আমার প্রতিবেশীদের সহিত ভাগ করিয়া লইতে পারিতাম, গুজরাটী ভাষা সমৃদ্ধ করিতে পারিতাম— আর কে বলিতে পারে যে, আমার মনঃসংযোগের অভ্যাসের জন্য, আমার দেশ ও মাতৃভাষার প্রতি অত্যধিক অনুরাগের বলে, জনগণের সেবায় আরো অধিক ও মূল্যবান কাজ করিতে পারিতাম না?

কেহ যেন না মনে করেন যে আমি ইংরেজি ভাষা অথবা তাহার উদার সাহিত্যকে তাচ্ছিল্য করিতেছি। ইংরেজি আমি যে কত ভালোবাসি হরিজন পত্রিকার স্তম্ভে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিন্তু ইংলণ্ডের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অথবা উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন, তাহার উদার সাহিত্যও তেমনি ভারতবাসীর কোনো কাজে লাগে না। যদি এ কথা মানিয়াও লই যে ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্য হীন, তবু আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের নিজেদেরই ঐতিহ্যে গঠন করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ রচনা করিতে হইবে। পরের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে নিজেদের দরিদ্র করিয়া তুলিব। বিদেশী খাদ্য গ্রহণ করিয়া কখনোই আমরা পুষ্টিলাভ করিতে পারিব না। আমি চাই, ভারতবাসী তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার তথা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার রত্নরাজি আহরণ করুক। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় রচনা-সৌন্দর্য জানিবার জন্য আমার বাংলা শিখিবার আবশ্যক নাই। ভালো অনুবাদের মধ্য দিয়াই আমি তাহা জানিতে পারি। টলস্টয়ের ছোট গল্প আস্বাদন করিতে গুজরাটী ছেলেমেয়েদের রাশিয়ান ভাষা শিখিতে হয় না, ভালো অনুবাদের মধ্য দিয়াই তাহারা সেগুলি শেখে। ইংরেজরা গর্ব করিয়া বলে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রচনা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে সহজ ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়া তাহা তাহারা আস্বাদন করিতে পারে। তাহা হইলে শেক্সপীয়র ও মিলটনের উৎকৃষ্ট রচনার মর্ম বুঝিতেই বা আমাকে ইংরেজি শিখিতে হইবে কেন?

এক শ্রেণীর ছাত্র যদি জগতের বিভিন্ন ভাষায় যাহা-কিছু ভালো তাহা শিখিয়া মাতৃভাষায় তাহার অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহা

হইলে সুব্যবস্থা হয়। আমাদের প্রভুরা আমাদের জন্য ভুল পথ বাছিয়াছিলেন, এবং অভ্যাসের বশে ভুল পথও সত্য পথ বলিয়া মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। রাষ্ট্র শুধু তাহাদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে যাহাদের সেবা তাহার প্রয়োজন। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্য রাষ্ট্র বেসরকারী চেষ্টায় উৎসাহ দিক। শিক্ষার বাহন অবিলম্বে পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহার জন্য যে মূল্যই হউক দিতে হইবে। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে তাহাদের ন্যায্য মর্যাদা দিতে হইবে। দিন দিন যে শোচনীয় অপচয়ের পরিমাণ জমা হইতেছে, তাহার চেয়ে উচ্চশিক্ষায় সাময়িক বিশৃঙ্খলাও ভালো মনে করি।

আমি দাবি করি যে আমি উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি, কিন্তু যেভাবে এদেশে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় আমি তাহার বিরোধী। আমার পরিকল্পনায় এখনকার চেয়ে আরো বেশি এবং আরো ভালো লাইব্রেরি, আরো বেশি এবং ভালো পরীক্ষাগার, আরো বেশি এবং আরো ভালো গবেষণা-প্রতিষ্ঠান চাই। এই পরিকল্পনায় আমাদের দেশে রসায়নবিদ, ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের বাহিনী গড়িয়া উঠিবে, তাহারা হইবে জাতির প্রকৃত সেবক। এ জাতি দিন দিন তাহাদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিচিত্র ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এই বিশেষজ্ঞ-দল মিটাইতে পারিবে। ইহারা বিদেশী ভাষায় কথা কহিবে না, দেশের ভাষাতেই কথা বলিবে; যে জ্ঞান অর্জন করিবে তাহা হইবে জনসাধারণের সাধারণ সম্পত্তি। শুধু অনুকরণের পরিবর্তে প্রকৃত মৌলিক কাজ হইবে। এজন্য যাহা ব্যয় হইবে তাহা সমভাবে এবং ন্যায়সংগতভাবে বিভক্ত হইবে। ৪

বর্তমান কালের ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমশ গড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল যে-সকল সংস্কৃতির পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে, আমাদের মধ্যে অনেকে তাহাদের মিশ্রণে নূতন সংস্কৃতি গড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। স্পর্শ-দোষ বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে কোনো সংস্কৃতি বাঁচিতে পারে না। আজ ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ আর্যসংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। আর্যগণ ভারতেরই মূল অধিবাসী ছিলেন, না অবাঞ্ছিত বহিরাগত ছিলেন, তাহা জানিতে আমি বিশেষ উৎসুক নই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবাধে পরস্পর মেলামেশা করিয়াছেন। আমরা সেই মিশ্রণের ফল। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে আমাদের জন্মভূমির কোনো হিতসাধন করিতেছি কি না, অথবা আমরা তাহার একটা ভারস্বরূপ কি না, ভবিষ্যৎই শুধু তাহা প্রমাণ করিবে। ৫

বাড়ির চারি দিকে দেওয়াল তোলা এবং জানালাগুলি আঁটিয়া বন্ধ করা, এমন বাড়ি আমি চাই না। যতটা মুক্তভাবে সম্ভব, আমার বাড়ির চারি দিকে সকল দেশের সংস্কৃতির হাওয়া বহিতে থাকুক, ইহাই আমি চাহিব। কিন্তু কোনো হাওয়াই আমার পায়ের তলা হইতে মাটি সরাইয়া দিবে, এমনটি হইতে দিব না। আমাদের সাহিত্যরুচিসম্পন্ন তরুণ-তরুণীরা ইচ্ছামত ইংরেজি ও অন্যান্য বিশ্বভাষা যতটা শিখিতে পারে তাহা শিখুক, ইহাই আমি চাই, এবং তাহার পর তাহাদের জ্ঞানের ফল তাহারা আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অথবা স্বয়ং কবিগুরুর মতো দেশকে ও জগৎকে দান করিবে ইহাই আমি আশা করিব। কিন্তু আমি চাই না যে একজনও ভারতীয় তাহার মাতৃভাষাকে ভোলে, অবজ্ঞা করে, অথবা তাহার জন্য লজ্জা পায়; একজনও যেন নিজের মাতৃভাষায় চিন্তা করিতে বা শ্রেষ্ঠ ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষমতা বোধ না করে। আমার ধর্ম জেলখানার ধর্ম নয়। ৬

সংগীতের অর্থ ছন্দ, শৃঙ্খলা। ইহার ফল বিদ্যুতের মতো দ্রুত। ইহা শোনা মাত্র চিত্ত শান্ত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের শাস্ত্রের মতো সংগীতের চর্চাও অল্প কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ আছে। আধুনিক অর্থে ইহা জাতীয় সম্পত্তি হইয়া যায় নাই। স্বেচ্ছাসেবক বয়স্কাউট বা ব্রতী-বালক ও সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আমার কোনো হাত থাকিলে সমবেত ভাবে জাতীয় সংগীত যথাযথ গাওয়া বাধ্যতামূলক করিতাম; সেই উদ্দেশ্য লইয়া প্রত্যেক কংগ্রেস কনফারেন্সে বড় বড় সংগীতজ্ঞদের আনাইয়া সমবেত কণ্ঠে সংগীত শিক্ষা দেওয়াইতাম। ৭

পণ্ডিত খারের মতে, প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে সংগীতের স্থান থাকা উচিত। তাঁহার মত প্রচুর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি এ-প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

হাতের কাজ শিক্ষার মতো কণ্ঠস্বরের আরোহ-অবরোহ শেখাও আবশ্যক। যদি ছেলেমেয়েদের অন্তরের সবচেয়ে ভালো জিনিস বাহির করিয়া পড়াশোনায় তাহাদের প্রকৃত অনুরাগ জন্মাইতে হয় তাহা হইলে ড্রিল, হাতের কাজ বা শিল্পকার্য, অঙ্কন এবং সংগীত একসঙ্গে শেখানো উচিত। ৮

হাতের আগে আসে চোখ কান জিহ্বা; লেখার আগে আসে পড়া; বর্ণমালার অক্ষরগুলির উপর দাগা বুলাইবার আগে আসে আঁকা। এই স্বাভাবিক

প্রণালীর অনুসরণ করিয়া চলিলে, বর্ণমালা দিয়া শিশুদের শিক্ষা বাধা-গ্রস্তভাবে আরম্ভ করার চেয়ে, শিশুদের বোধশক্তি-বিকাশের অনেক বেশি সুযোগ মিলিবে। ৯

পরস্পরের মধ্যে সংস্পর্শ থাকিবে না, অথবা ব্যবধান বা প্রাচীর সৃষ্টি করিব, আমার মনে এরূপ কথা আসিতেই পারে না। কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতে চাই যে, নিজেদের সংস্কৃতির উপলব্ধি ও আয়ত্তীকরণের পরে, অন্য সংস্কৃতির সমাদর সম্ভব।... কাজ ছাড়া শুধু কেতাবি বুদ্ধিতে বোঝাও যা, প্রাণহীন দেহকে গন্ধদ্রব্যাদি দিয়া রাখিয়া দেওয়াও তা—দেখিতে সুন্দর, কিন্তু তাহাতে প্রেরণা আসে না, মনের উদারতা বাড়ে না। আমার ধর্ম যেমন আমাকে অন্য সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করিতে বা অবজ্ঞা করিতে নিষেধ করে, তেমনি আমার নিজের সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া তাহার অনুযায়ী জীবন-যাপনের উপর জোর দেয়। নতুবা নৈতিক জীবনে অপঘাত ঘটিবে। ১০

শুধু বই পড়িয়াই বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে, এই অতি ভ্রান্ত ধারণার স্থলে এ-সত্যটি জানা উচিত যে মিস্ত্রির কাজ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিখিলে মনের বিকাশ অতি দ্রুত হইতে পারে। যে মুহূর্তে শিক্ষার্নবিশকে, প্রতি পদক্ষেপে হাত চালাইবার বিশেষ ভঙ্গি কেন প্রয়োজন, অথবা যন্ত্রের কি প্রয়োজন, তাহা শিখানো হয় তখনই মনের বিকাশ আরম্ভ হয়। ছাত্রেরা যদি সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে একত্র আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাদের বেকার-সমস্যার অনায়াসে সমাধান হইতে পারে। ১১

শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার অনেকখানি মৌখিক হইবে, ইহা ভালো বলিয়াই যেন আমার মনে হয়। সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিবার পূর্বেই সুকুমারমতি শিশুদের উপরে বর্ণমালার জ্ঞান ও পড়িবার ক্ষমতা অর্জনের বোঝা চাপাইলে, নবীন বয়সের মুখে মুখে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা হইতে তাহা-দিগকে বঞ্চিত করা হয়। ১২

শুধু সাহিত্য শিক্ষা করিলে নৈতিক উন্নতির একটুও বৃদ্ধি হয় না, চরিত্র-গঠন সাহিত্যিক শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র। ১৩

ভারতবর্ষের পক্ষে নিঃশুল্ক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়ো-জনীয়তায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শিশুদের কোনো হিতসাধনী বৃত্তি

শিখাইয়া এবং উহা তাহাদের মানসিক দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলি অনুশীলনের মাধ্যম হিসাবে প্রয়োগ করিয়া, আমরা এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারিব বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি। শিক্ষার বিষয়ে এই-সব হিসাবনিকাশের কথা কেহ যেন হীনতাসূচক বা অপ্রাসঙ্গিক মনে না করেন। টাকা-পয়সার হিসাবের মধ্যে মূলত নীচতার কিছু নাই। প্রকৃত নীতিশাস্ত্রের নামের মর্যাদা রাখিতে হইলে যেমন তাহা যুগপৎ অর্থনৈতিক বিচারেও ভালো হইবে ইহাই অভিপ্রেত, সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ হইতেও তেমনি প্রকৃত অর্থনীতি কখনো ভ্রষ্ট হয় না। ১৪

বিভিন্ন বিজ্ঞানের শিক্ষা আমি মূল্যবান মনে করি। আমাদের শিশুরা যতই রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা শিখিবে ততই ভালো। ১৫

শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক আত্মা সবই বিকশিত হউক। হাত-পা শুকাইয়া প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, আর আত্মার কথা তো একেবারে ধরাই হয় নাই। ১৬

জীবনের বিষয়ে শিশুদের কৌতূহল থাকিলে, আমাদের যদি তাহা জানা থাকে তবে সে কৌতূহল মিটানোই উচিত; আর কোনো তথ্য আমাদের অজানা থাকিলে অজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। যদি উহা এমন কিছু হয় যে বলা উচিত নয় তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য, তাহাদের প্রশ্ন বন্ধ রাখিয়া তাহাদের বলা, যেন এরূপ প্রশ্ন আর কাহাকেও না করে। কখনোই তাহাদের এড়াইয়া যাওয়া উচিত নয়। আমরা যতটা মনে করি তাহার চেয়ে তাহারা বেশি জানে। যদি তাহাদের জানা না থাকে এবং আমরা তাহাদের বলিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে তাহারা অশোভন উপায়ে সেই জ্ঞান অর্জন করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তথাপি যদি সেই জ্ঞান তাহাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে হয় তবে এরূপ বিপদের ঝুঁকি লইতেই হইবে। ১৭

বুদ্ধিমান পিতামাতা শিশুদের ভুল করিতে দেন। জীবনে কখনো-না-কখনো একবার গায়ে আগুনের তাত লাগা ভালো। ১৮

যৌনপ্রবৃত্তির প্রতি অন্ধ থাকিয়া আমরা তাহা সংযত করিতে বা জয় করিতে পারি না। তাই আমি বিশেষভাবে কিশোর-কিশোরীদের তাহাদের জননেন্দ্রিয়ের তাৎপর্য ও প্রকৃত প্রয়োগ শিখাইবার পক্ষপাতী। যাহাদের

শিক্ষার দায়িত্ব আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এমন-সব ছেলেমেয়েদের আমার ভাবে এরূপ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমি যে যৌন শিক্ষা দিতে চাই তাহার উদ্দেশ্য অবশ্য যৌন আবেগ জয় করিয়া তাহার উন্নয়ন। এরূপ শিক্ষার স্বতই কাজ হইবে, শিশুদের নিকটে মানুষ ও পশুর মধ্যে মূল পার্থক্য বোঝানো; তাহাদের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যে, মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার অধিকার মানুষেরই আছে, এবং সেজন্য তাহার গর্বও বটে যে সে যেমন চিন্তা করিতে পারে তেমনি উপলব্ধি করিতেও পারে; এবং সেই কারণে অনুভব করে যে সামান্য সহজাত প্রবৃত্তির উপর যুক্তির আধিপত্য ত্যাগ করার অর্থ মানুষের মনুষ্যত্বই বিসর্জন দেওয়া। যুক্তি মানুষের অনুভূতিকে প্রাণবন্ত করে ও পরিচালিত করে, পশুর মধ্যে আত্মা চিরদিন সুপ্তভাবে থাকিয়া যায়। হৃদয়ের জাগরণ অর্থে নিদ্রিত আত্মার জাগরণ, যুক্তির জাগরণ, ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য দেখানো। আজকার দিনে আমাদের পড়াশুনা, ভাবনা-চিন্তা, সামাজিক আচরণ— সমস্ত পরিবেশই সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়-উপভোগের সাহায্য করে ও ইন্দ্রিয়ের সেবা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। ইহার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসা বড় সহজ কাজ নয়। কিন্তু ইহাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা হওয়া উচিত। ১৯

আমার দৃঢ় মত এই যে, ভারতের মুক্তি নির্ভর করে নারীর ত্যাগশক্তি ও উদ্‌বোধনের উপরে। ১

অহিংসার অর্থ অসীম প্রেম— আবার প্রেম বলিতে বুঝায় দুঃখ সহ্য করিবার অপরিসীম শক্তি। এই শক্তি মানবজননী নারীর মতো আর কাহার আছে? নয়মাস গর্ভে ধারণ করিয়া শিশুকে পুষ্ট করিবার কষ্ট যে-আনন্দে তিনি বহন করেন তাহার মধ্যেই এই শক্তির পরিচয়। প্রসব-বেদনা অপেক্ষা অধিক কষ্টের আর কি আছে? কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে জননী তাহা ভুলিয়া যান। সন্তান দিনে দিনে বাড়িবে এজন্য মায়ের মতো কে প্রতিদিন কষ্ট সহ্য করে? মাতৃহৃদয়ের সেই ভালোবাসা নারী যদি সমগ্র মানবজাতির উপর ঢালিয়া দিতে পারেন, কখনো তিনি যে পুরুষের কামনার বস্তু ছিলেন বা হইবেন ইহা যদি বিস্মৃত হইতে পারেন তবে তিনি সগৌরবে জননী-রূপে, স্রষ্টা রূপে, মৌন নেতৃত্বে পুরুষের পাশে স্থান অধিকার করিবেন। এই যুদ্ধরত জগৎবাসীর অমৃতপিপাসায় শান্তির পথ নির্দেশ করার কাজ নারী। ২

আমার নিজের মত এই যে পুরুষ ও নারী যেমন মূলে এক, তাহাদের সমস্যাও তেমনি বস্তুত এক। উভয়ের আত্মাই এক। দুই জনের একই জীবনে একই অনুভূতি। একে অন্যের পরিপূরক। একের সক্রিয় সহায়তা ভিন্ন অন্যে বাঁচিতে পারে না।

কিন্তু যে কারণেই হউক, যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষ নারীর উপরে প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে, ফলে নারীর মনে একটা হীনমন্যতার ভাব জন্মিয়াছে। পুরুষ আপনার স্বার্থের খাতিরে নারীকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, আর নারীজাতিও তাহাই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পুরুষের মধ্যে যাঁহারা ঋষি তাঁহারা তাহার সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটি অচিহ্নিত সীমারেখা আছে। যদিও মূলত উভয়েই এক, তথাপি দেহের গঠনেই তো মস্ত প্রভেদ। দুইয়ের কর্মধারাও নিঃসন্দেহে ভিন্ন। বেশির ভাগ নারীর মায়ের কর্তব্য সর্বদা পালন করিবার জন্য যে গুণগুলি থাকা দরকার পুরুষের সেগুলি প্রয়োজন নাই। নারী আপাত-

নিষ্ক্রিয়, পুরুষ সক্রিয়। নারী মুখ্যত গৃহকর্ত্রী। পুরুষের কাজ অন্ন-উপার্জন, নারীর কাজ অন্নের সংরক্ষণ ও বিতরণ। রক্ষায়ত্রী বলিতে যাহা বুঝায় নারী সকল অর্থে তাহাই। মানবশিশুকে যত্নে লালন-পালন করার কৌশল তাহারই বিশেষ ও একান্ত অধিকার। মায়ের যত্ন না পাইলে জাতিই ধ্বংস হইয়া যায়।

মেয়েদের যদি গৃহকোণ ছাড়িয়া বন্দুক ধরিতে বলা হয়, গৃহরক্ষার জন্য বন্দুক ঘাড়ে করিতে হয়, তবে তাহা পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই অসম্মানজনক। তাহা তো আদিম যুগে ফিরিয়া যাওয়া আর ধ্বংসের সূচনা। পুরুষ যে-ঘোড়ায় চড়িয়াছে স্ত্রী যদি সেই ঘোড়াকে চালাইতে যায় তবে সে নিজেও পড়িয়া যাইবে, পুরুষকেও ফেলিয়া দিবে। নারীকে তাহার নিজের বিশেষ কর্তব্য কর্ম হইতে বাহিরে টানিয়া আনিতে প্রলুব্ধ বা বাধ্য করার দোষে পুরুষই দোষী হইবে। বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে গৃহকে রক্ষা করার মধ্যে যে বীর্য আছে, সুশৃংখল ভাবে গৃহ-সংসার রচনার মধ্যে গৌরব তাহা অপেক্ষা কম নাই। ৩

আমি যদি মেয়ে হইয়া জন্মাইতাম তবে 'মেয়েরা পুরুষের খেলার পুতুল হইয়া জন্মিয়াছে' পুরুষের এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতাম। মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিবার জন্য আমি মনে মনে মেয়ে হইয়া গিয়াছি। আমি যতদিন না আমার পূর্ব আচরণ হইতে পৃথক ভাবে আমার স্ত্রীর প্রতি আচরণ করিব বলিয়া স্থির করিলাম এবং স্বামীর তথাকথিত কর্তৃত্ব সব ছাড়িয়া দিয়া আমার স্ত্রীকে তাঁহার সকল ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া দিলাম ততদিন পর্যন্ত তাঁহার অন্তরে স্থান করিয়া লইতে পারি নাই। ৪

পুরুষেরা আজ পর্যন্ত যত অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহার মধ্যে কোনোটিই মেয়েদের— যাঁহারা মানবজাতির অর্ধাংশ, কিন্তু দুর্বল অর্ধাংশ নন— অবমাননার মতো এত ঘৃণিত, এত নিষ্ঠুর নয়। আমার মতে স্ত্রী-পুরুষ দুইয়ের মধ্যে স্ত্রীজাতি মহত্তর; কেননা ত্যাগস্বীকার, নীরবে দুঃখবরণ, বিনয়, বিশ্বাস এবং জ্ঞানের প্রতিমূর্তি এই নারীজাতি। ৫

নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রী এই ধারণা মেয়েদের ভুলিতে হইবে। পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের হাতেই আছে ইহার প্রতিকার। ৬

সতীত্ব কাচের ঘরে ফুলের মতো জন্মে না। পর্দার আড়ালে থাকিয়া

ইহাকে রক্ষা করা যায় না। এই জিনিস ভিতর হইতে আসা চাই— অনাহূত প্রলোভন আসিয়া পড়িলে তাহা প্রতিরোধের শক্তি থাকিলে তবেই সতীত্বের পরীক্ষা হয়। ৭

তাহা ছাড়া মেয়েদের শুচিতা সম্বন্ধে এত দুর্ভাবনাই বা কেন? মেয়েরা কি পুরুষের শুচিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে? এ বিষয়ে মেয়েদের দুশ্চিন্তার কথা তো কই শোনা যায় না। তবে মেয়েদের শুচিতা সম্বন্ধে পুরুষের এই মাথাব্যথা কেন? বাহির হইতে এ জিনিস কাহারো উপর চাপানো যায় না— ইহাকে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে হয়। ৮

আমি মনে করি মেয়েরা আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেয়েরা ঠিক বোঝে না পুরুষের উপর তাহাদের কতখানি প্রভাব আছে। টলস্টয় ঠিকই বলিয়াছেন, পুরুষ যেন নারীকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েরা যদি অহিংসার বিপুল শক্তি উপলব্ধি করিত তবে তাহারা মানব-জাতির দুর্বল অঙ্গ এই অপবাদ সহ্য করিত না। ৯

নারীকে অধমাঙ্গ বলিয়া অবমাননা করা পুরুষের অবিচারের এক নিদর্শন। শক্তি বলিতে যদি পাশব শক্তি বুঝায় তবে বলিব, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কম পশুভাবাপন্ন। আর বল অর্থে যদি নৈতিক বল বুঝায় তবে মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা অনেক অনেক উন্নত। তাহাদের অনুভূতি, তাহাদের ত্যাগ, সহ্য করিবার শক্তি ও সংগ্রামে সাহস কি পুরুষের অপেক্ষা বেশি নয়? অহিংসা যদি আমাদের জীবনে মূলনীতি হয় তবে ভাবীকাল মেয়েদেরই আয়ত্তে। মানুষের হৃদয়দ্বারে আবেদন পৌঁছাইয়া দিতে মেয়েদের মতো কে পারে? ১০

জীবনে যা-কিছু সুন্দর ও শুচি সে-সব রক্ষার ভার মেয়েদের উপর। স্বভাবত রক্ষণশীল বলিয়া কুসংস্কার বর্জন করিতে হয়তো তাহাদের দেরি হয়, তেমনি সুন্দর ও কল্যাণের পথও তাহারা সহজে ত্যাগ করে না। ১১

আমি বিশ্বাস করি মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু আমি এ-কথাও বলি যে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বা তাহাদের অন্ধ অনুকরণ করিয়া নারী নিজের উৎকর্ষ-সাধন করিতে বা জগৎকে তাহার

যাহা দিবার আছে তাহা কখনোই দিতে পারিবে না। নারীকে পুরুষের পরিপূরক হইতে হইবে। ১২

নারী পুরুষের সঙ্গী; মানসিক শক্তি দুয়েরই সমান। পুরুষের সকল কাজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নারী তাহার পার্শ্বচরী হইয়া থাকিবে— ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বকীয়তায় দুই জনেরই সমান অধিকার। পুরুষের যেমন কর্মক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আছে, নারীরও আপন কর্তব্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা চাই। এই তো স্বাভাবিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত— লেখাপড়া শিক্ষার কথা এখানে আসে না। এক ঘোরতর অন্যায় প্রথার বলে অতি অযোগ্য মূর্খ পুরুষও নারীর অপেক্ষা অন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিয়া আসিতেছে। ১৩

'আমরা দুর্বল, অবলা নারী', মেয়েরা যদি এই কথাটি ভুলিতে পারে তবে তাহারা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি যুদ্ধনিরোধের কাজ করিতে পারে। যদি মায়েরা, স্ত্রীরা, এবং কন্যারা একজোটে যুদ্ধবিগ্রহে তাহাদের যোগ-দানের ব্যাপারে অসহযোগিতা করিত, তবে সেনানায়করা, সৈন্যরা কি করিত? ১৪

একজন উৎকৃষ্ট কর্মী ভগিনী স্থির করিয়াছিলেন, আজীবন কুমারী থাকিয়া দেশের কাজ করিবেন। সম্প্রতি আপনার মনোমত সঙ্গীর সন্ধান পাইয়া বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার মনে হইতেছে তিনি আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন ও অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি তাঁহার এই ভুল দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মেয়েদের পক্ষে অবিবাহিত থাকিয়া চিরদিন দেশের সেবা করা মহৎ কাজ সন্দেহ কি, কিন্তু তাহা লাখে একজন পারে। মানবজীবনে বিবাহ একটা স্বাভাবিক ধর্ম— বিবাহ মানুষকে নীচে নামাইয়া আনে এরকম মনে করা ভুল। কোনো অবস্থাকে যদি মানুষ পতন বলিয়া মনে করে তবে তাহার পক্ষে সেই অবস্থা হইতে নিজেকে উঠানো শক্ত। আদর্শ তো হইল বিবাহকে পবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিয়া বিবাহিত জীবনেও সংযমশীল হওয়া। বিবাহ হিন্দুধর্মের চারি আশ্রমের অন্যতম – আর বস্তুত অপর তিনটি আশ্রম ইহারই ভিত্তিতে স্থাপিত।

উপরে যে ভগিনীর কথা বলিলাম তাঁহার ও অন্যান্য ভগিনীদের সকলেরই উচিত বিবাহ-অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞা না করিয়া তাহাকে পবিত্র ধর্মবিধি বলিয়া মনে করা। আত্মসংযম অভ্যাস করিলে তাঁহারা দেখিবেন, বিবাহিত অবস্থার মধ্যেই তাঁহারা অধিকতর কর্মশক্তি লাভ করিবেন। যাঁহার দেশের বা মানুষের সেবা করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি অবশ্যই

সমভাবাপন্ন জীবন-সঙ্গী নির্বাচন করিবেন এবং তাঁহাদের মিলিত জীবনের দ্বারা দেশ সমধিক লাভবান হইবে। ১৫

মিলনেচ্ছু নরনারী পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবে— কিন্তু এক পক্ষের মত আছে বলিয়া অপর পক্ষকে এই বন্ধনে বাঁধিতে চাহিলে ভুল হইবে। নৈতিক বা অন্য কোনো কারণে যদি এক পক্ষ অপরের ইচ্ছার সঙ্গে একমত না হইতে পারে তবে সে এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমার ব্যক্তিগত মত, যদি বিবাহ-বিচ্ছেদই একমাত্র পথ হয় তবে তাহাও ভালো ও তাহা মানিয়া লইতে হইবে, তবু একসঙ্গে থাকিয়া নৈতিক উৎকর্ষের পথে বিঘ্ন বরণ করা চলিবে না— অবশ্য যদি নৈতিক কারণই একমাত্র কারণ হয়। ১৬

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মেয়েদের মাতার কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু বিবাহকে যদি পবিত্র ধর্মবিধি বলিয়া স্বীকার করি তবে মাতৃত্বও তো ধর্ম। আদর্শ জননী হওয়া সহজ নয়। সন্তানের জননী হইবার পূর্বে অনেক দায়িত্ব-জ্ঞান অর্জন করা দরকার। সন্তান গর্ভে আসার দিনটি হইতে ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কি কি করা উচিত সে বিষয়ে ভাবী জননীর জানা দরকার। বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, সদাচারী পুত্রকন্যার জন্ম দিয়া মা দেশের সেবা করেন। সেই মায়ের সন্তান বড় হইয়া দেশের কাজ করিবে। কথা এই যে, যাহাদের কাজ করিবার, সেবা করিবার ইচ্ছা আছে, তাহারা জীবনে যে অবস্থায়ই থাকে কাজ করিবে। কাজে বিঘ্ন আনে এরকম কোনো ভাবে তাহারা দিন যাপন করিবে না। ১৭

"কেহ কেহ মেয়েদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন বদলানো দরকার মনে করে না, কেননা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে মেয়েদের নৈতিক অবনতি ঘটিবে এবং পারিবারিক জীবন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে এইরূপ তাহারা মনে করে।"

এ বিষয়ে আমার অভিমত কি— এই প্রশ্নের উত্তরে আমি একটি পালটা প্রশ্ন করিতে চাই। পুরুষের তো স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে অধিকার আছে, তাহাদের মধ্যে কি দুর্নীতি নাই? যদি বল, হাঁ, আছে— তবে বলিব, মেয়েদের বেলায়ও না হয় তাহাই হউক। মেয়েরা যখন সম্পত্তিতে এবং অন্য-সব বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবে তখন দেখা যাইবে, তাহাদের সুনীতি-দুর্নীতির জন্য এই অধিকারকেই দায়ী করা চলে না। আর, যে নৈতিক বল পুরুষ বা নারীর অসহায় অবস্থার ফলে

উদ্ভূত, তাহার মূল্যই বা কি? যথার্থ নৈতিক শক্তি আমাদের হৃদয়ের শুচিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮

জনৈক যুবকের একটি পত্রের সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমি একজন বিবাহিত পুরুষ। বিবাহের অল্প পরেই আমি বিদেশে যাই। আমার এক বন্ধু, যাহাকে আমি এবং আমার পিতামাতা একান্তভাবে বিশ্বাস করিতাম, আমার পত্নীকে প্রলুব্ধ করে। তাহার ফলে আমার পত্নী এখন সন্তান-সম্ভবা। আমার বাবার মতে গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করা দরকার, নতুবা পরিবারের কলঙ্ক হইবে। আমার মতে এ-কাজ গর্হিত। হতভাগিনী বালিকা অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে। খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, কেবল কাঁদিতেছে। এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কি আপনি বলিয়া দিন।"

যথেষ্ট দ্বিধাভরে চিঠিখানা প্রকাশ করিলাম। সকলেই জানেন এরূপ ঘটনা সমাজে বিরল নয়। অতএব সংযতভাবে এ-বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সন্তান-বিনাশ যে পাপ, তাহা আমার নিকট দিবালোকের মতোই স্বচ্ছ। এই মেয়েটি যে-অন্যায় করিয়াছে অসংখ্য পুরুষ তো সেই দোষে দোষী। কিন্তু সমাজ তাহাদের বিচার করে না। সমাজ তাহাদের মার্জনা তো করেই, তাহাদের আচরণের নিন্দা অবধি করে না। পুরুষ অনায়াসে তাহার অপরাধ গোপন করিয়া চলে, কিন্তু নারীর লজ্জা ঢাকিবার উপায় নাই।

যে মেয়েটির কথা বলা হইল সে অনুকম্পার পাত্র। স্বামীর কর্তব্য হইবে, পিতার পরামর্শ না শুনিয়া, যে-শিশুর জন্ম হইবে তাহাকে পিতার মতো স্নেহযত্নে লালন-পালন করা। পত্নীর সঙ্গে একত্রে বাস করিবে কি না সে প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য সহজ নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো পৃথক থাকাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে তাহার জীবনযাত্রার ব্যয় বহন করা, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সৎপথে জীবন-যাপনে তাহাকে সাহায্য করা স্বামীর অবশ্যকর্তব্য। স্ত্রীর অনুতাপ যদি সত্য এবং আন্তরিক হয় তবে ক্ষমা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করাও আমি দূষণীয় মনে করি না। বরং আন্তরিক অনুশোচনার পর বিপথগামিনী স্ত্রীকে লইয়া সংসার করার পবিত্র কর্তব্য-পালনে রত হওয়া স্বামীর উপযুক্ত কাজ বলিয়াই মনে হয়। ১৯

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুর্বলের অস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত; কিন্তু আমি যে-প্রতিরোধের এক নূতন নামকরণ করিয়াছি তাহা কিন্তু দুর্বলের অস্ত্র নয়, তাহা

বলিষ্ঠতমের অস্ত্র। আমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝাইবার জন্য আমি ইহার একটি নূতন নাম দিয়াছি। ইহার অতুলনীয় মাহাত্ম্য এই যে, বলিষ্ঠতমের এই অস্ত্র দুর্বলদেহ, বৃদ্ধ বা শিশু সকলেই প্রয়োগ করিতে পারে, অন্তত যদি সাহস থাকে। সত্যাগ্রহের দ্বারা প্রতিরোধ, দুঃখবরণের মধ্য দিয়া করিতে হয় বলিয়া ইহা তো বিশেষভাবে মেয়েদেরই হাতের অস্ত্র। গত বৎসর আমরা দেখিয়াছি, অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশি নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে এবং উভয়ে মিলিয়া এক মহা অভিযান চালাইয়াছে। আত্মোৎসর্গ সংক্রামকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও আশ্চর্য ত্যাগের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইউরোপের মেয়েরা যদি মনুষ্যপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত উৎসাহে যুদ্ধবিগ্রহ-প্রতিরোধের কাজে লাগিয়া যায়, তবে পুরুষদের বিস্মিত করিয়া অচিরেই কি হানাহানি থামিয়া যাইবে না? ইহার মূল কথা এই যে, স্ত্রী পুরুষ বালক যুবক সকলেরই আত্মা এক এবং আত্মিক শক্তিও এক। সত্যের এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করিয়া কাজে লাগানোই প্রশ্ন। ২০

উৎপীড়িত বা আক্রান্ত হইলে হিংসা বা অহিংসার কথা ভাবিলে চলিবে না— তখন নারীর প্রথম কর্তব্য আত্মরক্ষা। নিজের সম্মান যে উপায়ে বাঁচানো সম্ভব তাহাই সে অবলম্বন করিবে। ভগবান নখ ও দাঁত দিয়াছেন, সর্বশক্তিতে ও সর্বপ্রযত্নে সে ঐ দুই অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। এই চেষ্টায় যদি প্রাণ যায় সেও ভালো। মৃত্যুভয় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিলে মানুষ, স্ত্রী পুরুষ যে-ই হউক, কেবল যে আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা নয়, ঐভাবে মৃত্যুবরণ করিয়া অপরকেও শিক্ষা দেয়। আসলে আমরা মরণকে বড় ভয় করি, এবং সেজন্যই প্রবলতর শক্তির কাছে নতিস্বীকার করি। কেহ আক্রমণকারীর নিকট নতজানু হয়, কেহ তাহাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করে, কেহ-বা আরো অন্যরকম হীনতা স্বীকার করে, এবং কোনো কোনো স্ত্রীলোক মৃত্যুবরণের চেয়ে বরং দেহদান করিয়াও জীবনবরণ করে। আমি এ-কথা নিন্দাচ্ছলে বলিতেছি না— মনুষ্য-প্রকৃতির কথা বলিতেছি। হামাগুড়ি দিয়া চলার হীনতাই হউক, আর পুরুষের কামনার কাছে নারীর দীনতা-স্বীকারই হউক, সবই আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষার কাছে যে-কোনো ভাবে নতিস্বীকারের সাক্ষ্য দেয়। সেজন্য যে-ই জীবন উৎসর্গ করিবে সে-ই বাঁচিবে। জীবন উপভোগ করিতে হইলে বাঁচিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের ভাব আমাদের স্বভাবের অঙ্গ হওয়া চাই। ২১

আমার হিংসাত্মক কোনো প্রস্তুতি নাই। আমার মতে শ্রেষ্ঠতম সাহস লাভের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন সবই অহংস উপায়ে করিতে হইবে। যে নারী অস্ত্র ব্যতীত আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহাকে অস্ত্র সঙ্গে রাখিবার কথা বলিতে হইবে না, সে অস্ত্র কাছে রাখিবেই। অস্ত্র রাখিব কি না রাখিব বারংবার এ প্রশ্নের মধ্যে কিছু গলদ আছে। সকলেরই স্বাধীনভাব থাকা দরকার। আসল প্রতিরোধ অহিংসার পথে— এই মূল সত্যটি মনে রাখিলে লোকে সেইভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিবে। আপনার অজ্ঞাতসারে জগতের লোক তো তাহাই করিতেছে। এই শ্রেষ্ঠতম সাহস, যাহা অহিংসার দান, তাহা নাই বলিয়াই জগতে সমরোদ্যম, এমন-কি অ্যাটম বোমার আমদানি। হিংসার এই ব্যর্থ পরিণাম যাহাদের চোখে পড়ে না তাহারা তো সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইবে। ২২

জগতে স্ত্রীজাতির কত শক্তি, আমেরিকার মেয়েদের আজ তাহা দেখাইতে হইবে। কিন্তু তাহা তখনই সম্ভব যখন মেয়েরা আর পুরুষের অবসর-সময়ের খেলার পুতুল থাকিবে না। তোমরা স্বাধীনতা পাইয়াছ। ভোগ-বিলাসের ধ্বজা তুলিয়া ভুয়া বিজ্ঞানের বন্যায় আজ পাশ্চাত্য জগৎকে ডুবাইয়া দিতেছে। তাহাতে গা ঢালিয়া দিতে অস্বীকার করিয়া তোমরা শান্তির অনুকূল শক্তি সৃষ্টি করিতে পার, এবং অহিংসা-শাস্ত্রের চর্চায় অভিনিবিষ্ট হইতে পার। কারণ ক্ষমা তোমাদের স্বভাব-ধর্ম। পুরুষের অনুকরণের দ্বারা তোমরা পুরুষ হইবে না, এবং তোমাদের প্রকৃতির, ও ঈশ্বর মেয়েদের যে বিশেষ গুণ দিয়াছেন তাহার, বিকাশ ও পূর্ণতা লাভও হইবে না। পুরুষ অপেক্ষা নারীকেই ভগবান অনুগ্রহ করিয়া সর্বাধিক অহিংসার শক্তি দান করিয়াছেন। নীরব বলিয়াই ইহার কার্যকারিতা অধিক। স্বভাবের নিয়মেই মেয়েরা অহিংসার দূত— যদি তাহারা তাহাদের উন্নত মর্যাদার কথা উপলব্ধি করিতে পারে। ২৩

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ভারতের নরনারী যদি অহিংস থাকিয়া নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে তবে অস্ত্রসম্ভারের শক্তিকে হাসিমুখে উপেক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের জনসাধারণের জন্য অবিমিশ্র স্বাধীনতার আদর্শ জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিবে। সেই কাজে মেয়েরাই নেতৃত্ব করিবে, কেননা তাহারা যে সহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকারের প্রতিমূর্তি। ২৪

বিবিধ

আমি ভবিষ্যতের কথা জানিতে চাই না। বর্তমান লইয়াই আমার কাজ। পরমুহূর্তে কি হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেন নাই। ১

আমাকে লোকে ছিটগ্রস্ত বাতিকগ্রস্ত পাগল বলিয়া জানে। এই খ্যাতি আমার প্রতি সত্যই খাটে। কারণ আমি যেখানেই যাই আমার সঙ্গে ছিট-গ্রস্ত বাতিকগ্রস্ত পাগলের দল আসিয়া জোটে। ২

যে-সকল নরনারী অবিচল নিষ্ঠাভরে অবিরত কঠিন পরিশ্রমের ক্লান্তিকর কাজ করিয়া যাইতেছে, আমার তথাকথিত মহত্ত্ব তাহাদের নীরব কর্মের উপর যে কতখানি নির্ভরশীল তাহা জগতের লোকে কতটুকুই বা জানে। ৩

আমি নিজেকে জড়বুদ্ধি মনে করি। অনেক জিনিস বুঝিতে আমার সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি সময় লাগে, কিন্তু আমার তাহাতে আসে-যায় না। মানুষের বুদ্ধিসত্তার বিকাশ সীমিত, কিন্তু অন্তরের সম্পদের বিকাশের কোনো সীমা নাই। ৪

মোটামুটি বলা যায় আমার জীবনে বুদ্ধি তেমন বেশি কাজ করে নাই। আমার মনে হয় আমি একটু স্থূলবুদ্ধি। ভক্ত ব্যক্তিকে ঈশ্বর যে তাহার প্রয়োজনানুরূপ বুদ্ধি জোগাইয়া দেন ইহা আমার ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। আমি চিরদিন বড়দের ও জ্ঞানীদের সম্মান করিয়াছি ও তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস থাকিয়াছে সত্যের প্রতি এবং সেজন্য পথ দুর্গম হইলেও আমি সহজে তাহা পার হইয়াছি। ৫

আমাকে যে-সব অভিভাষণ দেওয়া হয় তাহাতে বেশির ভাগ সময় এমন সব বিশেষণ আমার উপর আরোপ করা হয় যাহা বহন করিবার যোগ্যতা আমার নাই। এই বিশেষণের প্রয়োগে কাহারো উপকার হয় না— না তাহাদের, না আমার। আমি এই-সবের যোগ্য নহি, এই বোধ আমাকে লজ্জায় ফেলে। আর যদি আমার সত্যই কোনো গুণ থাকে তবে তাহার

উল্লেখ অবান্তর। কীর্তনে তো গুণগুলি বাড়িবে না। বরং যদি সতর্ক না থাকি তবে আমার মাথা ঘুরিয়া যাইবার আশঙ্কা। মানুষ যতটুকু ভালো কাজ করে তাহার উল্লেখ না করাই ভালো। অনুকরণেই ভালো কাজের আন্তরিক সুখ্যাতির পরিচয় মেলে। ৬

আদর্শ লক্ষ্য নিয়তই সরিয়া যায়। উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই অযোগ্যতা ধরা পড়ে। প্রয়াসের মধ্যেই তৃপ্তি, প্রাপ্তিতে নয়। পরিপূর্ণ চেষ্টাতেই পূর্ণ জয়। ৭

মধ্যযুগের নাইটদের মতো দেশে দেশে ঘুরিয়া দুর্দশায় পতিত নরনারীর উদ্ধার-সাধন আমার ব্রত নয়। আমার ক্ষুদ্র সাধ্য অনুসারে মানুষকে নিজের দুর্দশা হইতে মুক্ত হইবার পথ দেখানো আমার কাজ। ৮

আমাকে যে রাজনীতিতে যোগ দিতে হইতেছে তাহা শুধু এজন্য যে, বর্তমান কালে রাজনীতি আমাদের সাপের মতো বেড়িয়া ধরিয়াছে— যত চেষ্টাই করি সেই বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইবার সাধ্য কাহারো নাই। আমি তাই সেই সাপের সঙ্গে লড়াই করিতে চাই। ৯

সমাজ-সেবার কাজ আমার কাছে রাজনীতি করার চেয়ে কোনো অংশে ছোট নয়। বলিতে কি, যখন দেখিলাম রাজনীতি না করিলে আমার সমাজ-সেবার কাজ কিছুটা ব্যাহত হয় তখনই কেবল আমি এই কাজের জন্য যতটা দরকার ততটাই রাজনীতিতে যোগ দিলাম। সুতরাং এ-কথা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সমাজ-সংস্কারের কাজ বা আত্মশুদ্ধির কাজ আমার কাছে রাজনীতি করা অপেক্ষা অনেক প্রিয়। ১০

আমি পাঁচটি পুত্রের পিতা। যথাসম্ভব জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আমি তাহাদের পালন করিয়াছি। আমি পিতা-মাতার একান্ত বাধ্য ছিলাম, শিক্ষকদেরও আমি সর্বপ্রকারে মান্য করিয়াছি। পিতার কর্তব্য আমি জানি। কিন্তু এই-সব কর্তব্য অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য আমি বড় বলিয়া মনে করি। ১১

আমি দ্রষ্টা নই। আমি নিজেকে সাধু বলিয়া দাবি করি না। আমি একান্তই এই মাটির পৃথিবীর মানুষ। তোমার যে দোষ ও দুর্বলতা আছে আমারও সে-সব আছে। কিন্তু আমি সংসারকে দেখিয়াছি, সংসারে যে-

সকল অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া মানুষকে চলিতে হয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং চোখ খুলিয়া চলার এই শিক্ষা আমার হইয়াছে। ১২

আমার মতের পরিবর্তন হয় না এরকম শ্লাঘা আমি করি না। আমি সত্যের পূজারী। কোনো বিষয়ে মত দিতে হইলে তখন, আগে এ-বিষয়ে আমি কি বলিয়াছি তাহার দিকে না চাহিয়া, আমি যেরূপ বুঝি ও ভাবি তাহাই আমাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। আমার দৃষ্টি যত স্বচ্ছ হইবে আমার মতও নিশ্চয় দৈনন্দিন আচরণের সঙ্গে সঙ্গে ততই স্বচ্ছ হইবে। আমার মত পরিবর্তনে সেই পরিবর্তনের কারণ পরিষ্কার প্রকাশ পাওয়া উচিত। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিলে তবে সূক্ষ্ম ক্রমবিকাশ ধরা পড়িবে। ১৩

কখনো মত বদলাই না, এই খ্যাতির জন্য আমি একেবারেই ব্যস্ত নই। সত্য অনুসরণের পথে আমি পদে পদে কত নূতন জিনিস শিখিয়াছি, কত পুরাতন ধারণা ত্যাগ করিয়াছি। এই বৃদ্ধ বয়সেও এ-কথা আমার মনে হয় না যে, আমার অন্তরের বিকাশ বা বৃদ্ধি শেষ হইয়াছে, অথবা এই মরদেহ বিনাশের সঙ্গেই আমার আত্মিক উন্নতি বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি চাই প্রতি মুহূর্তে সত্যকে, আমার ঈশ্বরকে, যেন মানিয়া চলিতে পারি। ১৪

লিখিতে বসিয়া আমি কখনো আগে কি বলিয়াছি তাহা চিন্তা করি না। কোনো বিষয়ে আমার পূর্বের মত যাহাই হউক না কেন, লিখিবার মুহূর্তে সত্য আমার কাছে যে ভাবে প্রকটিত হইতেছে তাহাই আমি প্রকাশ করি। তাহার ফলে সত্যের পথে আমি ক্রমশই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি; স্মৃতি-শক্তির উপর অযথা জুলুম করিতে হয় নাই। তাহার অপেক্ষা বড় কথা এই যে, যখন আমার পঞ্চাশ বৎসর আগেকার লেখার সঙ্গে এখনকার লেখা মিলাইয়া দেখিতে হইয়াছে, দেখিয়াছি দুইয়ের মধ্যে মত-বৈষম্য নাই। যে-বন্ধুরা মত-বৈষম্য দেখিতে পান তাঁহারা বর্তমান লেখার যে-অর্থ হয় তাহাই গ্রহণ করিলে ভালো করিবেন, যদি না অবশ্য তাঁহার পূর্বের অর্থই বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু বাছাই করিয়া লওয়ার আগে একবার ভালো করিয়া দেখা উচিত যে দুইটির আপাত-বৈষম্যের মধ্যেও একটি অন্তর্নিহিত স্থায়ী ঐক্য আছে কি না। ১৫

প্রাণহীন মৌখিক প্রার্থনা অপেক্ষা মৌন আন্তরিক প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ। ১৬

আমার অসহযোগের অন্তরালে নিকৃষ্টতম শত্রুর সঙ্গেও সামান্যতম অছিলায়

সহযোগিতা করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকে। আমি নিতান্ত অসম্পূর্ণ মানুষ, প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের করুণায় আমার প্রয়োজন, কাজেই আমার কাছে কেহই উদ্ধারের অযোগ্য নয়। ১৭

আমার অসহযোগের মূল প্রেমে, ঘৃণায় নয়। আমার ব্যক্তিগত ধর্মে কাহাকেও ঘৃণা করিতে কঠোর নিষেধ। আমার বারো বৎসর বয়সে একখানা স্কুল-পাঠ্য বইয়ে আমি এই সহজ অথচ মহৎ নীতির কথা পড়িয়াছিলাম, আজ অবধি তাহা আমার মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এ বিশ্বাস দিন দিন বাড়িতেছে। আমার কাছে ইহা জ্বলন্ত বিশ্বাস। ১৮

ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। ক্ষমার কোনো সীমা নাই। দুর্বল ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারে না, ক্ষমা সবলেরই গুণ। ১৯

দুঃখ সহ্য করিবার সুনির্দিষ্ট সীমা আছে। সহ্য করা দুই রকম হইতে পারে— বুদ্ধিমানের মতো, আর নির্বোধের মতো। সীমা ছাড়াইয়া গেলেও সহ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং চরম নির্বুদ্ধিতা। ২০

ধনৈশ্বর্যের তুলনায় সত্যনিষ্ঠা, বিত্ত ও ক্ষমতার তুলনায় নির্ভীকতা, আত্ম-প্রীতির তুলনায় পর-হিতৈষণা— যেদিন আমাদের বেশি আছে বলিয়া দেখাইতে পারিব, সেদিনই জাতি হিসাবে আমরা সত্য সত্য অধ্যাত্মগৌরবের অধিকারী হইবে। আমরা যদি আমাদের গৃহ প্রাসাদ ও মন্দিরগুলিকে ধন-দৌলতের ভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে নৈতিক বিশুদ্ধতার ভাব ফুটাইয়া তুলি, তবে যে-কোনো শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারিব— দেশরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী রাখিবার বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। ২১

আমার মতে, ভারত বরং ধ্বংস হইয়া যাক, তবু যেন সত্যকে বিসর্জন দিয়া সে স্বাধীনতা অর্জন না করে। ২২

যদি আমার রসবোধ না থাকিত, তবে আমি অনেক পূর্বেই আত্মহত্যা করিতাম। ২৩

আমার জীবনদর্শন বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহাতে এই কথাই বলে যে বাহির হইতে কেহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ক্ষতি করিবে এমন সম্ভাবনার স্থান নাই। উদ্দেশ্য যখন খারাপ থাকে, অথবা উদ্দেশ্য ভালো হইলেও তাহার

রক্ষকেরা মিথ্যাচারী, দুর্বলচিত্ত অথবা অশুচি হয়, তখনই শুধু ক্ষতি হয় এবং সেই ক্ষতি যুক্তিযুক্তও বটে। ২৪

যে-কোনো ভাবেই হউক, মানুষের মধ্যে যাহা মহত্তম আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে পারি, আর সেজন্যই ঈশ্বরে ও মানব-প্রকৃতিতে আমার শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিয়াছি। ২৫

আমি যাহা হইতে চাই, আমার যাহা আদর্শ, তাহা যদি হইতে পারিতাম তবে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হইত না। আমি যাহা বলিতাম তাহা সোজা মানুষের অন্তর স্পর্শ করিত। কথাও বলিতে হইত না। শুধু আমার ইচ্ছাশক্তিই যাহা চাই তাহা ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার শক্তি সীমাবদ্ধ এবং তাহা আমি ভালো করিয়াই জানি। ২৬

যুক্তিবাদীরা বরেণ্য; কিন্তু যুক্তিবাদ যখন নিজেকে সর্বশক্তিমান বলিয়া মনে করে তখন তাহা রাক্ষসের মতো ভীষণ। মাটি ও প্রস্তরকে ঈশ্বর-বিশ্বাসে পূজা করা যেমন পৌত্তলিকতা, যুক্তিবাদকে সর্বশক্তিমান মনে করাও সেই রকম একপ্রকার পৌত্তলিকতা। যুক্তিকে দাবাইয়া রাখার কথা আমি বলি না; মানুষের মনে যে-শুভবুদ্ধি যুক্তির পথ নির্দেশ করে, তাহাকে সমুচিত ভাবে মানিয়া পথ চলিতে বলি। ২৭

সংস্কারের সকল ক্ষেত্রেই বারংবার চর্চার দ্বারা তবে বিষয়টির উপর দখল আনা দরকার। সব সংস্কার-কার্যেই সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমাদের অজ্ঞতা, কারণ সংস্কারের নামে যত-কিছু পরিকল্পনা করা হয় সবই সংস্কার নামের যোগ্য নয়। ২৮

জীবন্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে শুষ্ক যুক্তিবাদের নীতি অনুসরণ করিলে কেবল যে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তাহাই নয়, অনেক সময় আমাদের বিচার মারাত্মক হয়। কারণ মানুষকে বিচার করিবার সময়ে সব কিছু সূত্র আমাদের আয়ত্তে থাকে না. আর একটি ক্ষুদ্র সূত্র হারাইলেই তো সিদ্ধান্ত ভুল হইতে পারে। সেজন্যই আমরা কখনো সত্যের শেষ পর্যন্ত যাইতে পারিব না। কিছুদূর মাত্র পৌঁছাই. তাহাও আবার অতিরিক্ত সতর্ক থাকিলেই সম্ভব। ২৯

আমাদের চিন্তাধারাই কেবল ভালো, অপরের চিন্তাধারা ভালো নয়, অতএব

আমাদের সঙ্গে যাহাদের মত মেলে না তাহারাই দেশের শত্রু, এরূপ বলা বদ অভ্যাস। ৩০

আমরা নিজেদের মত ও বিশ্বাসকে যেমন মূল্য দিই, তেমন করিয়াই বিরুদ্ধবাদীদের দেশপ্রেমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সততাকে আমাদের সম্মান করিতে হইবে। ৩১

এ-কথা সত্য যে অনেক লোক আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে, অনেকে আমাকে নিরাশ করিয়াছে, অনেকে আমাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা মনে করিয়া আমি দুঃখ করি না। কারণ লোকের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে যেমন জানি, কখন অসহযোগ করিতে হয় তাহাও আমার জানা। যতক্ষণ না বিপরীত দিকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ততক্ষণ লোকের কথার উপর আস্থা রাখিয়া চলাই সম্মানজনক ও কাজ করার পক্ষে উপযোগী। ৩২

উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিলে চলিবে না। আমাদের নূতন ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করিতে হইবে। প্রাকৃতিক জগতে আমরা কত নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবন করিতেছি, আর আধ্যাত্মিক জগতেই কি আমরা দেউলিয়া হইয়া থাকিব? ব্যতিক্রমগুলিকেই বাড়াইয়া কি নিয়মে পরিণত করিতে পারিব না? মানুষ কি চিরদিনই প্রথমে পশু, পরে সম্ভব হইলেই শুধু মানুষ হইয়া দেখা দিবে? ৩৩

মহৎ প্রচেষ্টার জয়-পরাজয় নির্ভর করে কর্মীরা কি উপাদানে গঠিত তাহার উপর, তাহাদের সংখ্যার উপরে নয়। মহাপুরুষেরা চিরদিনই একা। জরথুস্ত্র, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ— সব মহাপুরুষই তাঁহাদের পথে একা ছিলেন। আরো অনেকের নাম করা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ও নিজেদের উপরে তাঁহাদের জীবন্ত বিশ্বাস ছিল, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের পক্ষে আছেন এই বিশ্বাসে কখনো নিজেদের একাকী মনে করেন নাই। ৩৪

সভা করা বা ছোট ছোট দলে কাজ করা ভালোই। তাহাদের দ্বারা কিছু কাজ নিশ্চয়ই হয়— কিন্তু কতটুকু? সে-সব তো গৃহ-নির্মাণের পূর্বে যে-অস্থায়ী 'ভারা' তৈয়ার করা হয়, তাহার মতো। আসল জিনিস হইল এমন অবিচল বিশ্বাস যাহা কিছুতেই নির্বাপিত হয় না। ৩৫

তোমার যে-কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় তাহার জন্য তুমি কত যত্ন ও মনোযোগ ঢালিয়া দাও! যে-কাজ তোমার অতি তুচ্ছ মনে হইতেছে তাহাও ততখানি যত্নে ও মন দিয়া করিবে। কারণ ঐ সব ছোটখাট কাজ দিয়াই তোমার বিচার করা হইবে। ৩৬

আলোকের সন্ধানে পাশ্চাত্যের দিকে চাওয়ার বিষয়ে, আমার সমগ্র জীবন দিয়াই যদি কিছু বলা না হইয়া থাকে, তবে আর কি নির্দেশ দিতে পারি? এক সময়ে প্রাচ্য হইতেই আলোক বিকীরিত হইত। আজ যদি প্রাচ্যের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া গিয়া থাকে তবে অবশ্য পশ্চিমের কাছেই হাত পাতিতে হইবে। কিন্তু আমি ইহাও ভাবি, আলোক যদি মিথ্যা মরীচিকা না হইয়া সত্যই আলো হয়, তবে কি তাহা একেবারে ফুরাইয়া যাইতে পারে? বাল্যকালে শিখিয়াছিলাম, যত দান করিবে ততই বাড়িয়া যাইবে। আর সেই বিশ্বাসেই আমি ভারতের ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া বেসাতি করিয়াছি। তাহা কখনো আমাকে নিরাশ করে নাই। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিব। পাশ্চাত্য হইতে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে লাভবান হওয়ার তো নিষেধ নাই, কেবল দেখিতে হইবে যেন পশ্চিমের জাঁকজমকে আমরা অভিভূত না হই। আমরা যেন চাকচিক্যকে সত্যকার আলোক বলিয়া ভুল না করি। ৩৭

পুরাতন সব কিছুই ভালো এরকম অন্ধ সংস্কার আমার নাই। ভারতের বলিয়াই জিনিসটা ভালো আমি এরূপও বিশ্বাস করি না। ৩৮

পুরাতন নামে যাহা-কিছু চলে তাহাকেই অন্ধভাবে আমি পূজা করি না। যতই কেন প্রাচীন হউক, মন্দ বা নীতিবিরুদ্ধ হইলে তাহাকে বিনা দ্বিধায় ধ্বংস করিতে আমি পারি। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিব যে প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের আমি ভক্ত, এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে পুরাতন বলিয়াই ধ্বংস করিতে এবং জীবনযাপনের ব্যাপারে তাহাদের অস্বীকার করিয়া চলিতে দেখিলে আমি দুঃখ পাই। ৩৯

চিরাচরিত পথে না চলিয়া, নিজ বিচারের দ্বারা নির্ধারিত সত্য পথে চলার নামই প্রকৃত নৈতিক সততা। ৪০

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইলে কোনো কাজেরই নৈতিক মূল্য নাই। যন্ত্রের মতো কাজ করিলে নৈতিক বিচারের প্রশ্নই উঠে না। কর্তব্য বুঝিয়া

জ্ঞানতঃ যে-কাজ করা হয় তাহাকেই সৎ কাজ বলা চলে। ভয়ে বা বাহিরের চাপে করিলে সে-কাজ নৈতিক মূল্য হারায়। ৪১

প্রতিবেশীদের যখন তোমার ভালোবাসা ও শুভ বিচারবুদ্ধির উপর দৃঢ় আস্থা জন্মিবে, এবং তাহারা তোমার বিচার না মানিয়া নিলেও যখন তোমার চিত্ত কিছুমাত্র বিকল হইবে না, তখনই কেবল তাহাদের তীব্র সমালোচনা করিবার অধিকার তোমার জন্মিবে। অন্য কথায় বলিতে হয়, সমালোচকের চাই প্রেমের চোখে পরিষ্কার ভাবে সব দেখিবার ও বুঝিবার মতো সহনশীলতা। ৪২

অপরাধী কথাটা অভিধান হইতে তুলিয়া দেওয়া দরকার। নতুবা আমরা সকলেই অপরাধী হইয়া থাকিব। সেই যখন বলা হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সেই প্রথম পাথরটি ছুঁড়িবে, তখন পতিতা নারীর উপর পাথর ছুঁড়িতে কাহারো সাহসে কুলাইল না। একজন কারাধ্যক্ষ একবার বলিয়াছিলেন, গোপনে আমরা সকলেই অপরাধী। কিছুটা পরিহাসভরে বলিলেও কথাটি গভীরভাবে সত্য। সুতরাং সকলকেই ভালো ভাবে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। আমি জানি যে এ কাজ বলিতে সহজ, করা কঠিন। কিন্তু গীতা এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে সকল ধর্মই ঠিক এই কাজই করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ৪৩

মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে। কথাটার অর্থ এই, তাহার স্বাধীনতা কি ভাবে কাজে লাগাইবে তাহা বাছিয়া লইবার ক্ষমতা মানুষের আছে। কিন্তু ফলের উপর তাহার হাত নাই। ৪৪

ভালো করিবার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধিরও যোগ থাকা চাই। শুধুমাত্র ভালো করিবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। আধ্যাত্মিক সাহস ও চারিত্রবলের সঙ্গে যে-সূক্ষ্ম বিচারশক্তি থাকে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সংকট-কালে কখন কথা বলিতে হইবে, কখন বা নীরব থাকিতে হইবে, কখন কর্ম করিতে হইবে, কখন বা কর্মে বিরত হওয়া চাই, এই-সব জানিতে হইবে। এই-সব ক্ষেত্রে কর্ম ও নিষ্ক্রিয়তা পরস্পর-বিরোধী নয়, ইহারা এক। ৪৫

চেতন অচেতন ভগবানের সৃষ্ট সকল জিনিসেরই ভালো মন্দ দুইটি দিক আছে। পুরাণে বর্ণিত সেই পাখি যেমন নীর ফেলিয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণ

করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমনি খারাপ ভাগ বর্জন করিয়া ভালো ভাগ গ্রহণ করেন। ৪৬

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে, আমি যখন অবিশ্বাস ও সংশয়ে নিতান্ত আকুল অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলাম, তখন আমার হাতে আসিল টলস্টয়ের 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ' বইখানা। আমি বইটির দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হইলাম। আমি তখন হিংসার পথে বিশ্বাসী। বইটি পড়িয়া আমার সে-বিশ্বাস দূর হইল, আমি অহিংসায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইলাম। টলস্টয়ের জীবনে আমার যাহা সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছিল তাহা হইল এই যে, তিনি মুখে যাহা বলিতেন কাজেও তাহাই করিতেন এবং সত্যের সন্ধানে যথাসর্বস্ব পণ করিয়া চলিতেন। তাঁহার সরল জীবনযাত্রার কথা ভাবুন। তাহা সত্যই অদ্ভুত ছিল। ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিলাসে ও আরামে আজন্ম লালিত-পালিত হইয়া, পার্থিব ধনসম্পদে প্রচুর পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া, জীবনের সকল আনন্দে ও সুখ সৌভাগ্যে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াও জীবনসূর্যের মধ্যাহ্নক্ষণে এই ব্যক্তিটি তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া চলিলেন— আর কখনো ফিরিয়া তাকান নাই।

এই যুগে তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল অবিরাম সাধনা, সত্যসন্ধান এবং সত্য আচরণের অবিচ্ছিন্ন ধারা। তিনি সত্যকে কখনো গোপন করিতে, অথবা তাহাকে নিষ্প্রভ করিতে চাহেন নাই; পরন্তু তাহাকে পূর্ণভাবে, আপসহীন ভাবে, কোনো পার্থিব শক্তির ভয়ে বিচলিত না হইয়া, দ্ব্যর্থবিহীন ভাবে তিনি জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন বর্তমান যুগে অহিংসার শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁহার পূর্বে বা পরে পশ্চিমের আর কেহ এমন পূর্ণভাবে, এত জোর দিয়া এবং এত-খানি অন্তর্দৃষ্টির সহিত, অহিংসা সম্বন্ধে বলেন নাই বা লেখেন নাই। আমি আরো বলিব যে, তাঁহার হাতে এই নীতি যে-আশ্চর্য রকমের বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহাতে, বর্তমান যুগে আমাদের এই দেশের অহিংসার পূজারীরা সেই নীতির যে সংকীর্ণ ও একদেশী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা লজ্জা পায়। ভারতবর্ষ কর্মভূমি বা সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া গৌরবের দাবি করে। তথাপি, এবং আমাদের প্রাচীন ঋষিদের অহিংসার ক্ষেত্রে কতকগুলি মহৎ আবিষ্কার সত্ত্বেও, আজ আমাদের মধ্যে অহিংসা বলিয়া যাহা চলে, তাহা প্রায়ই একটা প্রহসন মাত্র। প্রকৃত অহিংসার অর্থ হওয়া উচিত, অশুভ ইচ্ছা, ক্রোধ ও ঘৃণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি এবং সকলের জন্য অফুরন্ত প্রেম। আমাদের মধ্যে অহিংসার এই সত্যকার ও উচ্চতর তাৎপর্য

শিখাইতে গেলে টলস্টয়ের জীবন ও তাঁহার সাগরের মতো বিপুল প্রেম আমাদের পথপ্রদর্শনের আলোকবর্তিকা হওয়া এবং প্রেরণার অক্ষয় উৎস হওয়া উচিত। টলস্টয়ের সমালোচকেরা সময় সময় বলিয়াছেন, তাঁহার জীবন ছিল এক বিরাট ব্যর্থতা। যে-আদর্শের সন্ধানে তাঁহার সমগ্র জীবন কাটিয়াছিল তাহা তিনি কখনো পান নাই। এই-সব সমালোচকের সহিত আমি একমত নহি। এ-কথা সত্য যে, তিনি নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। হইতে পারে যে জীবনে তিনি তাঁহার আদর্শ পূর্ণভাবে রূপায়িত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা তো মানুষের প্রকৃতি মাত্র। যতক্ষণ মানুষ রক্তমাংসের দেহে বাঁধা থাকে, ততক্ষণ অহংবুদ্ধি একেবারে দূর করা যায় না, এবং অহংবুদ্ধি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ-ভাবে দূর করা যায় ততক্ষণ সেই আদর্শ অবস্থায় পৌঁছানো অসম্ভব। তাই দেহ ধারণ করিয়া কেহ পূর্ণতায় পৌঁছাইতে পারে না। টলস্টয় বলিতে ভালোবাসিতেন যে, মানুষ আদর্শে পৌঁছিয়াছে এই কথা বিশ্বাস করামাত্র তাহার অগ্রগতি বন্ধ হইয়া অবনতি আরম্ভ হয়, এবং আদর্শের প্রকৃতিই হইল এরূপ যে যতই তাহার নিকটে যাই ততই সে দূরে সরিয়া যায়। সুতরাং টলস্টয় নিজেই যে বলিয়াছেন তিনি আদর্শে পৌঁছাইতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহার বিনয়েরই পরিচয় পাই, তাঁহার মহত্ত্বের কিছু-মাত্র লাঘব হয় না।

টলস্টয়ের জীবনে তথাকথিত অসংগতির বিষয়ে প্রায়ই অনেক কিছু বলা হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি বাহির হইতে দেখিতেই বেশি, ভিতরে কিছু নয়। অবিরাম বিকাশই জীবনের নীতি। যে-ব্যক্তি সর্বদা সংগতি রক্ষা করিবার জন্য নিজের মতবাদ আঁকড়াইয়া থাকে, সে নিজেকে একটা মিথ্যা অবস্থায় লইয়া যায়। তাই এমার্সন বলিয়াছিলেন, মূর্খের মতো সংগতি রক্ষা করিয়া চলা হইল ক্ষুদ্রপ্রকৃতি মানুষের মনের বিকার। টলস্টয়ের তথাকথিত অসংগতি ছিল তাঁহার বিকাশের চিহ্ন, তাঁহার সত্যানুরাগের লক্ষণ। তিনি সর্বদা তাঁহার নিজের মতবাদ ছাড়াইয়া উঠিতেছিলেন বলিয়া প্রায়ই তাঁহার মধ্যে অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার ব্যর্থতার কথা সাধারণের সম্পত্তি, কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম ও বিজয় তাঁহার একার। জগৎ প্রথমটিই দেখিয়াছে, পরেরটি নহে, এবং হয়তো টলস্টয় তাহা সর্বাপেক্ষা কম দেখিয়াছেন। তাঁহার সমালোচকেরা তাঁহার দোষ লইয়া ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি নিজের সম্বন্ধে যতটা কড়াকড়ি করিয়াছেন কোনো সমালোচক তাহার চেয়ে বেশি করিতে পারেন নাই। সমালোচকেরা দেখিবার পূর্বেই তাঁহার নিজের দোষত্রুটির বিষয়ে তিনি নিজে সতর্ক হইয়া যাইতেন বলিয়া হাজার গুণ বাড়াইয়া জগতে প্রচার করিতেন এবং

যে-প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন তাহা স্বয়ং নিজের উপর চাপাইতেন। সমালোচনা অতিরঞ্জিত হইলেও তিনি তাহা স্বাগত করিতেন, এবং সকল প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির মতো জগতের প্রশংসাকে ভয় করিতেন। তাঁহার ব্যর্থতা আমাদিগকে তাঁহার আদর্শের বিফলতার নয়, তাঁহার সাফল্যেরই পরিমাপ জানায়।

তাহার বিষয়ে তৃতীয় কথা যাহা বলিবার আছে, তাহা হইল অন্নার্থে পরিশ্রম করিবার নীতি। তিনি মনে করিতেন প্রত্যেক মানুষ রুজির জন্য কায়িক পরিশ্রম করিতে বাধ্য, এবং এই কর্তব্যপালনে অবহেলার ফলেই আজ জগতের অশেষ দুর্গতি। নিজে বিলাস এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবেন, কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ জীবন যাপন করিবেন, এবং বদান্যতা করিয়া গরিবের দুঃখ দূর করিবেন, ধনীর এই মনোভাবকে তিনি ভণ্ডামি মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, মানুষ যদি গরিবের পিঠে চাপিয়া বসার স্বভাব ছাড়িয়া দেয়, তবে বদান্যতার প্রয়োজনই হয় না।

কোনো কিছুতে বিশ্বাস করিলে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করাই ছিল তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ। সুতরাং সারা জীবন বিলাসের কোমল ক্রোড়ে কাটাইয়া, জীবনসন্ধ্যায় তিনি কঠোর পরিশ্রমের জীবন বরণ করিয়া লইলেন। জুতা তৈয়ারি এবং কৃষির কাজ শিখিয়া তিনি দৈনিক আট ঘণ্টা সমানে কাজ করিতেন। কায়িক পরিশ্রম তাঁহার বুদ্ধির দীপ্তিকে ম্লান করে নাই বরং তীক্ষ্ণতর ও উজ্জ্বলতর করিয়াছিল, আর এই সময়েই, স্বেচ্ছায় গৃহীত বৃত্তির ফাঁকে ফাঁকেই, লিখিত হয় তাঁহার সর্বাপেক্ষা জোরালো বই হোয়াট ইজ আর্ট? তিনি নিজে মনে করিতেন এইখানাই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম পুস্তক।

পশ্চিম হইতে আত্মসুখ সম্ভোগের বিষাক্ত বীজে পরিপূর্ণ নানা সাহিত্য মনোহরণ বেশে আমাদের দেশকে ভাসাইয়া দিতেছে। আমাদের যুবকদের এ-বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান যুগ তাহাদের পক্ষে আদর্শ-সংঘাতের ও বিবর্তনের যুগ। এই কঠিন সংকট-কালে যুবকদের, বিশেষত ভারতীয় যুবকদের, প্রয়োজন টলস্টয়ের বর্ণিত আত্ম-সংযমের পথে চলা।

কেননা, নিজেদের, দেশের ও জগতের প্রকৃত মুক্তি কেবল এই পথেই মিলিতে পারে। আমাদের নিজেদের আলস্য, জড়তা ও সামাজিক দুরাচারই ইংলণ্ড বা বাহিরের অপর কাহারো অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমাদের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যদি নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া লই তবে জগতে এমন কোনো শক্তি নাই যাহা মুহূর্তের জন্যও আমাদের স্বরাজ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। জগতের এই যুগ-

সন্ধিক্ষণে আজ আমাদের যুবকদের টলস্টয়ের যে-তিনটি গুণের উল্লেখ আমি করিয়াছি তাহা থাকা একান্ত আবশ্যক। ৪৭

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, কোনো যোগ্য প্রতিষ্ঠান লোকের সমর্থনের অভাবে বিনষ্ট হয় না। প্রতিষ্ঠান যদি লোপ পায় তবে বুঝিতে হইবে, লোকের চোখে তাহার মধ্যেকার কোনো সারবস্তু ধরা পড়ে নাই, অথবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আত্মবিশ্বাস ছিল না, অথবা তাহাদের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভাব ঘটিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের আমি জোর করিয়াই বলিতে চাই যে তাহারা যেন বাহিরের এই নৈরাশ্য ও অবসাদের কাছে পরাজয় না মানে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলির এই তো পরীক্ষার সময়। ৪৮

ঋণের প্রত্যাশায় সাধারণের হিতকর কোনো কাজে হাত দিতে নাই, গোড়াতেই আমার এই শিক্ষা হইয়াছিল। লোকের অনেক কথায় বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু টাকাকড়ির ব্যাপারে নয়। ৪৯

একজনের দ্বারা অপরের ধর্মান্তর-করণের নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি কখনো কাহারো ধর্মবিশ্বাস দুর্বল করিবার চেষ্টা করিব না, বরং তাহাকে দিয়া তাঁহার ধর্ম আরো ভালোভাবে পালন করাইবার চেষ্টা করিব। ইহার অর্থ— সকল ধর্ম যে সত্য, সে-কথা বিশ্বাস করা চাই, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। আবার ইহার জন্য চাই প্রকৃত দীনতা, এবং সেই সঙ্গে এই কথার স্বীকৃতি যে, রক্তমাংসের দেহের অসম্পূর্ণ মাধ্যমেই সকল ধর্ম দিব্য আলোক পাইয়াছে, সুতরাং মাধ্যমের অসম্পূর্ণতা কমবেশি সকল ধর্মেই থাকিবে। ৫০

[এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, গান্ধীজি একটি বিষধর সর্পকে তাঁহার গা বাহিয়া যাইতে দিয়াছিলেন, এ-কথা কি সত্য? তাহার উত্তরে গান্ধীজি লিখিয়াছেন :]

ইহা সত্যও বটে, সত্য নয়ও বটে। সাপটা আমার গা বাহিয়া যাইতেছিল। এ-অবস্থায় চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আমি কিংবা আর কেহ কি করিতে পারিতাম বা পারিত? ইহার জন্য বিশেষ প্রশংসার প্রয়োজন করে না। আর সাপটা বিষধর কি না তাহাই বা কে জানে? মৃত্যু যে ভয়াবহ ঘটনা নয়, বহু বৎসর ধরিয়া এই ধারণা মনে পুষিয়া রাখিয়াছি, তাই আমার অতি নিকট পরিজনেরও মৃত্যুর শোক শীঘ্রই সামলাইয়া লই। ৫১

আমাদের শেখানো হইয়াছে, যাহা সুন্দর তাহা প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে, আর যাহা কাজের জিনিস তাহা সুন্দর হইতে পারে না। আমি দেখাইতে চাই যে যাহা কাজের জিনিস তাহা সুন্দরও হইতে পারে। ৫২

'শিল্প বা কলা শিল্পের জন্যই' এ-কথা যাহারা বলে তাহারা নিজেদের দাবি প্রমাণ করিতে পারে না। 'কলা' কথাটার অর্থ কি— এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও, জীবনে কলার একটা স্থান আছে। কিন্তু আমাদের সকলেরই যাহা লক্ষ্য, কলা তাহার অন্যতম সাধন মাত্র। কিন্তু যদি সাধন না হইয়া সাধ্য হয় তবে ইহা মানবতাকে বদ্ধ ও অবনত করে। ৫৩

সকল বিষয়েরই দুইটি দিক আছে— একটি বাহিরের, অন্যটি ভিতরের। কোন্‌টির উপর জোর দিব, ইহাই আমার প্রশ্ন। ভিতরের দিকটাকে যে পরিমাণে সাহায্য করিবে তাহাতেই তাহার মূল্য, নহিলে বাহিরের দিকের কোনো মূল্য নাই। তাই সমস্ত সত্য 'কলা' হইল অন্তরের প্রকাশ। বাহিরের রূপের মূল্য ততখানিই, মানুষের অন্তরাত্মা তাহাতে যতখানি প্রকাশ পায়। এই ধরনের 'কলা' আমার মনে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগায়। কিন্তু আমি অনেককে জানি যাহারা কলাবিদ বা শিল্পী বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের হাতের কাজে আত্মার ঊর্ধ্বগতি বা ব্যাকুলতার আদৌ কোনো চিহ্ন নাই। ৫৪

প্রকৃত 'কলা' মাত্রই আত্মাকে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। আমার ক্ষেত্রে আমি দেখিতে পাই যে, আত্মার উপলব্ধির জন্য বাহিরের রূপের কোনো সাহায্য একেবারে না পাইলেও আমার চলে। আমার ঘরের দেওয়াল ফাঁকা থাকিতে পারে, ছাদ না থাকিলেও চলে, তাহাতে আমি উপরে চাহিয়া অনন্ত সৌন্দর্যবিস্তারে প্রসারিত তারকাখচিত গগন-মণ্ডল দেখিতে পাই। যখন আমি ঊর্ধ্ব-গগনে উজ্জ্বল তারকামালার দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন চরাচরব্যাপী সুপরিব্যাপ্ত যে সৌন্দর্যরাশি আমার চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, মানুষের প্রযত্নসিদ্ধ কোনো শিল্প কি তাহার তুল্য আস্বাদ দিতে পারে? অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, আমি সাধারণভাবে স্বীকৃত সৃষ্টিধর্মী কলাকৃতির মূল্য স্বীকার করি না। আমি এই কথাই বলিতে চাই যে, প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের শাশ্বত প্রতীকের তুলনায় সেগুলি যে কত অকিঞ্চিৎকর তাহা আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করিতে পারি। মানুষের এই-সব কলাকৃতির এইটুকু মূল্য আছে যে তাহা আত্মোপলব্ধির পথে আত্মাকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। ৫৫

আমি সংগীত এবং অন্যান্য 'কলা' ভালোবাসি; কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের যে-মূল্য দেওয়া হয় আমি সেই মূল্য দি না। যেমন, যে-সকল প্রচেষ্টা বুঝিতে গেলে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেগুলির মূল্য আমি স্বীকার করিতে পারি না... যখন আমি তারকাখচিত গগনমণ্ডলের দিকে তাকাই তখন যে অনন্ত সৌন্দর্যরাশি আমার চক্ষে ধরা দেয়, আমার কাছে তাহার মূল্য, মানবের সৃষ্ট শিল্পকলা আমাকে যাহা-কিছু দিতে পারে তাহার তুলনায় অনেক বেশি। তাহার অর্থ এই নয় যে, সাধারণভাবে শিল্পকর্ম বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মূল্য আমি অগ্রাহ্য করি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের তুলনায় আমি তাহাদের মধ্যে বাস্তবতার অভাব খুবই তীব্রভাবে অনুভব করি।... জীবন সকল শিল্পকলার অপেক্ষা বড়। আমি আরো অগ্রসর হইয়া বলিব, যে-ব্যক্তির জীবন পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কলাকার; কারণ মহৎজীবনের কাঠামো ও দৃঢ়ভিত্তি ছাড়িয়া দিলে শিল্পকলার বাকি কি থাকিল? ৫৬

সম্যক দৃষ্টি যখন কাজ করে তখনই প্রকৃত সুন্দরের সৃষ্টি সম্ভব। জীবনেও যেমন শিল্পেও তেমনি এরূপ মুহূর্ত দুর্লভ। ৫৭

প্রকৃত শিল্পী শুধু রূপ লইয়া থাকে না, তাহার পিছনে যাহা থাকে তাহা লইয়াও তাহার কাজ। এমন শিল্প আছে যাহা জীবননাশ করে, এমন শিল্প আছে যাহা প্রাণ দান করে। প্রকৃত শিল্পে কলাকারের সুখ, সন্তোষ ও শুচিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৫৮

ব্যক্তিগত জীবনের শুচিতার সহিত শিল্পের সম্বন্ধ নাই, কোনো-না-কোনো প্রকারে আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জোর করিয়া বলিতে পারি যে, ইহা হইতে বেশি অসত্য আর কিছু হইতে পারে না। পার্থিব জীবনের শেষ ভাগে আসিয়া পৌঁছিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে, শুচিতাই হইল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সত্য শিল্প। শিক্ষিত কণ্ঠ হইতে শুদ্ধ সংগীত উদ্‌গীত করার কৌশল অনেকে আয়ত্ত করিতে পারেন, কিন্তু পবিত্র জীবনের সংগতি হইতে সংগীত সৃষ্টি করার ক্ষমতা বিরল। ৫৯

অহংকার বর্জন করিয়া ও যথাযোগ্য দীনতার সহিত যদি বলিতে পারি তবে বলিব যে, আমার বাণী ও আমার কর্মপ্রণালীর মূল কথা সমগ্র জগতেরই জন্য, এবং আমি ইহা জানিয়া গভীর সন্তোষ বোধ করি যে, বৃহৎ ও নিত্য-

বর্ধমান সংখ্যায় পশ্চিমের নরনারীদের মধ্যে উহা ইতিমধ্যেই অদ্ভুত সাড়া জাগাইয়াছে। ৬০

আমার বন্ধুরা যদি তাঁহাদের নিজেদের জীবনে আমার কর্মসূচীর প্রবর্তন করেন, অথবা তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস না থাকিলে যদি প্রাণপণে তাহার বিরোধিতা করেন, তবে তাহাতেই আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান দেখানো হইবে। ৬১

আকর-গ্রন্থ

মূল ইংরেজি পুস্তকের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যে-সকল উদ্ধৃতি সংকলিত হইয়াছে সেগুলি নিম্নলিখিত আকর-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত :

AMG *An autobiography or the story of my experiments with Truth,* by M. K. Gandhi. Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad, originally in two volumes, vol. I in 1927 and vol. II in 1929 ; the present edition used was published in August 1948.

MGP *Mahatma Gandhi, the last phase,* by Pyarelal. Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad, in two volumes, vol. I in February 1956 and vol. II in February 1958.

MT *Mahatma, life of Mohandas Karamchand Gandhi,* by D. G. Tendulkar. Published by Vithalbhai K. Jhaveri & D. G. Tendulkar, Bombay 6, in eight volumes, vol. I in August 1951, vol. II in December 1951, vol. III in March 1952, vol. IV in July 1952, vol. V in October 1952, vol. VI in March 1953, vol. VII in August 1953, vol. VIII in January 1954.

BM *Bapu's letters to Mira.* Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad, August 1949.

CWMG *The collected works of Mahatma Gandhi.* Published by The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi ; vol. I was published in January 1958.

DM *The diary of Mahadev Desai.* Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad ; vol. I was published in 1953.

HS *Hind Swaraj or Indian Home Rule,* by M. K. Gandhi. Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad, originally in 1938; the present edition used was published in 1946.

WSI *Women and Social Injustice,* by M. K. Gandhi. Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad, originally in 1942; the present edition used was published in 1954.

MM *The mind of Mahatma Gandhi,* compiled by R. K. Prabhu and U. R. Rao. Published by Oxford University Press, London, in March 1945.

SB *Selections from Gandhi,* by Nirmal Kumar Bose, Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad, in 1948.

এই আকর-গ্রন্থগুলির নির্দেশিকা হইতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল ইংরেজি অনুচ্ছেদ কোন গ্রন্থে ও কত পৃষ্ঠায় আছে জানিতে পারিবেন। যথা—

আত্মকথা

১০০ AMG, 398

অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থের 'আত্মকথা' পরিচ্ছেদের ১০০ নং অনুচ্ছেদ গান্ধীজির An Autobiography or the story of my experiments with Truth (AMG) গ্রন্থের 398 পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

যে-সকল রচনাংশ পত্র-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসংক্রান্ত উল্লেখ আকর-গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে।

আত্মকথা

১ AMG, 4
২ AMG, 4
৩ AMG, 4-5
৪ AMG, 5
৫ SB, 45
৬ AMG, 11
৭ AMG, 12
৮ AMG, 12-13
৯ AMG, 14
১০ AMG, 15
১১ AMG, 15-16
১২ AMG, 18
১৩ AMG, 19
১৪ AMG, 21
১৫ AMG, 23-24
১৬ AMG, 26-27
১৭ AMG, 31
১৮ AMG, 31-32
১৯ AMG, 32-33
২০ AMG, 33
২১ AMG, 33
২২ AMG, 33

২৩ AMG, 36
২৪ AMG, 37
২৫ AMG, 37
২৬ AMG, 38
২৭ AMG, 38
২৮ AMG, 47
২৯ AMG, 50-51
৩০ MT, II, 47-48
৩১ AMG, 52
৩২ AMG, 52
৩৩ AMG, 52-53
৩৪ AMG, 54
৩৫ CWMG, I, 3
৩৬ AMG, 63
৩৭ AMG, 64-65
৩৮ AMG, 66-67
৩৯ AMG, 79-80
৪০ AMG, 81-82
৪১ AMG, 84
৪২ AMG, 101
৪৩ AMG, 101
৪৪ AMG, 102
৪৫ AMG, 105
৪৬ AMG, 115
৪৭ AMG, 118
৪৮ AMG, 123
৪৯ AMG, 128
৫০ AMG, 129
৫১ AMG, 130
৫২ AMG, 134
৫৩ AMG, 135
৫৪ AMG, 140-41
৫৫ AMG, 157
৫৬ AMG, 157-58
৫৭ AMG, 162-63
৫৮ AMG, 163-64
৫৯ AMG, 165
৬০ AMG, 168
৬১ AMG, 190
৬২ AMG, 190-91
৬৩ AMG, 191-92
৬৪ AMG, 192
৬৫ AMG, 197
৬৬ AMG, 212
৬৭ AMG, 205
৬৮ AMG, 229-30
৬৯ AMG, 231
৭০ AMG, 232-33
৭১ AMG, 235
৭২ AMG, 236-37
৭৩ AMG, 239-40
৭৪ AMG, 241
৭৫ AMG, 249-50
৭৬ AMG, 250
৭৭ AMG, 250-51
৭৮ AMG, 251
৭৯ AMG, 256
৮০ AMG, 257
৮১ AMG, 334
৮২ AMG, 261
৮৩ AMG, 262-63
৮৪ AMG, 264
৮৫ AMG, 268
৮৬ AMG, 337
৮৭ AMG, 338
৮৮ MT, II, 49
৮৯ AMG, 342
৯০ AMG, 349
৯১ AMG, 364-65
৯২ AMG, 383
৯৩ AMG, 384
৯৪ AMG, 385
৯৫ AMG, 386
৯৬ AMG, 391
৯৭ AMG, 391-92
৯৮ AMG, 392-93
৯৯ AMG, 398
১০০ AMG, 398
১০১ AMG, 406
১০২ AMG, 406
১০৩ AMG, 409
১০৪ AMG, 411-12
১০৫ AMG, 414
১০৬ AMG, 414-15
১০৭ AMG, 415
১০৮ AMG, 418
১০৯ AMG, 418-19
১১০ AMG, 419
১১১ AMG, 443-44
১১২ AMG, 449
১১৩ AMG, 421-23
১১৪ AMG, 424-25
১১৫ AMG, 425
১১৬ AMG, 427

১১৭ SB, 167-68
১১৮ SB, 168-70
১১৯ SB, 214
১২০ SB, 214
১২১ MT, II, 113
১২২ MT, II, 340
১২৩ AMG, 614; see also MM, 4
১২৪ AMG, 615
১২৫ AMG, 616
১২৬ MM, 7
১২৭ MM, 8
১২৮ MT, II, 417
১২৯ SB, 150
১৩০ MT, II, 421-23
১৩১ MT, II, 425-26
১৩২ MT, III, 142
১৩৩ MT, III, 155-57
১৩৪ MT, IV, 93
১৩৫ MT, IV, 95
১৩৬ MT, VI, 356
১৩৭ SB, 216
১৩৮ MGP, II, 475
১৩৯ MT, IV, 66-67
১৪০ MT, VI, 177
১৪১ MT, V, 241-42
১৪২ MT, V, 378-79
১৪৩ MT, VII, 100
১৪৪ MGP, II, 801
১৪৫ MGP, II, 808
১৪৬ MT, I, 285
১৪৭ MGP, II, 800
১৪৮ MGP, II, 453
১৪৯ MGP, II, 463
১৫০ MT, VIII, 22-23
১৫১ MGP, II, 246
১৫২ MGP, II, 246
১৫৩ MGP, II, 324
১৫৪ MM, 16
১৫৫ MGP, II, 324
১৫৬ MGP, II, 101
১৫৭ MGP, II, 327
১৫৮ MGP, I, 562
১৫৯ MM, 9
১৬০ MM, 9
১৬১ MGP, II, 766
১৬২ MGP, II, 417
১৬৩ MGP, II, 782
১৬৪ SB, 238

সত্য ও ধর্ম

১ MM, 85
২ SB, 223
৩ MG, 341
৪ MM, 21
৫ MM, 22
৬ MM, 22
৭ MM, 22
৮ MM, 22-23
৯ SB, 9
১০ MGP, I, 421-22
১১ AMG, 615
১২ AMG, 615-16
১৩ AMG, 616
১৪ SB, 8
১৫ MM, 24
১৬ SB, 224
১৭ SB, 224
১৮ SB, 225
১৯ SB, 225
২০ SB, 226-27
২১ SB, 228
২২ SB, 226
২৩ SB, 227-28
২৪ SB, 228
২৫ SB, 228
২৬ MM, 84
২৭ MM, 84
২৮ MM, 82
২৯ MM, 86
৩০ MM, 96
৩১ MT, III, 139-40
৩২ MT, IV, 108-09
৩৩ MT, III, 343
৩৪ MT, III, 300
৩৫ MT, IV, 121
৩৬ DM, 138
৩৭ DM, 227-28
৩৮ BM, 171
৩৯ MT, IV, 167-68
৪০ MGP, I, 599
৪১ MGP, II, 247
৪২ MT, III, 359-60

৪৩ AMG, 6
৪৪ AMG, 6-7
৪৫ SB, 225
৪৬ MM, 23
৪৭ MM, 23
৪৮ MM, 24
৪৯ MM, 24
৫০ MM, 27
৫১ MM, 27
৫২ MM, 30
৫৩ MM, 33
৫৪ MM, 70
৫৫ MM, 70
৫৬ MM, 71
৫৭ MM, 80
৫৮ MM, 78
৫৯ MT, III, 176-77
৬০ SB, 17
৬১ MM, 17
৬২ MM, 19-20
৬৩ MM, 20
৬৪ MM, 21
৬৫ MM, 23
৬৬ MM, 38
৬৭ DM, 249-50
৬৮ MM, 12
৬৯ MM, 13
৭০ MM, 13
৭১ MM, 1
৭২ MM, 5
৭৩ MM, 10
৭৪ MM, 15
৭৫ MM, 23
৭৬ MM, 20
৭৭ MM, 20
৭৮ MM, 37
৭৯ MM, 38
৮০ SB, 9
৮১ SB, 46-47
৮২ SB, 223
৮৩ SB, 223
৮৪ SB, 223
৮৫ SB, 223
৮৬ SB, 223
৮৭ SB, 224
৮৮ SB, 229
৮৯ SB, 229
৯০ SB, 229
৯১ SB, 229
৯২ SB, 230
৯৩ DM, 168
৯৪ SB, 238
৯৫ MM, 1
৯৬ MM, 2-3
৯৭ MM, 3
৯৮ MM, 3
৯৯ MM, 3
১০০ MM, 5
১০১ MM, 5
১০২ MM, 5
১০৩ MM, 10
১০৪ MM, 81
১০৫ MM, 82
১০৬ MM, 106
১০৭ MM, 167
১০৮ SB, 210
১০৯ MGP, I, 348
১১০ MGP. II, 784
১১১ MT, VII, 264
১১২ MGP. II, 143
১১৩ MGP, II, 91
১১৪ MGP, II, 143
১১৫ MM, 14
১১৬ MT. II, 312

সাধ্য ও সাধন

১ SB, 13
২ SB, 37
৩ SB, 14
৪ MM, 126
৫ HS, 51-52
৬ MGP, II, 140-41
৭ SB, 160-61
৮ SB, 161
৯ SB, 162

অহিংসা

১ MM, 49
২ MT, V, 344
৩ SB, 16
৪ SB, 18

৫ SB, 24
৬ SB, 18
৭ SB, 23
৮ SB, 24-25
৯ SB, 17-18
১০ SB, 31-32
১১ SB, 27-28
১২ SB, 33
১৩ SB, 32
১৪ SB, 33
১৫ SB, 33
১৬ SB, 34
১৭ SB, 39-39
১৮ SB,142-43
১৯ SB, 145
২০ SB, 146-47
২১ SB, 147
২২ SB, 16
২৩ SB, 33
২৪ SB, 144
২৫ SB, 145
২৬ SB, 147
২৭ SB, 149
২৮ SB, 149
২৯ SB, 151
৩০ SB, 151-52
৩১ SB, 152
৩২ SB, 152
৩৩ SB, 152
৩৪ AMG, 427-28
৩৫ AMG, 428
৩৬ AMG, 429
৩৭ SB, 154
৩৮ SB, 155
৩৯ SB, 157
৪০ SB, 157
৪১ SB, 159-60
৪২ SB, 206
৪৩ MM, 42
৪৪ MM, 3-4
৪৫ MM, 44
৪৬ MM, 44
৪৭ MM, 44
৪৮ MM, 46
৪৯ MM, 46
৫০ MM, 46
৫১ MM, 48-49
৫২ MM, 48
৫৩ MM, 50
৫৪ MM, 52
৫৫ MM, 54
৫৬ MM, 58
৫৭ MM, 63
৫৮ MM, 64
৫৯ MM, 68
৬০ MM, 68-69
৬১ DM, 296
৬২ MGP, II, 124-25
৬৩ MGP, II, 507
৬৪ MT, VII, 152-53
৬৫ SB, 150-51
৬৬ SB, 153
৬৭ SB, 153
৬৮ SB, 154
৬৯ SB, 154
৭০ SB, 155-56
৭১ SB, 156
৭২ MM, 47
৭৩ MM, 49
৭৪ MM, 50
৭৫ MT, IV, 61
৭৬ MT, II, 5-8
৭৭ MT, V, 273
৭৮ MT, VII, 171-73
৭৯ MM, 133

আত্মসংযম

১ SB, 39
২ SB, 39
৩ SB, 268
৪ SB, 268
৫ SB, 271-72 ; see also MM, 44
৬ MM, 11
৭ MM, 11
৮ MM, 108
৯ DM, 98
১০ DM, 298
১১ MGP. II, 233
১২ MGP, II, 442
১৩ MGP, II, 792
১৪ SB, 221
১৫ SB, 221

১৬ MM, 32
১৭ MM, 33
১৮ MM, 32-33
১৯ MGP, I, 573
২০ SB, 217
২১ SB, 18
২২ MGP, I, 599
২৩ MGP, I, 600
২৪ MT, IV, 57-58
২৫ AMG, 258
২৬ DM, 80
২৭ MGP, I, 588-89
২৮ DM, 253
২৯ MT, IV, 73
৩০ SB, 215-16
৩১ MGP, I, 586

আন্তর্জাতিক শান্তি

১ SB, 27
২ SB, 27
৩ SB, 22
৪ MM, 137
৫ MM, 135
৬ MM, 134
৭ MM, 135-36
৮ MM, 136
৯ DM, 287
১০ MGP, I, 359
১১ SB, 43
১২ SB, 43
১৩ SB, 44
১৪ SB, 152
১৫ MM, 133
১৬ SB, 113
১৭ SB, 171-72
১৮ MM, 59-60
১৯ MM, 60-61
২০ MM, 63
২১ MM, 63
২২ MM, 63
২৩ MGP, II, 90

মানুষ ও যন্ত্র

১ MM, 128
২ SB, 73
৩ SB, 71
৪ MM, 121
৫ MT, VII, 224-25
৬ SB, 64-65
৭ SB, 66
৮ SB, 66
৯ SB, 67-68
১০ SB, 58
১১ SB, 58
১২ SB, 59
১৩ SB, 65
১৪ SB, 66-67
১৫ SB, 71

প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য

১ SB, 41
২ SB, 40
৩ SB, 77
৪ SB, 17
৫ SB, 75
৬ SB, 75-76
৭ SB, 77-78
৮ SB, 78-79
৯ SB, 52
১০ SB, 54
১১ SB, 50
১২ SB, 49
১৩ MM, 11
১৪ MM, 101
১৫ SB, 76
১৬ SB, 49
১৭ SB, 48-49
১৮ SB, 49
১৯ SB, 49
২০ MM, 104
২১ MM, 116
২২ MM, 117
২৩ SB, 81
২৪ SB, 91
২৫ SB, 92
২৬ SB, 94
২৭ MT, IV, 13-14
২৮ MGP, I, 66

গণতন্ত্র ও জনগণ

১ MT, V, 343
২ MT, V, 342
৩ MM, 65
৪ SB, 143
৫ SB, 22
৬ SB, 37
৭ SB, 38
৮ SB, 41
৯ SB, 43
১০ SB, 82-83
১১ SB, 109
১২ SB, 109
১৩ MT, VI, 23
১৪ SB, 111
১৫ SB, 111
১৬ SB, 118
১৭ SB, 193-94
১৮ SB, 190
১৯ SB, 20
২০ MM, 3
২১ MM, 9
২২ MM, 9
২৩ MM, 11
২৪ DM, 149
২৫ SB, 201
২৬ SB, 201-02
২৭ MT, IV, 15
২৮ SB, 42
২৯ SB, 42
৩০ SB, 109
৩১ SB, 109
৩২ SB, 110
৩৩ SB, 110
৩৪ SB, 116
৩৫ SB, 116
৩৬ SB, 116
৩৭ SB, 191
৩৮ SB, 191
৩৯ MM, 100
৪০ SB, 36
৪১ MM, 132
৪২ MM, 130
৪৩ MM, 131
৪৪ MT, II, 24
৪৫ MT, II, 25-26
৪৬ MT, I, 257
৪৭ MT, VI, 269
৪৮ SB, 192-93
৪৯ SB, 203
৫০ SB, 203
৫১ SB, 204
৫২ SB, 203
৫৩ MT, VI, 336

শিক্ষা

১ SB, 251
২ SB, 256
৩ SB, 256-57
৪ SB, 261-66
৫ SB, 266-67
৬ SB, 267
৭ SB, 274
৮ SB, 274
৯ MM, 162
১০ SB, 254
১১ SB, 256
১২ SB, 256
১৩ SB, 255
১৪ SB, 258
১৫ MM, 161
১৬ MM, 161
১৭ DM, 188
১৮ MGP, I, 44
১৯ MT, IV, 76

নারী-সমাজ

১ SB, 239
২ SB, 241
৩ SB, 239-40
৪ MM, 111
৫ MM, 111-12
৬ MM, 111
৭ SB, 248
৮ SB, 248
৯ MM, 112
১০ MM, 112
১১ MM, 112
১২ MM, 113

১৩ WSI, 4-5
১৪ WSI, 18
১৫ SB, 246
১৬ SB, 246-47
১৭ WSI, 180
১৮ WSI, 184
১৯ WSI, 87
২০ WSI, 187
২১ MT, VI, 78
২২ MGP, I, 327
২৩ MGP, II, 103
২৪ MGP, II, 104

বিবিধ

১ SB, 11
২ MM, 4
৩ MM, 8
৪ DM, 315
৫ DM, 318
৬ MM, 8-9
৭ SB, 19
৮ SB, 44
৯ SB, 45
১০ SB, 45
১১ MT, II, 27-28
১২ MM, 16
১৩ MM, 41
১৪ MM, 41
১৫ MT, V, 206
১৬ MM, 31
১৭ MM, 69
১৮ MM, 70
১৯ MM, 79
২০ MM, 66
২১ MT, I, 241-42
২২ MM, 145
২৩ MM, 9
২৪ MM, 12
২৫ MM, 12
২৬ MM, 12
২৭ SB, 28-29
২৮ SB, 29
২৯ SB, 45
৩০ SB, 193
৩১ SB, 193
৩২ SB, 193
৩৩ SB, 182
৩৪ SB, 209
৩৫ SB, 209
৩৬ SB, 209
৩৭ SB, 278
৩৮ SB, 275
৩৯ SB, 275-76
৪০ SB, 300
৪১ SB, 300
৪২ BM, 59
৪৩ BM, 218
৪৪ MGP, I, 421
৪৫ MGP, I, 429-30
৪৬ MT, II, 384
৪৭ MT, II, 418-20
৪৮ SB, 268-69
৪৯ SB, 269
৫০ MT, II, 450
৫১ DM, 167-68
৫২ MGP, I, 168
৫৩ DM, 160
৫৪ SB, 273
৫৫ SB, 273
৫৬ MM, 39
৫৭ SB, 274
৫৮ SB, 274
৫৯ SB, 274
৬০ MM, 135
৬১ MM, 8

মহাত্মা গান্ধীর নিজের ভাষায় তাঁহার জীবনকথা ও মানবিক জীবনের নানা সমস্যার বিষয়ে তাঁহার রচনা ও উক্তির সুবিন্যস্ত সংকলন। All Men Are Brothers নামে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি সম্পাদিত মূল ইংরেজি সংকলন য়ুনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৫৮ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কতিপয় বিদেশীয় ভাষাতেও এই গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। য়ুনেস্কো সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের প্রস্তাবক্রমে সাহিত্য অকাদেমী ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেন। মালয়লাম, তেলেগু, তামিল, সিন্ধি, উর্দু ও অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গুজরাটী ও হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন নবজীবন ট্রাস্ট। বাংলা-ভাষায় অনুবাদ এই প্রথম। আত্মকথা ছাড়া এই গ্রন্থে যে-সকল বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে সেগুলি যথাক্রমে সত্য ও ধর্ম; সাধ্য ও সাধন; অহিংসা; আত্মসংযম; আন্তর্জাতিক শান্তি; মানুষ ও যন্ত্র; প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য; গণতন্ত্র ও জনগণ; শিক্ষা; নারী-সমাজ ও বিবিধ।

গান্ধী-জন্মশতবর্ষপূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়রঞ্জন সেন অনূদিত এই বাণী-সংগ্রহ সকল পাঠকের নিকট মূল্যবান বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

মূল্য ২·০০